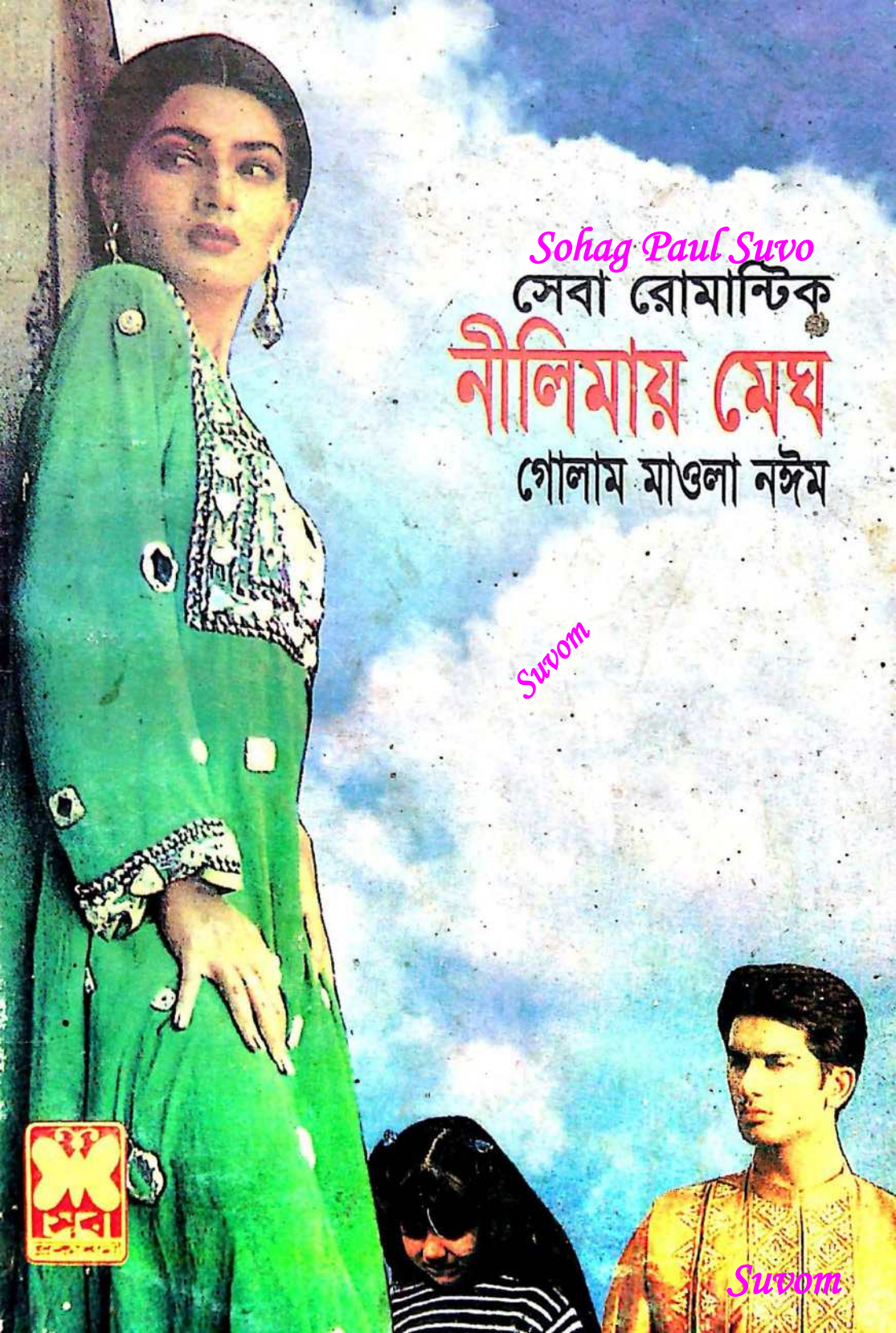

Sohag Paul Suvo

সেবা রোমান্টিক

নীলিমায় মেঘ

গোলাম মাওলা নঈম

Suvom

Suvom

সেবা রোমান্টিক

নীলিমায় মেঘ

গোলাম মাওলা নঈম

মৃত বোনের একমাত্র মেয়েকে দেখতে কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছে সায়রা। ঘুণাক্ষরেও জানে না নিয়তি কি নিষ্ঠুর এক খেলার আয়োজন করে রেখেছে সুজলা সুফলা এই দেশে!

সত্যিই কি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে ওর বোন সায়মা? নাকি খুন হয়েছে বদমেজাজী স্বামীর হাতে? অদ্ভুত এবং রহস্যময় কোন কারণে স্বামীকে যমের মত ভয় পাচ্ছিল সায়মা, মারা যাওয়ার ঠিক আগে একটা চিঠিতে সায়রাকে জানিয়েছে নিজের আশঙ্কার কথা–সত্যটি প্রকাশ পেলে ওকে খুন করে ফেলবে ফাহিম ইমতিয়াজ!

কেমন মানুষ ফাহিম ইমতিয়াজ যে নিজের ভাইয়ের কাছেও শত্রু বনে গেছে? জানা নেই সায়রার, কারণ কখনও দেখা হয়নি ওদের; জানে না ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে প্রভাকে ঘিরেই সব রহস্য বিস্তৃত হয়েছে। শুধু জানে বোনের মৃত্যুর কারণটা ওকে জানতেই হবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সেবা রোমান্টিক

নীলিমায় মেঘ

গোলাম মাওলা নঈম

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে **BanglaPDF.net** (বাংলাপিডিএফ.নেট) এর সৌজন্যে ।

Scanned & Edited By:

Sohag Paul Suvo

Facebook: https://www.facebook.com/Suvo08

Group:

https://www.facebook.com/groups/BanglaPDF.net

সেবা রোমান্টিক

নীলিমায় মেঘ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-0214-৪

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NILIMAYE MEGH
A Romantic Novel
By Golam Maola Naim

চৌত্রিশ টাকা

নীলিমায় মেঘ

A
Banglapdf.net
Presents

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি সেবা রোমান্টিক

খন্দকার মজহারুল করিম: সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল, হংস পাখায় লেখা, আমার এ ভালবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে, ঝড়ের রাতে, তোমাকে ভালবেসে, কঙ্কাবতী, করবী গরবিনী, কথা রাখো, জোনাকি ঝিকিমিকি, রাতের মত একা, দ্বিতীয় পরমায়ু। **রোকসানা নাজনীন:** বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১-২, অন্ধকারে একা ১-২, স্বপ্নপুরুষ, এ মনিহার। **বাবুল আলম:** স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়। **মোস্তাফিজুর রহমান:** ছলনাময়ী। **বিশু চৌধুরী:** অচেনা পরবাসী। **খসরু চৌধুরী:** তবু অচেনা। **শেখ আবদুল হাকিম:** নগ্ন প্রাচীর ১-২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা, হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, তুমি চিরকাল, কি শুভক্ষণে, তুমি সুন্দর, প্রিয়, যে ছিল আমার, প্রথম প্রেম, চন্দ্রাহত, হৃদয়ে তুমি, দাও বিদায়, কে তুমি এলে, একটি মেয়ে একা, কাঁটা, দহন, যদি জানতেম, না বলা কথা, বলো কী অপরাধ, কথা দাও, কি করে ভুলি, ক্ষমা করো, নিশির প্রেম, এ কেমন খেলা, তোমাকে ভালবাসি। **শাহরিয়ার শামস:** স্বপ্নের অপরাহ্ণ। **মিলা মাহফুজা:** সুধাবিষে, তোমার দু-চোখে। **হেলেন নওশীন:** নিঝুম। **ইফতেখার আমিন:** শুধু তোমাকে, সেইদিন চিরদিন। **শায়লা মমতাজ:** বরষার চোখে জল, কেন বোঝ না, আমি শর্মিলী। **গোলাম মাওলা নঈম:** কেন এলে, প্রসন্ন প্রহর, ফিরে এসো। **শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া:** তোমার আকাশ নীল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা. এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

'গিন্নী, আসব নাকি?'

চমকে দরজার দিকে তাকাল সায়রা। চুলোয় চা-র পানি চড়িয়েছে ও, মিনিট ত্রিশেক আগে স্কুল থেকে ফিরে গোসল সেরে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। মুকিম আহামদকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উজ্জ্বল হলো ওর মুখ, স্মিত হেসে এগোল তাঁর দিকে; কিন্তু পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে উঠল।

সত্তর পেরিয়েছেন মুকিম আহামদ। চলাফেরার সময়, বিশেষ করে সিঁড়ির ধাপ টপকাতে গেলে প্রতিটি বছরের কথা তাঁকে স্মরণ করতে হয়। এই যেমন এখন, দরজার সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে আসতে সত্যিই কষ্ট হয়েছে ওঁর।

'দাদু! কতদিন বলেছি এভাবে ওপরে উঠবে না?' শাসন করল সায়রা, চোখে-মুখে মেকি কাঠিন্য। 'আমাকে ডাকলেই পারতে!'

'গিন্নীর চায়ে ভাগ বসানোর লোভ সামলাতে পারলাম না!' সহাস্যে বললেন মুকিম আহামদ। 'তাছাড়া কাল থেকে কিছুদিনের জন্যে তো আর চা-র ভাগ পাব না!'

মুকিম আহামদকে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসতে সাহায্য করল সায়রা। 'বড়জোর সাত দিন, প্রভাকে দেখেই তো চলে আসব,' স্মিত হেসে বুড়োকে আশ্বস্ত করল ও, কেতলি থেকে দুটো কাপে চা ঢেলে নিজেরটায় চিনি মেশাল। মুকিম আহামদ চিনি খান না।

মিনিট খানেক জিরিয়ে নিলেন মুকিম আহামদ। ধীর, স্বাভাবিক হয়ে এল ওঁর শ্বাস-প্রশ্বাস। 'সত্যিই যাচ্ছিস তাহলে?'

'হ্যাঁ, টিকেট কাটা হয়ে গেছে। সকালে বাসে উঠব, সন্ধের দিকে পৌঁছে যাব ঢাকায়।'

'একা একা যাবি, তা-ও অন্য দেশে···খোদাই জানে কি বিপদে পড়িস!' ম্লান সুরে বললেন মুকিম আহামদ, দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল কণ্ঠে। চা-র কাপ তুলে চুমুক দিলেন নিঃশব্দে।

'ঢাকা কি দিল্লীর চেয়েও বেশি দূরে, দাদু?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল সায়রা।

'দূরত্বের ব্যাপার নয়, আসল কথা হচ্ছে তুই একা যাচ্ছিস। সাথে পুরুষ মানুষ না থাকলে একটা মেয়ে সবসময়ই অসহায় বোধ করে। তাছাড়া ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন পরিস্থিতি, অচেনা মানুষ···বয়সের কথা না-ই বললাম!'

'দাদু! এখনও ভাবছ সতেরো বা আঠারো রয়ে গেছে আমার বয়স? মার্চে চব্বিশে পড়েছি, তাই না?' তর্ক করল সায়রা, মুকিম আহামদের সঙ্গ উপভোগ করছে। 'পরিবেশ বা পরিস্থিতি ভিন্ন ঠিক, কিন্তু আসলেই কি খুব অচেনা? বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের কালচারের অমিল একেবারে নগণ্য!'

উদার ভঙ্গিতে হাসলেন বুড়ো, কিন্তু চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছে সায়রার যুক্তি মানতে নারাজ, অন্তত নিজের ধারণা থেকে সরতে রাজি নন। 'যত কিছুই বলিস···একটা মেয়ে হয়ে অন্য দেশে যাচ্ছিস, এটা কোন ভাবেই ভুলে যাওয়ার মত ব্যাপার নয়।'

'আগেও তো তোমাদের ছেড়ে গেছি আমি, তাই না?'

'ওসব ছিল কলেজের প্লেজার-ট্রিপ কিংবা কোথাও বেড়াতে গেছিস। এ ব্যাপারটা আলাদা, তোর সাথে যাচ্ছে না কেউ।'

'সবকিছুর পরও···ঢাকাকে আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হবে না। তাছাড়া সায়মার চিঠির ব্যাপারটা খোলসা হওয়া দরকার, এটা মানছ তো? অবসরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি–কিন্তু পরিষ্কার হয়নি কিছু। দরকার হলে কয়েকদিন থাকব, তবু সন্দেহটা যদি চলে যায়, মন্দ কি!'

'বরাবরই ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে ছিল সায়মা, আজগুবি সব আইডিয়া থাকত ওর মাথায়। আমার ধারণা ওই চিঠির ব্যাপারটাও সেরকম, রহস্য করেছে ও।'

'চিঠিতে যা লিখেছে···মনে হয় না খেয়ালের বশে বা রহস্য করার জন্যে লিখেছে ও। যদি তা-ও হয়, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা তো দূর হবে! তাছাড়া প্রভার ব্যাপারে···'

'তোর মা-র মত ভাবতে শুরু করেছিস নাকি?' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মুকিম আহামদের কণ্ঠ, এতটাই তীক্ষ্ণ যে বিস্মিত হয়ে পড়ল সায়রা। 'তোর মা-র ধারণা প্রভার এখানেই থাকা উচিত। কিন্তু আসলেই কি ততটা দাবি আছে আমাদের? বাপের কাছে আছে প্রভা। অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য···সবই আছে ওর বাপের; মা না থাকলেও উপযুক্ত পরিবেশে বড় হচ্ছে ও। ফাহিম সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু জানি না আমরা, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায়ও না এখন। তুই যদি ভেবে থাকিস ওকে নিয়ে আসতে পারবি···'

ধৈর্য হারাল সায়রা। 'দাদু! ভাবছ প্রভাকে নিয়ে আসার জন্যে ঢাকায় যাচ্ছি আমি? মা-র সাথে সবসময়ই তর্ক করেছি যে চিন্তাটাই হাস্যকর।' দাদুকে বিব্রত হয়ে পড়তে দেখে থেমে গেল ও, কোমল স্বরে খেই ধরল একটু পর: 'ফাহিম ইমতিয়াজ মা-র উদ্দেশে লেখা চিঠিতে নিস্পৃহ ভাব দেখিয়েছে, সেজন্যে তাকে দোষ দেই না আমি। নিজের মেয়েকে কেন আমাদের হাতে তুলে দেবে সে? সত্যিই তো, প্রভার অভিভাবকত্বের আইনগত অধিকার আমাদের চেয়ে তারই বেশি।

'প্রভার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। ও আমার ভাগনী, এবং একমাত্র। চার বছর হয়েছে ওর, কিন্তু কখনও দেখিনি ওকে। একটা ছবি ছাড়া ওর আর কি আছে আমাদের কাছে?' থেমে বুড়োর উদ্দেশে স্মিত হাসল সায়রা, জানে কিছুটা হলেও নিরস্ত করতে পেরেছে তাঁকে। 'ঢাকায় যাব বলে বহুদিন ধরে টাকা জমাচ্ছি। স্রেফ প্রভাকে দেখার জন্যে হলেও যেতাম। এখন সায়মার চিঠিটা এসেছে যখন, যাওয়াই উচিত হবে আমার, তাই না? ওর মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে খটকা লাগছে, সেটা নিরসন হওয়া দরকার।'

'ঠিকই বলেছিস। প্রভাকে দেখার ইচ্ছে আমারও আছে, সম্ভব হলে তোর সঙ্গে চলে যেতাম···'

'কিন্তু তুমি যাই বলো না কেন, নিজের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার সামান্য কিছু খরচ করে কলকাতায় আসার গরজ অনুভব করেনি ফাহিম ইমতিয়াজ, বাচ্চা একটা মেয়েকে ওর নানী বা পরিবারের অন্য কারও সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত সেটা তার মাথায় আসেনি বোধহয়, কিংবা সে-গরজই অনুভব করেনি। দেখা হলে কথাটা বলব তাকে!'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসলেন মুকিম আহামদ। সেই সাহস আছে মেয়েটার, জানেন তিনি। দারুণ ঠোঁট-কাটা স্বভাবের মেয়ে, আর খেপে গেলে একেবারে অবাধ্য হয়ে ওঠে। 'যাই, তোর মা-র সাথে গল্প করিগে,' কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হাসলেন সায়রার উদ্দেশে, ওর ভুরু কুঁচকে যেতে দেখে একটা হাত তুললেন। 'ভয় পাস্‌নে, এ নিয়ে আলাপ করব না, অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভাবার মত অবস্থায় নেই বউ-মা। ...যাওয়ার কথা বলেছিস ওকে?'

'হ্যাঁ।'

'জহিরকে জানিয়েছিস?'

'ভাইয়া নিজেই টিকেট এনে দিয়েছে।'

'ও যেতে পারলে ভাল হত।'

'তা হত। কিন্তু ভাইয়া সময় বের করতে পারছে কই! রাত ন'টার আগে বাসায় ফেরে সে? ভাল কথা, ভাইয়ার এক বন্ধু যাচ্ছে আমার সঙ্গে। এবার বোধহয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারছ?'

কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত দেখাল মুকিম আহামদকে। 'ভোরেই তো যাবি, তুই বরং ব্যাগপত্র গোছাতে থাক্।' স্মিত হেসে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

টেবিলে একই জায়গায় বসে থাকল সায়রা, আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে চা-তে। দুই বছর আগে স্কুলের চাকুরীতে ঢোকার পর এই প্রথম ছুটি, অবসরের সুযোগ পেল। সত্যি কথা বলতে কি, ভ্রমণের ব্যাপারটাই বেশি উপভোগ্য মনে হচ্ছে ওর—অ্যাডভেঞ্চারের মত, কারণ এই প্রথম একা কোথাও যাচ্ছে—এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার ইচ্ছে ওর!

বরাবরই একা থাকতে পছন্দ করে সায়রা। নিঃসঙ্গতা বা একঘেয়েমি কখনও স্পর্শ করেনি ওকে। জহির বা সায়মা ওর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় হওয়ায় একাই বড় হয়েছে, নিজের একটা ভুবন তৈরি করে নিয়েছে। একা থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, নিজের ইচ্ছে মত কাজ করার স্বাধীনতা উপভোগ করে। ঢাকায় দুই-তিন সপ্তাহ কাটানোর মত টাকা জোগাড় করেছে, আশা করছে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না। তেমন হলেও মাঝহার চাচা তো আছেনই, ওঁর সাহায্য পাওয়া যাবে।

কাপড়-চোপড় গুছিয়ে মা-র কামরায় গেল ও।

রুগ্ন, বিষণ্ন একজন মহিলা; প্রায় সময়ই মেজাজ খিট্‌খিটে থাকে রাহেলা সুলতানার। কিন্তু একসময়, সায়রার স্পষ্ট মনে আছে–বাবা যখন বেঁচে ছিলেন–হাসি-খুশি ছিলেন মা। বাবার একার আয়ে সংসার চলত ওদের, কষ্টেসৃষ্টে কেটে যেত দিনগুলি, কিন্তু সুখের অনটন হয়নি কখনও। অর্থের ঘাটতি পুষিয়ে যেত মায়ের হাসিমুখ আর বাবার আন্তরিকতার কারণে।

তারপর হঠাৎ করেই বদলে গেছে সবকিছু। বাবার আত্মহত্যা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী সায়মার অকাল মৃত্যু···সব মিলিয়ে পরিবারটির ওপর নেমে আসে মহা দুর্যোগ। অন্যরা সামলে নিলেও একা রাহেলা সুলতানা সেই শোক সামলে নিতে পারলেন না। মানসিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেন তিনি, তখনই বোঝা গেছে স্বামীর ওপর কতটা নির্ভর করতেন মহিলা।

সারা দিন প্রায় শুয়ে-বসে কাটে ওঁর। নিঃসঙ্গ, একঘেয়ে সময়। কথা বলার মানুষ পেলে খুশিই হন। সকালে ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই বিষণ্ন হয়ে পড়েন তিনি, অনেক বেলা হয়ে গেলেও নিজের কামরা থেকে বেরোন না। দুপুরের দিকে হয়তো বিছানা ছাড়েন, কিছু একটা রান্না করেন শ্বশুর আর নিজের জন্যে। তবে মুকিম আহামদকে নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করতে হয় না, সামান্য কিছু মুখে দিতে পারলেই সন্তুষ্ট তিনি। এই বয়সেও, খাবার টেবিলে বউ-মার প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলে খুশি হন।

কিন্তু রাহেলা সুলতানার প্রসন্ন মুখ ইদানীং প্রায় বিরল হয়ে গেছে। সায়রা জানে শুধু নিঃসঙ্গতা বা বিষণ্নতাই সেজন্যে দায়ী নয়, বরং কিছুটা হলেও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। চিকিৎসা করালে হয়তো আবারও আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেন। চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু এক বাক্যে না করে দিয়েছেন রাহেলা। পাগলের চিকিৎসা করাবেন কেন, তিনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে বসে ছিলেন তিনি, সায়রা কামরায় ঢুকতে মুখ তুলে দেখলেন ওকে। শূন্য নিরানন্দ দৃষ্টি চোখে।

'কেমন আছ, মা?' পাশে বসে মা-র একটা হাত টেনে নিল সায়রা।

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন রাহেলা।

'চা খেয়েছ?'

এবার মাথা নাড়লেন তিনি।

'অপেক্ষা করো, বানিয়ে আনছি আমি। তারপর গল্প করব দু'জনে, বহুদিন তোমার সঙ্গে…'

'বোস্, কথা আছে!' দৃষ্টি সরিয়ে জানালার দিকে তাকালেন তিনি। আচমকা নিজের ভুবনে ডুবে গেলেন, ভুলে গেলেন সায়রাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। কিছুক্ষণ পর, ঘোর কেটে যেতে ফিরে তাকালেন। 'তুই সত্যি বাংলাদেশে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ক'দিন থাকবি?'

'ধরো…দশদিন।'

'থাকবি কোথায়, বল্ তো?' এই প্রথম ভাবের প্রকাশ দেখা গেল রাহেলার মধ্যে–উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে; সন্দেহ নেই স্রেফ মেয়েলি সচেতনতাই তাড়া করছে ওঁকে, যদিও কঠিন ব্যাধির মত চারপাশে ঘিরে থাকা অপ্রকৃতিস্থ ঘোর কাটেনি এখনও।

'লালমাটিয়ার একটা গেস্ট হাউজে। কাছেই মাঝহার চাচার বাড়ি। চিন্তা কোরো না, ভাইয়ার এক সাংবাদিক বন্ধু যাচ্ছে আমার সঙ্গে।'

কি যেন ভাবলেন রাহেলা, শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। 'প্রভাকে নিয়ে আসবি?'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল সায়রা। আগেও এ ব্যাপারে মা-র সঙ্গে তর্ক হয়েছে ওর। রাহেলার ধারণা ছোট্ট মেয়েটির ওপর বাপের চেয়ে ওদের অধিকারই বেশি। ধারণাটার কারণও আছে, ফাহিম ইমতিয়াজের এমন কোন বয়স হয়নি যে আবার বিয়ে করতে পারবে না; সেক্ষেত্রে প্রভার জীবন অনিশ্চিত পথে মোড় নেবে, এই দুশ্চিন্তা থেকে কখনোই মুক্তি পাননি রাহেলা। প্রভাকে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করে দুটো চিঠি লিখেছেন, কিন্তু উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি ফাহিম ইমতিয়াজ।

'মা, আগে তো যাই ঢাকায়…তারপর না হয় প্রভার বাবার সঙ্গে আলাপ করব।'

উত্তরটা পছন্দ হয়নি রাহেলার। থমথমে হয়ে গেছে মুখ। 'হয়তো আবার বিয়ে করেছে ওই ছেলে। পুরুষ মানুষ কখনোই নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। প্রভার না জানি কত কষ্ট হচ্ছে!'

'অযথাই চিন্তা করছ, মা। ফাহিম ভাই বিয়ে করেছে এমন কোন খবর পাইনি আমরা।'

'কোন্ খবরটা পেয়েছিস তুই?'

'এই তো গত মাসেই মাঝহার চাচাকে মেইল করেছিলাম। ওঁর ধারণা প্রভা ভালই আছে।'

'মা নেই, দাদা-দাদী কেউ নেই। চাকর-বাকররা কি যত্ন নেবে ওর!' অসন্তোষ আর রোগের লক্ষণ, এবার দুটোই প্রকাশ পেল রাহেলার আচরণে। শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন, বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন কি যেন। সায়রার দিকে তাকালেন একবার, কিন্তু চাহনি দেখে মনে হলো ওকেও চিনতে পারছেন না।

'মা?'

তাকালেন না রাহেলা।

আবার ডাকল সায়রা, মনোযোগ আকর্ষণ করতে মা-র হাতে মৃদু চাপ দিল। রাহেলা ফিরে তাকাতে দেখল আর্দ্র হয়ে উঠেছে ওঁর চোখ।

'মেয়েটা···এত অল্প বয়সে মারা গেল! পুতুলের মত বাচ্চাটাই তো আমার কাছে ওর একমাত্র স্মৃতি!'

'ফাহিম ভাইকে তোমার কথা বলব, মা। অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও যেন আমাদের সঙ্গে থাকে প্রভা, রাজি করানোর চেষ্টা করব তাকে। সে নিজেই তো বেড়িয়ে যেতে পারে ক'দিন, তাই না?' স্মিত হেসে মা-র দিকে তাকাল সায়রা, আশা করল কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাবেন রাহেলা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছেন রাহেলা, কথাগুলো উপলব্ধি করতে বোধহয় সময় লাগল। শেষে স্মিত হাসলেন।

ক্ষীণ হলেও বহুদিন পর তাঁর মুখে এই হাসিটুকু দেখতে পেল সায়রা। বিছানার কিনারে সরে এসে মা-র বুকে মুখ গুঁজে দিল ও। 'অনেকদিন ধরে বলছি ভাইয়াকে একটা বিয়ে করাও। ওর বাচ্চা হলে হয়তো তোমার অসুখটাই ভাল হয়ে যাবে।'

এবার যেন প্রিয় একটা প্রসঙ্গ খুঁজে পেলেন রাহেলা। স্মিত হাসিটা প্রসারিত হলো তাঁর ঠোঁটে, উজ্জ্বল চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন, যেন আচমকা টের পেয়েছেন মৃত মেয়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়ে আসলে অন্য মেয়েকে বঞ্চিত করেছেন, বোঝেননি দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে গেছে পুতুলের মত মেয়েটা।

'উঁহুঁ, আগে তোর বিয়ে দেব,' সহাস্যে বললেন তিনি, একেবারে স্বাভাবিক একজন মানুষের মত। 'জহিরকে বলতে হবে। আচ্ছা, ওর

না এঞ্জিনিয়র এক বন্ধু আছে, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে? কি যেন নাম ছেলেটার?'

'না!' অপ্রতিভ স্বরে প্রতিবাদ করল সায়রা।

'কেন, ছেলেটা কি খারাপ?'

'খারাপ-ভালর প্রশ্ন নয়।'

'তাহলে?' চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকালেন রাহেলা।

'তাহলে কিছু নয়, মা। এখন বিয়ে করব না আমি। চাকুরীর পাশাপাশি পড়াশোনা শেষ করি আগে, তারপর না হয়…'

'ওই ছেলে বসে থাকবে ততদিন? বয়স তো কম হয়নি তোর! কত হলো যেন? দাঁড়া, মনে করি দেখি…' চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করলেন রাহেলা।

এদিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে মা-র দিকে তাকিয়ে আছে সায়রা। বহুদিন পর রাহেলাকে স্বাভাবিক একজন মানুষের মত আচরণ করতে দেখে এতটাই ভাল লাগছে যে অজান্তে চোখে পানি চলে এল। দু'হাতে রাহেলাকে আঁকড়ে ধরল ও।

দুই

সকাল সাতটায় ছাড়ল বাস।

বাসে উঠে খুশি হলো সায়রা। বাইরে কটকটে লাল রঙের হলেও ভেতরটা বিলাসবহুল-পরিসর আরামদায়ক আসন, সহনীয় মাত্রার এ.সি, জানালায় মখমলের পরিচ্ছন্ন পর্দা; "ফাউ" হালকা নাস্তা, মিনারেল ওয়াটার এবং ম্যাগাজিন; এছাড়াও চারটে স্টেরিও ডিভাইসে পছন্দমত গান শোনার সুযোগ…বারো ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রায় একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করার সবরকম আয়োজন রয়েছে।

যাত্রার শুরুতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল সায়রা। এই প্রথম একা কোথাও যাচ্ছে, তা-ও অন্য এক দেশে। উদ্বেগ এবং অস্বস্তি

থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মা আর দাদুকে ছেড়ে এসেছে, কিছুদিন এদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে ভেবে কিছুটা বিষণ্ন বোধ করছিল। কিন্তু পাশে বসা যুবকের সরব উপস্থিতিতে কিছুক্ষণের মধ্যে সবই ভুলে গেল ও।

শওকত হাসান কলকাতার "আজকের কাগজ"-এর রিপোর্টার-কাম-ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। যথেষ্ট সুদর্শন, দীর্ঘ সুঠামদেহী। আজকের আগে মাত্র দু'বার দেখা হয়েছে সায়রার সঙ্গে—একবার একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে, আরেকবার ওর বাবার চেহলামে। সৌজন্যমূলক আলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ওদের পরিচয়।

'ঢাকায় কেন যাচ্ছ?' হালকা চালে জানতে চাইল শওকত হাসান।

'ঘুরব কিছুদিন, ভাগনীকে দেখব আর···' কারণটা সঠিক জানে না সায়রা, কিন্তু আবিষ্কার করল ঢাকা ভ্রমণের অন্য উদ্দেশ্যটি অকপটে বলে যাচ্ছে। হতে পারে শওকত হাসানের পেশার কারণে, পেশাগত দক্ষতার বদৌলতে অন্য মানুষের কাছ থেকে তাদের অজান্তে কিংবা সহজ উপায়ে তথ্য বের করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার। হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে দেখাল ও। 'আসলে, ঢাকায় যাওয়ার আরেকটা উদ্দেশ্য আছে আমার। ওখানে এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছিল সায়মা, বোধহয় আগেই শুনেছেন? ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করব, সম্ভব হলে অবশ্য।'

'বলছ বিয়ে করেছিল,' খানিক দ্বিধার পর কথাটা শেষ করল শওকত। 'জহিরের কাছ থেকে ওর বিয়ের খবর শুনেছিলাম। যদ্দূর জানি মডেল হওয়ার চেষ্টা করছিল সায়মা, কিন্তু কলকাতায় সুবিধে হবে না বুঝে শেষে ঢাকায় চলে যায়। কি হয়েছে ওর?'

'তিন বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে ও।'

'আমি দুঃখিত, সায়রা।'

'শোকটা সামলে নিয়েছি আমরা,' ক্ষীণ হেসে বলল সায়রা। 'সমস্যাটা হচ্ছে, ছয় মাস আগে সায়মার এই চিঠিটা পেয়েছি আমি।' শওকত হাসানের চোখে ফুটে ওঠা নিখাদ বিস্ময় মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর খেই ধরল: 'ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। পত্রিকায় এ ধরনের ঘটনার কথা পড়েছি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রেই যে ঘটবে কে জানত! বাংলাদেশে কয়েক জায়গায় ঘুরেছে চিঠিটা, শেষপর্যন্ত যখন আমার হাতে পৌঁছল ততদিনে প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেছে।'

'অদ্ভুত, কিন্তু এরকম হয় কখনও কখনও।'

'কিন্তু চিঠিটা বিপদে ফেলে দিয়েছে আমাকে।'

'বিপদ?' চাপা কৌতূহল ফুটে উঠল শওকতের স্বরে।

'বিপদই বলা উচিত, কারণ আসলে ঠিক কি করব বুঝতে পারছি না। চিঠিটা অবশ্য একেবারে সাদাসিধে, স্বামী আর সন্তান সম্পর্কে তেমন কিছু লেখেনি সায়মা, তারপরও বোঝা যায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল ও তখন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কোন একটা ব্যাপারে। স্বামীর কাছ থেকে কিছু লুকাতে চাইছিল, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছিল সেটার পরিণতিও ভাল হবে না। চিঠির কয়েক জায়গায় লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।' থেমে চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল সায়রা। '*"সায়রা, নিজের জন্যেই করুণা হচ্ছে আমার! জীবনে কখনও এতটা অসহায় বোধ করেছি কিনা জানি না। কি করব আমি? ফাহিমের কাছে সত্যটি লুকিয়ে রাখা কোন ভাবেই সম্ভব হবে না, অথচ এর পরিণতি চিন্তা করতেও ভয় লাগছে!"* পরের দুটো লাইন পড়াই যাচ্ছে না। তারপর যা লিখেছে: *"বাধ্য হয়ে ওকে সবকিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগে বা পরে একসময় জানবেই ও, তখন হয়তো আরও বেশি খেপে যাবে। কিন্তু ওর যা মেজাজ এবং আগেরবার যা ঘটেছে, এবার নিশ্চই আমাকে খুন করবে ও!"* ' পাশ ফিরে শওকত হাসানের দিকে তাকাল সায়রা, চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে।

আনমনে মাথা নাড়ল সাংবাদিক। 'রহস্যময়, নাটুকে চিঠি,' একমত হলো সে। 'সত্যিই কি সায়মাকে খুন করেছে ওর স্বামী?'

'নাহ্, তা হবে কেন!'

শ্রাগ করল শওকত, কুঁচকে যাওয়া ভুরু দেখে বোঝা যাচ্ছে মনে মনে হিসেব কষছে। 'একটু আগে বলেছ দুর্ঘটনায় মারা গেছে সায়মা, সম্ভবত এই চিঠি লেখার পরপরই, তাই না?'

'চিঠির তারিখ সতেরোই সেপ্টেম্বর, আর ও মারা গেছে অক্টোবরের শুরুতে। সময়টা কাছাকাছি, তাই যে কারও সন্দেহ হবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার সাংবাদিক মন অযথাই সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে, শওকত ভাই।'

'হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি অস্বাভাবিক কিছু নাই দেখবে, তাহলে চিঠির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন?'

'আর কিছু না হোক, অন্তত একটা ব্যাপার পরিষ্কার: দাম্পত্য

জীবনে অসুখী ছিল সায়মা। বিয়ের পর কখনও কলকাতায় আসেনি, বাচ্চা হওয়ার সময় মা ওর কাছে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাফ না করে দেয় সায়মা। সত্যি কথা বলতে কি, দু'একটা চিঠির কথা বাদ দিলে, ওর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ ছিল না আমাদের।

'ওর অসুখী হওয়ার কারণটা জানতে চাই আমি। আর কেউ না চিনুক, ওকে তো চিনি আমি। অল্পতে অস্থির হওয়ার মত মেয়ে ছিল না সায়মা। ব্যাপারটা নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভালবেসে যে লোককে বিয়ে করেছে, কেন তাকে ভয় পাবে? কি এমন গোপন ব্যাপার ছিল যে স্বামীকে বলতে পারছিল না? ফাহিম ভাই ওকে খুন করবে, এই আশঙ্কা কি সত্যিই অমূলক ছিল?' ক্ষণিকের জন্যে থামল সায়রা, দ্বিধান্বিত এবং শঙ্কিত। প্রশ্নগুলো বহুবার ভেবেছে, এবং প্রতিবারই সন্দেহটা আরও জোরাল হয়েছে। কিন্তু শওকত হাসান কেন, নিজের কাছেই স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, অথচ অনিচ্ছার কারণটাও জানে না!

'তাছাড়া, সায়মার মেয়ে, প্রভার সঙ্গেও দেখা করতে চাই,' শেষে যোগ করল ও। 'চার বছরের বেশি হয়েছে ওর বয়েস, কিন্তু ওকে কখনও দেখিনি আমরা।'

জানালার দিকে তাকাল শওকত হাসান, আনমনে ঠোঁটে চিমটি কাটছে। 'দুর্ঘটনাটা ঘটল কিভাবে, জানো কিছু? সবকিছু খুলে বলতে নিশ্চই খারাপ লাগবে না তোমার? তাহলে বলার দরকার নেই।'

'দুর্ঘটনাটা কাণ্ডাইয়ে ঘটেছে। ফাহিম ইমতিয়াজের এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিল ওরা, সন্ধের ঠিক আগে ভিলায় ফিরে আসছিল। ভিলাটা পাহাড়ের ওপর, অন্তত কয়েকশো ফুট উঁচু তো হবেই। রাস্তাটা খুব বেশি সঙ্কীর্ণ না হলেও আঁকাবাঁকা ছিল, আর পাশেই ছিল খাদ। জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম, ঠিক বিপজ্জনক না হলেও বেখেয়ালী যে কোন ড্রাইভারের জন্যে বিপজ্জনক তো বটেই।'

ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর চিঠিতে লেখা তথ্যগুলো মনে করার চেষ্টা করল। 'ঢালু রাস্তা ধরে নেমে যাচ্ছিল ওরা, বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। হঠাৎ ব্রেক-ফেল করে কিনারে চলে যায় গাড়িটা। বিপদ দেখে দু'জনেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওরা, কিন্তু খাদে গিয়ে পড়ে সায়মা। ঘাড় মটকে মারা যায় ও।'

'গাড়িটা?'

'খাদে পড়ে গেছে।'

'ব্রেক-ফেলের কথা বললে না? খাদে গিয়ে পড়েছে···মনে হয় না পরে গাড়ির কোন কিছু অবশিষ্ট ছিল।'

'খাদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে গিয়েছিল গাড়িতে। পুড়ে গেছে ওটা।'

'কার কাছ থেকে জানলে এসব?' নিরীহ সুরে জানতে চাইল শওকত।

'ফাহিম ইমতিয়াজ···'

'এতক্ষণ তাহলে ফাহিম ইমতিয়াজের বক্তব্য বলে গেছ? তথ্যগুলো সে-ই জানিয়েছে তোমাকে–বিশেষ করে ব্রেক-ফেলের গল্পটা?'

'হ্যাঁ···'

'নিশ্চই সে নিজেই ড্রাইভ করছিল?'

মাথা ঝাঁকাল সায়রা।

'ইন্টারেস্টিং!'

আচমকা সচেতন হলো সায়রা, বুঝতে পারছে খেয়ালের বশে শওকত হাসানকে সবকিছু বলে ফেলা ঠিক হয়নি। শুনেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে সে। হয়তো পেশাগত কারণেই, মনে উঁকি দেওয়া বিশ্রী সন্দেহটাও তাড়ানোর প্রয়োজন মনে করছে না, অথচ ব্যাপারটা অনুচিত।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভাবল ও, এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই। নিরুৎসাহিত করতে গেলে বরং আরও সন্দিহান হয়ে উঠবে শওকত হাসান, এবং প্রসঙ্গটা আবার উঠে আসবে। তারচেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

আড়চোখে সাংবাদিকের দিকে তাকাল ও, কি যেন ভাবছে সে। কুঁচকে আছে কপাল, হাতের ম্যাগাজিন ধরে আছে চোখের সামনে, কিন্তু কিছুই পড়ছে না।

'কি জানো, সায়রা, ব্যাপারটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং!' নিচু স্বরে নীরবতা ভাঙল সে। 'সায়মার চিঠিটা রহস্যময় তাতে কোন সন্দেহ নেই, ফাহিম ইমতিয়াজ লোকটাকেও ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ভাবছি ঢাকায় গিয়ে ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর করব। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তাই না? আমার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি ছুটির মধ্যে এমন আজব একটা কেস পেয়ে যাব!'

'ওরকম কিছুই করবেন না আপনি, শওকত ভাই!'

'কেন?' বিস্ময় সাংবাদিকের কণ্ঠে।

চুপ করে থাকল সায়রা। ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী মানুষটা কেমন জানা নেই ওর, তবে এটুকু জানে চট্টগ্রামের অভিজাত একটি পরিবারের সন্তান সে, এক কথায় কোটিপতি এবং প্রভাবশালী। ভিন দেশের এক সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলালে নিশ্চই খুশি হবে না, যেখানে স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা জড়িত।

সায়রার নীরবতায় সতর্ক হয়ে গেল শওকত। হঠাৎ করে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মেয়েটিকে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বসার ভঙ্গি আড়ষ্ট, দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। বোঝা যাচ্ছে মুখ খুলবে না আর।

মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে নিয়ে চুমুক দিল ও। আনমনে কাঁধ উঁচাল। সায়রা নিজেই কি রহস্যময় আচরণ করছে না? একটু আগে অনর্গল বলে যাচ্ছিল, অথচ সেজন্যে অনুশোচনা করছে এখন!

সায়মার মৃত্যু কিভাবে হলো, তাতে কি আসে-যায় ওর? ম্যাগাজিনে মনোযোগ দিল শওকত, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল ঘটনাটা।

কিন্তু সহজ হলো না কাজটা। এমন নয় যে খুব বেশি আগ্রহ বোধ করছে কিংবা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে, আসলে স্রেফ কৌতূহল বোধ করছে ও। সত্যিই কি দুর্ঘটনা সেটা? সায়মার আশঙ্কার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই তো? চিঠি লেখার বিশ দিনের মধ্যে মারা গেছে ও, সত্যিই কি এতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই?

'দেখতে কেমন সে?' একটু পর জানতে চাইল শওকত হাসান। 'ফাহিম ইমতিয়াজের কথা বলছি।'

'জানি না আমি। কখনও দেখা হয়নি আমাদের।'

'সত্যি? কিভাবে সম্ভব?'

'ঢাকায় সায়মার সঙ্গে পরিচয় হয় ফাহিম ইমতিয়াজের। বিয়ের পরও কখনও কলকাতায় ফিরে যায়নি সায়মা।'

'কিন্তু ওর মৃত্যুর পর···তোমরা কেউ ঢাকায় যাওনি?'

'ঢাকায় কবর দেয়া হয়েছে ওকে। মা তখন অসুস্থ ছিলেন, আমার বা জহির ভাইয়ের পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।'

'তাহলে···ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী সম্পর্কে আসলে কিছুই জানো

না তোমরা–দেখতে কেমন সে, কি করে…'

'ঠিকই বলেছেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সায়রা। চায় না প্রসঙ্গটা আরও এগোক, অজানা কোন কারণে অস্বস্তি বোধ করছে। এখন পর্যন্ত যাত্রাটা উপভোগ্য মনে হচ্ছে ওর, তিক্ত প্রসঙ্গে আলাপ করে ভ্রমণের আনন্দ মাটি করতে চায় না।

বারাসাত পেরিয়ে এসেছে গাড়ি, পিচ-ঢালা পথে ছুটছে যশোর রোড ধরে। দেবদারু, শাল, মেহগনি আর জারুলের সারি দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত; কালের সাক্ষী–অটল কিন্তু নির্বাক। কয়েক মানুষ সমান চওড়া গাছের শাখা-প্রশাখা প্রায় ছাতার মত আগলে রেখেছে পুরো রাস্তা।

গাছগুলো বৃটিশ আমলে লাগানো, বাবার কাছে শুনেছে সায়রা। এখন সড়ক বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পত্তি। দারুণ মূল্যবান সম্পত্তি। একেকটা গাছই পনেরো-বিশ হাজার টাকায় বিক্রি হতে পারে।

রাস্তার পাশে সবুজ খেতে কাজ করছে চাষীরা। মাঝে মধ্যে দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ছে–মাটির কিংবা পলেস্তারাবিহীন ইটের দালান; কোনটার ছাদই ঢালাই করা নয়, সব অ্যাসবেস্টসের তৈরি। জীর্ণ কিছু কুটিরও চোখে পড়ছে।

চোখ বন্ধ করে ফাহিম ইমতিয়াজকে ভোলার চেষ্টা করল সায়রা। সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ, যাকে ঘিরে হাজারটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ওর মনে। সায়মার দেয়া তথ্য থেকে ধারণা করতে চেয়েছে, কিন্তু সবই অনুমান আর কল্পনা বলে গুলিয়ে ফেলেছে শেষে। বাস্তবে রক্তমাংসের মানুষটি দেখতে কেমন? সত্যিই কি বদমেজাজী সে, এতটাই যে স্ত্রীকে খুন করতেও দ্বিধা করেনি?

শওকত হাসানের তীক্ষ্ণ প্রশ্নগুলোও খোঁচাচ্ছে ওকে, সন্দেহ আর অবিশ্বাস জন্ম দিচ্ছে মনে। অচেনা-অজানা একজন মানুষ সম্পর্কে এত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া কি ঠিক হবে? সায়রার অন্তত আপত্তি আছে। হয়তো ফাহিম ইমতিয়াজ একেবারেই নির্দোষ, পরিস্থিতি আর সায়মার অদ্ভুত চিঠিটার কারণে দোষী মনে হচ্ছে তাকে!

সায়মার চরিত্রেও কি ত্রুটি ছিল না? নিশ্চই ছিল। বোনকে ভাল করেই চিনত সায়রা। কয়েক বছরের ছোট হলেও ব্যক্তিগত বিষয়ে

ওকে প্রায় সব কথাই বলত সায়মা; বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না, বরং বড়াই করে বলত। সবে তখন আলীগড়ে ভর্তি হয়েছে ও। আকর্ষণীয় ফিগার আর রূপের কদর ছিল ওর ক্যাম্পাসে, অসংখ্য বন্ধু জোটাতে তাই কোন অসুবিধে হয়নি।

রূপ থাকতে মগজ খাটিয়ে কিছু করার ব্যাপারে যেমন অনিচ্ছুক ছিল ও, তেমনি খুব তাড়াতাড়ি খ্যাতি আর সমৃদ্ধির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। টুকটাক মডেলিং করত আগে থেকেই, আহামরি কিছু না হলেও স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কল্যাণে মোটামুটি পরিচিতি পেয়েছিল। সায়মার উচ্চাশা ছিল সিনেমা করবে, কিন্তু আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেনি কেউ।

ঢাকার একটা থিয়েটার গ্রুপ কলকাতায় ট্যুরে গিয়েছিল, এদের সঙ্গে আচমকা ভিড়ে যায় সায়মা। খ্যাতি আর সমৃদ্ধির রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় চলে যায় ও, পরিবারের অন্যদের আপত্তি বা অনুরোধ কোনটাই গায়ে মাখেনি। মা তখন হাসপাতালে, স্পষ্ট মনে আছে সায়রার, আর ঠিক কয়েক মাস আগে মারা গেছেন বাবা।

ঢাকায় এসেই ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে পরিচয় হয় সায়মার, পরে চিঠি লিখে জানিয়েছিল সায়রাকে। মাস দুয়েক পরই বিয়েতে গড়ায় সম্পর্কটা। লোভ আর মোহ তাড়া করেছিল সায়মাকে, বোন কখনও স্বীকার না করলেও ঠিক অনুমান করতে পারছে সায়রা। শো-বিজনেসের সঙ্গে জড়িত বলে ফাহিম ইমতিয়াজকে নিশ্চই নিজের উত্তরণের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সায়মা।

বাসের মৃদু ঝাঁকুনিতে কখন ঢুলতে শুরু করেছে, নিজেও জানে না ও, অজান্তে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল, এরইমধ্যে দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে! পাশ ফিরে দেখল ঘুমাচ্ছে শওকত।

ঝিমুনি কাটাতে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল ও, বোতল থেকে পানি খেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক দৃষ্টিতে, মনে জমে থাকা ভাবনার পাহাড়গুলো দূরে ঠেলে দিচ্ছে বারবার। কিন্তু কিসের কি! ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে টের পেল আবারও বন্ধ হয়ে আসছে চোখ।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে সীটের ওপর মাথা এলিয়ে দিল সায়রা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল বাইরের দিকে। রাস্তার ধারে একটা সাইনপোস্ট চোখে পড়ল: *হরিদাসপুর, বারো মাইল*। বারো মাইল পরে

বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করবে!

ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা বোধ করছে ও, কারণটা জানা নেই। দেশটা আসলে কেমন? সত্যিই কি কোন পার্থক্য নেই ওদের সঙ্গে? বরাবর যা শুনে এসেছে, সেটাই কি ঠিক–মানুষগুলো আন্তরিক, বন্ধুত্বপূর্ণ কিন্তু আরামপ্রিয়, বেহিসেবী এবং বিলাসী? সত্যিই অসাম্প্রদায়িক এরা?

বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ! মানবাধিকার লঙ্ঘনে দ্বিতীয়! শিশু আর নারী নির্যাতনে অদ্বিতীয়! সবচেয়ে অসৎ রাজনীতিকদের আড্ডাখানা! অশিক্ষা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, ঘনবসতি, পাহাড়সমান বৈদেশিক ঋণ আর পঙ্গু অর্থনীতির নামই কি বাংলাদেশ? অথচ এরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছে, শুধু সাহস আর দেশপ্রেম নিয়ে বর্বর হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে!

শুধু এসবই নয়, নিশ্চই আরও কিছু পরিচয় আছে দেশটার। সব মানুষ খারাপ হয় কি করে? মমতাময়ী নারী, নিষ্পাপ শিশু, প্রাণচঞ্চল তরুণ কিংবা কর্মঠ পুরুষ…সব জায়গায় আছে। দরকার এদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সুযোগ্য নেতৃত্ব।

'চা খাবে নাকি?'

শওকত হাসানের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পেল সায়রা।

হাই তুলছে সাংবাদিক, দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'খিদে লেগেছে?' সায়রাকে মাথা নাড়তে দেখে ক্ষীণ হাসল। 'চা-র তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চই? হরিদাসপুর চলে এসেছি। ইমিগ্রেশন আর কাস্টম্‌সের ঝামেলা সামাল দিতে বিশ-ত্রিশ মিনিটের মত লাগবে। এ সুযোগে নিশ্চিন্তে চা খাওয়া যাবে।'

'পাবেন কোথায়, কাস্টম্‌সের লোকেরা খাওয়াবে নাকি?' হালকা সুরে জানতে চাইল ও।

'উঁহুঁ, অনেক দোকান আছে ওখানে।'

হরিদাসপুর পৌঁছার পর অবশ্য ভিন্ন চেহারা দেখতে পেল সায়রা। দোকান-পাট আছে বটে, কিন্তু কোনটাই রেস্টুরেন্ট বা টি-স্টল নয়। এরচেয়েও চালু ব্যবসা করছে এরা–মানি একচেঞ্জ।

'বৃটিশদের শিক্ষা দেখি বেমালুম ভুলে গেছে এরা!' কিছুটা হতাশ সুরে কৌতুক করল শওকত হাসান, আশপাশে টি-স্টল না থাকায়

রীতিমত বিস্মিত। 'আমি তো জানতাম ইংরেজদের শেখানো এই একটা জিনিস ভুলতে পারেনি বঙ্গসন্তানেরা।'

বাস থেমেছে ঠিক ইমিগ্রেশন বিল্ডিংয়ের সামনে। নিচে নেমে চারপাশে তাকাল সায়রা। কাস্টমস বিল্ডিংয়ের পাশে দুটো রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। 'ভোলেনি, শওকত ভাই। ওই যে চা-অলারা বসে আছে আমাদের জন্যে, পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খসানোর তালে আছে ওরা!'

'কোথায় যাচ্ছেন, ম্যাডাম?' জানতে চাইল বাসের গাইড।

'চা খাব।'

'দেরি করবেন না। বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের। দুটোর মধ্যে যশোর পৌঁছতে হবে, ওখানেই লাঞ্চ করব আমরা।'

ঘড়ি দেখল সায়রা। সাড়ে এগারোটা বাজে।

'কতক্ষণ লাগবে?'

'নির্ভর করে কখন এখানকার ঝামেলা শেষ হয় তার ওপর। এক কাজ করুন, সঙ্গে ইমিগ্রেশন ফর্ম নিয়ে যান। চা খাওয়ার ফাঁকে পূরণ করে ফেলবেন, কাজ এগিয়ে যাবে।'

দুটো কাগজ ওদের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

আড়ষ্ট পায়ে এগোল সায়রা। ইচ্ছে করছে আড়মোড়া ভাঙে, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। এমনিতেই শতাধিক মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। প্রতিটা দোকান থেকে বিভিন্ন ভাবে ডাকছে মানি এক্সচেঞ্জের লোকেরা।

'দিদি, ডলার ভাঙাবেন?'

'বাংলা টাকা লাগবে?'

'রূপী নিয়ে গিয়ে ওদেশে কি করবেন? আমাদের দিয়ে-যান!'

'ভাল দর দেব! আমার এখানে আসুন!'

'সবারচে' বেশি দর পাবেন আমার এখানে। এনক্যাশমেন্ট রিসিটও দেব!'

সবার আগ্রহে পানি ঢেলে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল ওরা। পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি টেবিল ক্লথ, পরিষ্কার জগ-গ্লাস, মিনারেল ওয়াটারের বোতল সাজানো টেবিলে।

'অন্য কিছু খাবে?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল শওকত হাসান।

'নাহ।'

'উঠছ কোথায়?' ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে হঠাৎ জানতে চাইল সে।
'লালমাটিয়ার একটা গেস্ট হাউজে। আপনি?'
'ঠিক করিনি এখনও।'
'আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না! হয়তো খালি কামরা পাওয়া যাবে।'
ইমিগ্রেশন ফর্মে সায়রার দেয়া লালমাটিয়ার গেস্ট হাউজের ঠিকানা লিখল সাংবাদিক। 'কখনও খেয়াল করেছ, দীর্ঘ যাত্রায় দুটো জিনিস পেয়ে বসে মানুষকে—একটা হচ্ছে বল্গাহীন কল্পনা, আজগুবি সব ভাবনা খেলে যায় মাথায়: আরেকটা হচ্ছে অবসাদ। কোন কারণ ছাড়াই ক্লান্তি আর ঝিমুনি পেয়ে বসে, হয়তো বাস বা ট্রেনের দুলুনিও দায়ী সেজন্যে।'
শওকত হাসানের তত্ত্বে আগ্রহ বা আস্থা কোনটাই নেই সায়রার, তাই সযত্নে এড়িয়ে গেল প্রসঙ্গটা। অবশ্য খুব একটা বাড়িয়ে বলেনি সে, দীর্ঘ যাত্রায় কিছু করার থাকে না বলেই ভাবতে পছন্দ করে মানুষ, কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দেয়: দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততায় ভাবার সুযোগ হয় না, এমন সব বিষয়ে ভাবতে শুরু করে।
দুই দফা কাস্টমস, ইমিগ্রেশন আর সিকিউরিটি চেকপোস্ট পেরিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আবার যাত্রা করল ওরা। যশোর পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় একটা বেজে গেল। শহরের শুরুতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে থামল গাড়ি। জায়গাটা নিরিবিলি, পাশেই পেট্রল পাম্প। আরও দুটো গাড়ি থেমেছে এখানে।
পরিচ্ছন্ন ছিমছাম রেস্তোরাঁটিতে লাঞ্চ করল ওরা। দেড়টার দিকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করল গাড়ি।
'খাওয়াটা বেশ ভাল,' তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল শওকত হাসান। 'এবার আয়েশ করে একটা ঘুম দিয়ে নিই।'
মৃদু হাসল সায়রা, কিছু বলল না। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের পরিবেশের খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়েনি। রাস্তার পাশে ঘর-বাড়ি বা সবুজ খেতের চেহারা একই রকম। এমনকি কথার টানের মধ্যেও তফাৎ নেই তেমন। রাস্তাটা চওড়া, আর যানবাহনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য চোখে পড়েছে—হাইওয়েতে রিকশা চলছে; বাস-ট্রাক বা ছোট গাড়িগুলো অনেক বেশি সুন্দর। বোঝাই যায় বিদেশ থেকে

আমদানি করা।

ছ'টার দিকে কলাবাগানে থামল ওদের বাস। তিলোত্তমা নগরীর বুকে তখন রাত আর কুয়াশা জাঁকিয়ে বসেছে পুরোপুরি। সোডিয়াম বাতিগুলোকে অস্পষ্ট, ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দীর্ঘ রাস্তায় চোখ বুলাল সায়রা, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছে অনেক গাড়ি। অবশ্য গাড়ির চেয়ে রিকশাই বেশি, কয়েক গুণ বেশি। ঢাকাকে বোধহয় মসজিদের শহরের পাশাপাশি রিকশার শহরও বলা যায়, কৌতুকের সঙ্গে ভাবল ও।

এবং দূষিত এক শহর, বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝাল উষ্ণ বাতাসের অস্তিত্ব অনুভব করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো সায়রা। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে শওকত হাসানের জন্যে অপেক্ষায় থাকল, ক্যাব ডাকার জন্যে বাস কাউন্টারে গেছে সে।

'কই যাইবেন, আফা?' বুড়ো এক রিকশাঅলা জানতে চাইল।

'রিকশায় যাব না, চাচা।'

'দূরে যাইবেন? অসুবিদা নাই, ঠিক লইয়া যামু।'

পেছনে হর্ন বাজছে, আরও দুটো রিকশা এসে থেমেছে। মুহূর্তের মধ্যে যানজট! তীব্র খিস্তি শুরু করল পেছনের রিকশাঅলারা। বাধ্য হয়ে প্যাডাল চাপল বুড়ো, শেষবারের মত প্রত্যাশার চাহনি ছুঁড়ে দিল সায়রার দিকে। কিন্তু শিকে ছিঁড়ল না তার ভাগ্যে।

'কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে ক্যাব,' পাশ থেকে বলল শওকত হাসান। 'চলো, অফিসে গিয়ে বসি। এ.সি আছে।'

কিছুক্ষণ নয়, প্রায় বিশ মিনিট পর পৌঁছল ক্যাব। ততক্ষণে মিটারে ছত্রিশ টাকা উঠে গেছে। হলুদ গাড়িটায় উঠে বসার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সায়রা। সীটের ওপর শরীর এলিয়ে দিল। সামনে, প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছে শওকত হাসান। ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে শহর, তারপর সাধারণ মানুষ থেকে রাজনীতি পর্যন্ত গড়াল দু'জনের আলাপ।

ক্লান্তি লাগছে ওর। চোখ বুজে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করল, শওকত হাসানের প্রশ্ন কিংবা ড্রাইভারের বিনম্র জবাব প্রায় উপেক্ষা করছে। নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে মাঝে মধ্যে চোখ মেলে তাকাল রাতের ঢাকা মহানগরীর দিকে, কিন্তু খুব একটা আগ্রহ বোধ করছে না। জানে কলকাতার চেয়েও নোংরা শহর ঢাকা, অথচ একসময় ঠিক

উল্টো অবস্থা ছিল।

গেস্ট হাউজটা খুঁজতে হলো না। ড্রাইভার লোকটা আগে থেকে চেনে বলে অযথা হয়রানি বেঁচে গেল ওদের। মূল রাস্তা দিয়ে গলিতে ঢুকে দোতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। ব্যাগপত্র রিসেপ্‌শন পর্যন্ত পৌঁছে দিল ড্রাইভার। তাকে মোটা বকশিশ দিয়েছে শওকত হাসান।

একতলায় খালি একটা কামরা পাওয়া গেল। দেখার গরজও অনুভব করল না শওকত, সরাসরি ব্যাগপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ক্লান্ত শরীরে অসময়ে অন্য কোথাও ঢুঁ মারতে অনীহা বোধ করছে।

দোতলায় কোণের একটা কামরায় সায়রার ব্যাগ পৌঁছে দিল বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে।

'আমার নাম আলম,' নিজেই পরিচয় দিল সে। চটপটে, হাসি-খুশি দেখাচ্ছে সারাক্ষণ। 'চা খাবেন, দিদি?'

'বেশ তো। বানাবে কে, তুমি?'

'জ্বী-না। বাবুর্চি আছে, সে-ই বানিয়ে দেবে।'

'আধ-ঘণ্টা পর দিতে বোলো। গোসল সেরে নিচে নামব আমি।'

ছেলেটা চলে যেতে দরজা বন্ধ করে পুরো কামরায় চোখ বুলাল সায়রা। ছোট হলেও গোছানো, পরিচ্ছন্ন এবং ঘরোয়া একটা আবহ আছে। বিলাসবহুল কোন উপকরণ নেই, তারপরও বলা যায় আসবাবপত্র যথেষ্ট। ছোট্ট অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ আর ব্যালকনি আছে।

ব্যালকনিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও। নিচের রাস্তায় যানজট লেগে আছে। কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি গাড়ি এখানে। ছোট একটা গলিতেই এত যানজট!

কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ দেশে তৈরি অ্যাম্বাসেডর কিংবা মারুতি কেনার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এখানে বোধহয় টয়োটা বা হোন্ডা কোম্পানির সুদৃশ্য গাড়ির আবেদনই বেশি। লক্ষ লক্ষ গাড়ি আমদানি বাবদ বছরে কত কোটি টাকা বেরিয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে? সেই টাকা দিয়ে কি দু'একটা কারখানা তৈরি করা যায় না?

সময় নিয়ে গোসল সারল ও, অনুভব করল ঝরঝরে লাগছে এখন। চুল শুকানোর জন্যে সিলিং ফ্যান ছেড়ে বিছানায় এসে বসল, শওকত হাসানের দেয়া সিটি-ম্যাপটা বের করল পার্স থেকে। ধানমন্ডির অবস্থান স্পট করল ও। ফাহিম ইমতিয়াজের বাসা নিশ্চই লেকের কাছাকাছি। বাড়িটা চিনে আসবে? নাহ্, তাড়াহুড়োর কি আছে!

আগে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটুক, ভাবল সায়রা, সকালে ধানমন্ডি গিয়ে কোটিপতির বাড়ি চিনে আসবে; এবং সুযোগ হলে দেখা করবে তার সঙ্গে। ব্যাপারটা সহজ হবে না, সেজন্যে ওর নিজেরও কিছু প্রস্তুতি দরকার।

Suvom

সায়মার চিঠিটা বের করে পড়ল ও, বোঝার চেষ্টা করছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো লাইনই গায়েব হয়ে গেছে। *সায়মা আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিল?* অনুমান করার চেষ্টা করল সায়রা, কিন্তু বরাবরের মতই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

পার্স থেকে প্রভার ছবি বের করল ও। বছর দুয়েক আগে পাঠিয়েছিল ফাহিম ইমতিয়াজ। আঠারো মাস বয়সী বাচ্চা একটা মেয়ে। কচি মুখ, মায়ায় ভরা দুটো চোখ। এক মাথা ঘন কালো চুল, কালো চোখ। পাশে দাঁড়ানো কারও উদ্দেশে হাসছে মেয়েটা।

সায়মার মত হয়নি ও, ভাবল সায়রা, *বাপের মত হয়েছে? হয়তো।*

তিন

ঢাকার আবহাওয়া প্রায় কলকাতার মতই, তাপমাত্রার হেরফের হবে না তেমন; বড়জোর দু'এক ডিগ্রি কম-বেশি হবে। বাস থেকে নামার পর টের পেয়েছে বাইরে যথেষ্ট শীত। চার দেয়ালের মাঝে শীত তেমন না লাগলেও শাড়ির ওপর কার্ডিগান চাপিয়েছে সায়রা। নিচে ডাইনিং-কাম-সীটিংরুমে নেমে এল এরপর।

কামরাটা বিশাল। গোছানো। এক দেয়ালে অ্যাকুয়ারিয়াম, টিভি ট্রলি আর শো-পীস স্ট্যান্ড। সুদৃশ্য সব শো-পীস শোভা পাচ্ছে। ঠিক মাঝখানে মেহগনির ডাইনিং টেবিল। অন্যদিকে সোফা আর সেন্টার টেবিল। আরেক দেয়ালে বুক-শেলফ, নামকরা লেখকদের বেশ কিছু বই দেখা যাচ্ছে। ঘরের বিভিন্ন কোণে হরেক রকম সুদৃশ্য গাছের টব।

আগেই উপস্থিত হয়েছে শওকত হাসান। সোফায় বসে টিভি দেখছে সে, কোলের ওপর একটা পত্রিকা। চোখ তুলে ওকে দেখতে পেয়ে হাসল।

'বোসো।'

বসল সায়রা। চায়ে চুমুক দেয়ার ফাঁকে রোড-ম্যাপটা বের করল পার্স থেকে। 'ভাবছি ফাহিম ইমতিয়াজের বাড়িটা চিনে আসব। ধানমন্ডি লেকের ধারে-কাছে হবে নিশ্চই। ফেরার সময় বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ঘুরে দেখব।'

'এসেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ?' হালকা চালে বলল শওকত. চায়ে চুমুক দেয়ার সময় স্মিত হাসল। 'রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না তোমার। কলকাতায় অনেক রাতেও একা বাসায় ফেরে মেয়েরা, ফুটপাতে নিশ্চিন্তে হাঁটতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্যি এখানে সেটা সম্ভব নয়।'

'মনে হচ্ছে ঢাকায় আগেও এসেছেন?'

'দু'বার।'

'ঠিক আছে, না হয় সকালেই যাব।'

'তুমি আপত্তি না করলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ, শওকত ভাই।'

'দেখো, লেক-টা বত্রিশ নম্বরের শুরুতে,' রোড-ম্যাপ আর ফাহিম ইমতিয়াজের বাসার ঠিকানা লেখা কাগজটা টেনে নিয়ে দেখল সাংবাদিক। 'ফাহিম ইমতিয়াজের বাসা কাছাকাছি হওয়ার কথা। বাড়িটা স্পট করে লেকের পাড় ধরে হেঁটে মিরপুর রোডে চলে আসব আমরা। কাজও হবে, বেড়ানোও হবে। ফেরার পথে এলিট হাউজে রাতের খাবার খেয়ে নেব।'

ভুরু কোঁচকাল সায়রা। 'এলিট হাউজ? পাঁচ-তারা হোটেল নাকি?'

'উঁহুঁ, ঢাকার সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁগুলোর একটা।'

ক্ষীণ হাসল ও। 'নিশ্চই অনেক খরচ হবে...'

'দূর! খুব বেশি হবে না। সবে তো এলে, এখনই হিসেব করতে শুরু করলে ঘুরবে কিভাবে?' হেসে ওকে আশ্বস্ত করল সে, তারপর খেই ধরল: 'একটা সন্ধের জন্যে উচ্চবিত্ত হলাম না হয়! সমাজের ওই শ্রেণীটাকে কাছ থেকে দেখার খুব ইচ্ছে আমার, কৌতূহল বলতে পারো। দেখা যাক, সময়টা কেমন কাটে। প্রমিজ, আমি অন্তত

উপভোগ করব!'

ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল শওকত হাসান। ফোনে একটা ক্যাব ডেকেছে। রাতে খাবে না, জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

পরিকল্পনা বদলে বত্রিশ নম্বরে চলে এল ওরা। বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ঘুরে দেখল মিনিট ত্রিশেক, তারপর হেঁটে লেকের দিকে এগোল। শীতের রাত্রি বলে রাস্তায় লোকজন কম।

'কিছুক্ষণ দাঁড়াই এখানে,' ব্রীজের ওপর ওঠার পর প্রস্তাব করল শওকত হাসান। 'লেক-টা দেখতে ভালই লাগছে। বাদাম খাবে?'

নিচে বয়ে যাওয়া শান্ত পানির দিকে তাকাল সায়রা, লাইট-পোস্টের আলোয় একটু বেশিই কালো দেখাচ্ছে পানি। লেক ধরে তাকাল ও, অসংখ্য জারুল, কড়ই আর দেবদারুর ছায়া পড়েছে পানিতে, তারই ফাঁক-ফোকরে পার্শ্ববর্তী দালানের আলোকিত প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে, ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলায় কাঁপছে পুরো দালান।

মোড়ের প্রথম বাড়িটাই ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর, ঠিকানা মিলিয়েছে ওরা। সাদা রঙের ডুপ্লেক্স বাড়ি। আশপাশের দালানগুলোর তুলনায় সুদৃশ্য এবং বিশাল।

'ভাবছি প্রভা ওখানে আছে কিনা,' অন্যমনস্ক সুরে বলল সায়রা, দোতলার একটা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

'থাকলেও নিশ্চই ঘুমাচ্ছে ও এখন। ...বেশ শীত পড়ছে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না, শেষে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

মিরপুর রোডের কাছাকাছি ফিরে এল ওরা। মোড়ে বিখ্যাত একটা রেস্টুরেন্ট, নিয়ন সাইনে "এলিট হাউজ" নামটা ঝলমল করছে। দালানের নিখুঁত সৌন্দর্য আর ঝলমলে আলোকসজ্জায় অপূর্ব লাগছে।

'এটাই ঢাকার সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁ?' শওকত হাসানের উত্তরের অপেক্ষা করল না সায়রা, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে রেস্তোরাঁর সুদৃশ্য লন, কার-পার্ক আর বাড়ির কাঠামো। 'নামটা সার্থক! সত্যিই কি ঢুকবেন ওখানে?'

'ঢুকব কি? বলো পেট ভরে খাব!' কৌতুক সাংবাদিকের কণ্ঠে। 'কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এলিট শ্রেণীর লোকজন হতে যাচ্ছি আমরা!'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই, সায়রা। ঢাকার সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয় এক কাপ কফি খাব না সেটা কি করে হয়!' বলেই সায়রার একটা কব্জি

চেপে ধরল সে, তারপর আচমকা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল এলিট হাউজের গেট দিয়ে। দীর্ঘ লনে হরেক রকম ফুলের বাগান; হাস্নাহেনা, গোলাপ আর গন্ধরাজের মিশ্র গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করতে পারল সায়রা।

এলিট হাউজের উজ্জ্বল আলোকিত প্রবেশপথ নীরবে আহ্বান করছে ওদের। প্রলোভনটা শওকত হাসানের কাছে অদম্য মনে হলো। দ্রুত পা ফেলছে সে। তাল মেলাতে হিমসিম খাচ্ছে সায়রা।

ভেতরে মিষ্টি নীল আলো জ্বলছে। নিচু স্বরে ইংরেজি গান বাজছে ছাদ আর দেয়ালে বসানো স্পীকারে। জানালার কাছাকাছি একটা টেবিলে এসে বসল ওরা।

'এখানকার খাবার নিশ্চই খুব চড়া দামের হবে,' নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সায়রা। 'উঁহুঁ, তর্ক করবেন না। শুধু কফি খেয়েই চলে যাব আমরা।'

'শুধু কফি?' হতাশ সুরে বলল শওকত হাসান। 'এক বন্ধুর কাছে শুনেছি এদের আইসক্রীমটা নাকি দারুণ। আবার কখনও আসার সুযোগ হয় কিনা কে জানে! আইসক্রীমটা চেখে দেখলে ভাল হত না?' অনুমোদনের দৃষ্টিতে তাকাল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল সায়রা। সুদর্শন ওয়েটার ফরমাশ নিয়ে চলে যাওয়ার পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কার-পার্কে সাদা একটা মার্সিডিজ ঢুকেছে এইমাত্র। 'গাড়িটা দেখেছেন? বিশাল এবং দামী!'

'মার্সিডিজ!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল শওকত। 'কিছু কিছু লোকের কাছে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি টাকা আছে। আরে, এ যে চৈতী চৌধুরী! চিনতে পেরেছ?'

চৈতী চৌধুরীকে চেনে না সায়রা, কিন্তু নাম শুনেছে। মডেল এবং ছোট পর্দার অভিনেত্রী হিসেবে দুই বাংলায় সমান খ্যাতি অর্জন করেছে। শোফার গাড়ির দরজা মেলে ধরতে বেরিয়ে এল যুবতী, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সায়রা, চোখ সরাতে পারছে না। সুন্দরী বটে! আঁটসাঁট একটা থ্রী-পীস ধারাল শরীরের প্রতিটি বাঁক ফুটিয়ে তুলেছে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। গলা, কব্জি এবং আঙুলে গহনার ঝিলিক। হাঁটার ভঙ্গিতে আভিজাত্য আর আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে, স্পষ্ট বোঝা যায় নিজের রূপ আর আবেদন সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন।

'কেউ কেউ সত্যিই ভাগ্যবান, খুব বেশি ভাগ্যবান!' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল শওকত।

'মহিলা সত্যিই সুন্দরী, তাই না?'

উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুদর্শন এক যুবক, চৈতী চৌধুরীর উদ্দেশে বলল কি যেন। উত্তরে হেসে উঠল সুপার মডেল, যুবক পাশে এসে দাঁড়াতে তার একটা বাহু চেপে ধরে এগোল দরজার দিকে।

চৈতী চৌধুরী নিজেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তার সঙ্গীও মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবিদার। দীর্ঘ, সুঠামদেহী সে; সুদর্শন। কোঁকড়ানো চুল কাঠিন্য এনে দিয়েছে চেহারায়, শান্ত কালো চোখ। কালো জিন্স আর টি-শার্ট পরেছে সে, ওপরে ডিনার জ্যাকেট।

'ওরা দু'জনেই অন্য শ্রেণীর লোক,' আবারও মন্তব্য করল শওকত।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল সায়রা, বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কফির দিকে মনোযোগ দিল। চুমুক দেয়ার সময় দরজার দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি, দেখল চৈতী চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে যুবক। আচমকা, নিতান্ত অপরিচিত লোকের ক্ষেত্রে যেমন হয়, যুবকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর।

লোকটির চোখে নিখাদ বিস্ময়। কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোদপোড়া মুখ; মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল যুবক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সায়রাকে দেখল সেকেন্ড খানেক, থমকে দাঁড়ায়নি বা হাঁটার গতিও শ্লথ হয়ে যায়নি। দৃঢ়, নিশ্চিত পদক্ষেপে চৈতী চৌধুরীর পাশাপাশি কোণের টেবিলের দিকে এগোল।

'ব্যাপার কি?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল শওকত হাসান, ব্যাপারটা সেও খেয়াল করেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি কিছুই।

'খোদা জানে!'

'ওকে চেনো তুমি?'

'না! কিভাবে চিনব?'

'কিন্তু লোকটার চাহনি দেখে মনে হলো তোমাকে চেনে, এমন ভাবে তোমাকে দেখছিল যেন ভূত দেখছে। সত্যিই কি চেনো না ওকে?'

মাথা নাড়ল সায়রা, ঘটনাটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। 'চলুন, শওকত ভাই,' কফি শেষ করে তাগাদা দিল ও; আবিষ্কার করল অদ্ভুত, ব্যাখ্যাতীত ছোট্ট ঘটনাটা যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে বেশিই নাড়া দিয়েছে ওকে। কারণটা জানে না, কিন্তু এখান থেকে সরে পড়ার তাড়া অনুভব করছে।

'ডিনারের কি হবে?' অসন্তুষ্ট স্বরে আপত্তি করল শওকত।

'না! এখানে নয়। অন্য কোথাও!' ক্ষীণ হেসে সঙ্গীর দিকে তাকাল ও, শওকত হাসানকে মুখ খুলতে দেখে একটা হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিল। 'অযথা টাকা খরচ করার কোন মানে হয় না। এখানে যে টাকা খরচ হবে, সেই টাকা দিয়ে অন্য কোথাও তিনবার খেতে পারব।'

যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারল না শওকত হাসান। আনমনে শ্রাগ করল সে। 'ঠিক আছে, চলো।'

উঠে দাঁড়াল সায়রা। অজান্তে কামরার ওপাশে চলে গেল দৃষ্টি, দেখল চৈতী চৌধুরী আর যুবকের মুখ দুটো কাছাকাছি হয়ে গেছে, আরেকটু নিচু হলে কপালে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে। দু'জনের কেউই মুখ তুলে তাকাল না।

পাশ ফিরতে নিজের ওপর শওকত হাসানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করল সায়রা। সাংবাদিকের চোখে প্রশ্ন।

হয়তো অন্য কারও সঙ্গে ভুল করেছে আমাকে, আনমনে ভাবল সায়রা, *নইলে এরকম হবে কেন?*

সাধারণত ভোরে বিছানা ছাড়ে সায়রা, ঢাকায় এসেও ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল সাতটার মধ্যে নাস্তার ঝামেলা চুকিয়ে ফেলল। একা নাস্তা করতে খারাপ লাগেনি ওর, বরং উপভোগ্য মনে হয়েছে সময়টা। নরম সেদ্ধ রুটি, সব্জি, ডিম আর কফি দিয়ে নাস্তা করেছে।

একটা দৈনিকে চোখ বুলানোর সময় আনমনে ভাবছে কখন ফাহিম ইমতিয়াজকে কিছুটা হলেও ফ্রী পাবে। সকাল দশটা বোধহয় আদর্শ সময়। শুক্রবার আজ, সম্ভবত বাড়িতে থাকবে সে।

কি ভাববে ফাহিম ইমতিয়াজ, যদি জানতে পারে আসলে ঘুরতে নয় বরং প্রভাকে দেখতে ঢাকায় এসেছে ও? এ পর্যন্ত দুটো চিঠি লিখেছে সে ওদের উদ্দেশে, কিন্তু কোনটাই আন্তরিক ছিল না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে না কি প্রতিক্রিয়া হবে কোটিপতির, কিংবা কি ধরনের

অভ্যর্থনা পাবে সায়রা। আদৌ দেখা করতে রাজি হবে তো? মা-র উদ্বেগ কাটাতে আসার জন্যে নিশ্চই ওকে দুষতে পারবে না?

শওকত হাসানকে দেখা গেল নিজের কামরার দরজায়। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস তার। গতকালের মত খোশমেজাজে নেই সে, কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

হালকা দু'একটা কথাবার্তার পর ওপরে নিজের কামরায় চলে এল সায়রা। বিছানার লাগোয়া ড্রেসিং টেবিলের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব কেমন হবে ভেবে খানিকটা হলেও দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে ভুগছে, কিন্তু জানে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে ওকে। সেজন্যে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া উচিত। বাহ্যিক আবেদনটা ভাল হলে মনে সাহস পাবে।

নীল একটা শাড়ি পরল ও। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাল, গালে হালকা প্রসাধন করে বেরিয়ে পড়ল। একটা ক্যাবে যখন উঠল, সবে তখন সাড়ে ন'টা। সময়টা কিভাবে কাটাবে ভাবছে সায়রা, দশটার আগে পৌঁছানোর ইচ্ছে নেই।

'ড্রাইভার সাহেব?' ডাকল ও।

'জ্বী, ম্যাডাম?'

'সংসদ ভবনের দিকে যান। লেক-টা দেখব। আস্তে চালাবেন। ঠিক দশটার সময় ধানমন্ডি লেকের কাছে চলে যাব আমরা।'

'জ্বী।'

মানিক মিয়া এভিনিউ ধরে শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। আগ্রহ নিয়ে সংসদ ভবন আর সামনের কম্পাউন্ড দেখল সায়রা। একেবারে মন্দ লাগছে না। বামে মোড় নিয়ে ফার্মগেট-বিজয় সরণী হয়ে সংসদ ভবনের রাস্তায় প্রবেশ করল। কাছ থেকে বিশাল ভবনটা দেখার সুযোগ হলো এবার। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে, কিংবা লেকের কিনারের পেভমেন্টে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে ওর।

ক্রিসেন্ট লেক ছুঁয়ে আগারগাঁও-এর দিকে এগোল গাড়ি। লেক-টা তেমন আকর্ষণীয় মনে হয়নি সায়রার। সুযোগ পেলে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার কমপ্লেক্স আর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেমিনার হল-টা দেখতে হবে, ভাবল ও।

দশটা দশ মিনিটে ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। নেমে ভাড়া মেটাল সায়রা। সিঁড়ির দিকে এগোনোর

সময় অনুভব করল কিছুটা হলেও উদ্বেগ লাগছে, পেটে অস্বস্তি হচ্ছে; সাধারণত পরীক্ষা আর চাকুরীর ইন্টারভিউ দেয়ার আগে জিনিসটা হত। মেহগনি কাঠের কারুকাজ করা সুদৃশ্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল ও, ভাবছে ফিরে যাবে কিনা, কে জানে কি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়বে!

দ্বিধা কাটিয়ে ডোর-বেল বাজাল ও। ভেতরে মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে অতিথির আগমন ঘোষণা করল ডোর-বেল। *অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি!* আনমনে ভাবল সায়রা।

দরজা খুলল ষোলো-সতেরো বছরের একটা মেয়ে। সুশ্রী, মায়া কাড়া চেহারা। নিতান্ত কৌতূহল নিয়ে দরজা খুলেছে মেয়েটা, কিন্তু সায়রাকে একনজর দেখেই থমকে গেল, বিস্ফারিত হলো চোখ জোড়া।

'ইমতিয়াজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল তরুণী। 'ভেতরে আসুন।'

সুদৃশ্য ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল ও। মেঝেয় ধূপ-সাদা রঙের পুরু কার্পেট, গোড়ালি পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে। আসমানী রঙের ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে জানালায়, উজ্জ্বল আবহ তৈরি করেছে কামরায়। ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র দামী, সুরুচিপূর্ণ এবং হাল ফ্যাশনের।

নরম গদি মোড়া সোফায় বসল ও, জোর করে চোখ সরিয়ে নিল কোণের অ্যাকুয়ারিয়াম থেকে।

'কি নাম বলব?' তরুণীর প্রশ্নে সংবিৎ ফিরল ওর।

'সায়রা রশীদ।'

ভেতরে চলে গেল সে। দরজার ফাঁক দিয়ে বিশাল একটা হলঘর দেখা যাচ্ছে, মেঝে সোনালী কার্পেটে মোড়া। দেয়ালে দুধ-সাদা পেইন্ট। মার্বেল পাথরের টেবিল, চীনা ডিজাইনের ফুলদানি এবং দেয়াল জোড়া আয়না দেখা যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সায়রা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও উদ্বেগ এবং শঙ্কা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু এ বাড়ির সবকিছুতে আভিজাত্য আর অঢেল বিত্তের নমুনা দেখে আবারও ফিরে আসছে সেসব।

হলঘরে একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'কি বললে? খোদা! ঠিক শুনেছ?'

'জ্বী।'

একটু পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল লোকটি।

সায়রার কাছে মনে হলো ওর জীবনের সমস্ত মুহূর্তই যেন স্থির হয়ে গেছে, সময়ের ঘূর্ণিতে আটকে গেছে ও–কৌতূহল, শঙ্কা আর একইসঙ্গে আকর্ষণের এক মেঘের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সবকিছুই যেন উল্টো ভাবে ঘটছে। এই মুহূর্তে কেবল দুটো ব্যাপারে সচেতন ও: সামনে দাঁড়ানো লোকটি এলিট হাউজে দেখা সেই যুবক–চৈতী চৌধুরীর সঙ্গী, এবং গতরাতের মত একই রকম বিস্ময়ের সঙ্গে ওকে দেখছে সে।

'তুমি কি সায়মার বোন?' শান্ত, গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল সে, এখনও দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে উত্তর দিল ও। 'আপনি···ফাহিম ইমতিয়াজ?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। ক্ষণিকের নীরবতা শেষে জানতে চাইল, 'তুমি যে সায়মার ভূত নও, সেটা জেনে হয়তো খুশি হওয়া উচিত আমার। কি জন্যে এসেছ?'

সরাসরি প্রশ্নে এবং নির্লিপ্ত স্বরে প্রায় সবকিছু গুলিয়ে ফেলল সায়রা। 'আমি···ঢাকায় ছুটি কাটাতে এসেছি। ভাবলাম···' আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করল ও।

'কি ভেবেছ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাহিম ইমতিয়াজ।

কথা সরছে না ওর মুখে। মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী যুবতী থেকে আড়ষ্ট এক স্কুল-বালিকায় ওকে পরিণত করেছে সে।

'বোসো,' মৃদু স্বরে বলল সে।

কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল জানে না সায়রা, এবার যেন সচেতন হলো। বসার সময় কার্পেটে নেমে গেল ওর দৃষ্টি। না দেখলেও জানে ওকে খুঁটিয়ে দেখছে ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে তাকানোর সাহস হলো ওর। বদমেজাজ, অবজ্ঞা, রাগ, ঔদ্ধত্য–সবকিছুর জন্যে মনে মনে তৈরি ছিল, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি সায়মার স্বামী সদ্য ত্রিশ পেরোনো দারুণ সুদর্শন এক যুবক।

সৌন্দর্যের আকর্ষণ ভয় ধরিয়ে দেয় ওর বুকে, এক ধরনের শঙ্কা আর অনীহা বোধ করে। লোকটি যদি ধনী হয়, তাহলে তো কথাই নেই। অদ্ভুত হলেও, বরাবর এ ধরনের লোককে এড়িয়ে চলেছে সায়রা। শওকত হাসানের মত মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে ও, উপভোগও করে তাদের সঙ্গ; কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজের উপস্থিতি শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে। কারণটা জানে না সায়রা, হয়তো যা

দেখবে বলে আশা করেছে তার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখছে না বলেই।

ফাহিম ইমতিয়াজকে দেখে মনে হয় না সফল কোন ব্যবসায়ী। মনের গভীরে প্রবল বিস্ময় বোধ করছে ও। সায়মার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে যাকে বিয়ে করেছে, সাধারণ কেউ হবে না সে, এটাই স্বাভাবিক। ফাহিম ইমতিয়াজ তেমন মানুষ নয়ও–আত্মবিশ্বাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, গর্বিত একজন মানুষ; বিত্ত আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব কাউকে যতটা আত্মবিশ্বাসী করতে পারে, ঠিক ততটাই দেখাচ্ছে তাকে।

'কি খাবে, ঠাণ্ডা না গরম কিছু?' শান্ত, কোমল স্বরে জানতে চাইল সে।

'চা বা কফি।'

ক্ষীণ হাসল সে, হয়তো সায়রা কোনটাই পছন্দ করেনি বলেই। ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিচু স্বরে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল, তারপর সায়রার দিকে ফিরল।

সায়রা তখন হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। স্বামী সম্পর্কে জানাতে ওকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিল সায়মা, ফাহিমকে বয়স্ক উল্লেখ করেছে প্রতিবারই, কিন্তু সায়মার চেয়ে দুই বা তিন বছর বেশি হবে তার বয়স। বত্রিশ, বড়জোর তেত্রিশ। চলাফেরায় বাইশ বছরের তরুণের মতই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ফাহিম ইমতিয়াজ; দীর্ঘ এবং সুঠামদেহী। চওড়া পেশীবহুল কাঁধের নড়াচড়া স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কাপড়ের ওপর দিয়ে। ধূসর ট্রাউজার আর নীল রঙের টি-শার্টে তাকে কোন গল্‌ফ খেলোয়াড়ের মতই দেখাচ্ছে।

সাইড টেবিলের ওপর থেকে সুদৃশ্য একটা সিগারেট বক্স তুলে নিল সে, সোনালী লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। 'ঠিক বুঝতে পারছি না,' পাফ করে গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'বোধহয় সায়মার চেয়ে বেশ ছোট তুমি? বহুবার তোমার কথা বলেছে ও, তোমাদের মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান, তা কিন্তু বলেনি।'

'আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিল ও।'

খানিকটা বিস্ফারিত হলো ফাহিম ইমতিয়াজের চোখ জোড়া, ঠোঁটে স্মিত হাসি। গাম্ভীর্যের নমুনা হয়ে চেপে বসে থাকা মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে গেছে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সায়রা।

'তারমানে···চব্বিশ চলছে তোমার?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে সতেরো-আঠারো বয়সের তরুণীর মত!'

'কিন্তু যা বলেছি, সেটাই আমার বয়স!' প্রায় জেদী স্বরে বলল সায়রা, দেখল হেসে উঠেছে সে, তাকিয়ে আছে সরাসরি ওর চোখে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনটা উপলব্ধি করতে পারল ও, গুরুত্বহীন বিষয়ে তর্ক করে আর কিছু না হোক, মাঝখানের বরফের দেয়ালটা ভেঙে পড়েছে; এবং কিছুটা সুস্থির বোধ করছে ও, উদ্বেগ আর শঙ্কা কেটে যাচ্ছে।

ট্রলিতে ফ্রুট জুস, কয়েক রকম মিষ্টি, বিস্কুট আর কফি নিয়ে এল মেইড মেয়েটি। চাইনিজ কফি পট, কাপ আর গ্লাসগুলো এতই সুদৃশ্য, দেখে মনে হচ্ছে যে কোন সময়ে ভেঙে যাবে।

'পরিবেশন করার কাজটা মেয়েদের হাতেই ভাল মানায়!' হালকা চালে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ।

স্মিত হেসে ট্রের দিকে হাত বাড়াল সায়রা।

'কালো কফি–চিনি ছাড়া,' নিজের পছন্দ জানিয়ে দিল সে।

কফি ঢালায় ব্যস্ত সায়রা, জানে না অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছে ফাহিম ইমতিয়াজ। কফি ঢেলে সিধে হলো ও, তখনই আচমকা প্রশ্নটা করল সে।

'কোথায় উঠেছ?'

'একটা গেস্ট হাউজে। নাম বললে চিনবেন?'

'মনে হয় না।'

'লালমাটিয়ায়।'

মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর কি মনে হতে ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু এলিট হাউজে গেছ তোমরা···শহরের সবচেয়ে দামী রেস্টুরেন্ট ওটা!'

ফাহিম ইমতিয়াজের ভাবনা পরিষ্কার ধরতে পারল সায়রা। সাধারণ একটা গেস্ট হাউজে উঠেছে ও, অথচ খরচের কথা না ভেবে এলিট হাউজের মত ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গেছে, পরস্পরবিরোধী তো অবশ্যই।

'আসলে···' শুরু করেও থেমে গেল সায়রা, শওকত হাসানের কথাটা মনে পড়তে আনমনে হেসে উঠল। 'শুনতে হয়তো হাস্যকর লাগবে···সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা কেমন করে সন্ধে কাটায় দেখতে গিয়েছিলাম আমরা,' অকপটে বলল ও; চোখাচোখি হলো

ওদের, পরস্পরের উদ্দেশে হাসল দু'জনেই—আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

'ওদের একজন হতে ইচ্ছে করেনি?'

প্রশ্নটার মধ্যে উপহাস বা অবজ্ঞা, কোনটাই নেই; স্রেফ কথাচ্ছলে করা, এবং ফাহিম ইমতিয়াজের চোখের গভীরে কৌতূহল আর আমোদ দেখা যাচ্ছে।

নেহাত ছেলেমানুষি, গতরাতের কথা মনে পড়তে ভাবল সায়রা, বাচ্চাদের মত কৌতূহল প্রকাশ করেছে ওরা, ও নিজে "সমাজের অন্য শ্রেণী"র একজন হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু এখন, ফাহিম ইমতিয়াজের সহজ এবং অন্তরঙ্গ আচরণে, মুহূর্তের জন্যে হলেও ওর মনে হচ্ছে সামনে বসা মানুষটা ভিন্ন গোত্রের কেউ নয়, ওর বা শওকত হাসানের মতই একেবারে সাধারণ একজন মানুষ।

'ঢাকায় কবে এসেছ?' নীরবতা ভাঙল ফাহিম ইমতিয়াজ।

'গতকাল।'

'এখানে আসতে দেখছি মোটেই দেরি করোনি!' শুকনো স্বরে বলল সে, প্রচ্ছন্ন উপহাস থাকল কণ্ঠে, সেটা ধরতে পেরে অজান্তে লালচে হয়ে গেল সায়রার মুখ।

'এত তাড়াতাড়ি আসা উচিত হয়নি বোধহয়, কিন্তু···সায়মা কোথায় থাকত, দেখার ইচ্ছে ছিল আমার,' শেষ মুহূর্তে বাক্যটি বদলে ফেলল ও, দ্বিধা আর সাহসের অভাবের জন্যে মনে মনে গাল দিল নিজেকে। 'তাছাড়া প্রভার সঙ্গেও দেখা করতে চাই আমি। প্লীজ!'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল না সে; মুখ নির্বিকার, কিন্তু কুঁচকে গেছে চোখের কোণ। বিস্ময়, অননুমোদন বা বিরক্তি কোনটাই নেই চাহনিতে, স্রেফ পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। 'নিশ্চই দেখা করবে ওর সঙ্গে,' মৃদু স্বরে শেষে বলল সে। 'কিন্তু অনুরোধ করার কি আছে!'

'ধন্যবাদ!' অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সায়রা, হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে; এবং তা দেখে সরু হয়ে গেল ফাহিম ইমতিয়াজের চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'বোধহয় ভেবেছ প্রভার সঙ্গে দেখা করতে দেব না তোমাকে?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল কোটিপতি। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল। 'চলো, দেখা করবে ওর সঙ্গে।'

ফাহিম ইমতিয়াজকে অনুসরণ করে হলরুমে এল সায়রা, দুটো

কামরা ফেলে তৃতীয়টির ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে বাচ্চা একটা মেয়ের মিষ্টি কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, কথা বলছে কারও সঙ্গে। দরজার পাল্লা মেলে ধরে পিছিয়ে এল সে, যাতে আগে ভেতরে ঢুকতে পারে সায়রা।

কামরাটায় ঢুকে রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ল ও। অপূর্ব সুন্দর কামরা। দেয়ালে অসংখ্য পশু-পাখি আর ফুলের ঝলমলে রঙিন ছবি; মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে হাজারো খেলনা। দেয়ালগুলো বিভিন্ন রঙে সাজানো। একটা বাচ্চা যা চাইতে পারে, সবই রয়েছে এখানে। ঘরের ঠিক মাঝখানে সুদৃশ্য রকিং ঘোড়া, এতটাই জীবন্ত যে ওটার জ্বলজ্বলে চোখ, লেজ বা ঘাড়ের ওপর কেশরগুলোও জীবন্ত মনে হচ্ছে। যে কোন বাচ্চা ঢুকে যেতে পারবে এমন একটা খেলনা-বাড়ি, অসংখ্য পুতুল, রঙ-তুলি আর ইজেল, আরও কত কি···। সায়রা উপলব্ধি করল এ ঘরে উজ্জ্বল একটা ভুবন তৈরি করা হয়েছে, প্রভার জন্যে স্বপ্ন আর কল্পনার ভুবন। নিটোল আনন্দে এখানে সময় কাটবে যে কোন বাচ্চার।

কোণের একটা টেবিলে বসে আছে ছোট্ট মেয়েটা, ছবি আঁকছে বোধহয়। মাঝবয়সী এক মহিলা পরামর্শ দিচ্ছে ওকে। সূতী কাপড়ের একটা ফ্রক আর পাতলা সোয়েটার পরনে প্রভার। পদশব্দ পেয়ে ছোট ছোট চোখ তুলে তাকাল, বাপকে দেখে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল নিষ্পাপ মুখটা। তারপর হাতের তুলি ফেলে ছুটে এল। হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিল ফাহিম ইমতিয়াজ, হাসছে সে।

মুহূর্তটা থমকে দিল সায়রাকে, কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করল ও। ক্ষণিকের ব্যবধানে ফাহিম ইমতিয়াজের দুটো রূপ দেখেছে। *হয়তো মানুষের চরিত্রে এত বৈচিত্র্য থাকার কারণেই পৃথিবীতে এত ভুল বোঝাবুঝি,* দার্শনিকের মত ভাবল ও। একটু আগেই ফাহিম ইমতিয়াজকে দেখেছে নিস্পৃহ, আবেগহীন এবং শীতল ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ হিসেবে, ঠিক কয়েক মিনিট পরই আন্তরিক মনে হয়েছে তাকে; কিন্তু তৃতীয় রূপটি একেবারে অপ্রত্যাশিত–একজন বাবা হিসেবে সুখী এবং যথেষ্ট আন্তরিক।

বাপের কালো চুল আর কালো চোখ পেয়েছে প্রভা। বিনুনি করা চুল পিঠের ওপর ঝুলছে। বাপের গালের সঙ্গে গাল ঘষে নিচু স্বরে বলল কি যেন, সেটা শুনে হেসে উঠল ফাহিম ইমতিয়াজ। স্বতঃস্ফূর্ত,

উচ্ছল হাসি।

'ঠিক আপনার মত হয়েছে ও!' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল সায়রা।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল ফাহিম ইমতিয়াজ, পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল; কালো চোখের গভীরে শীতল দৃষ্টি ছাড়াও আরও কি যেন আছে। বিস্ময় বা আনন্দ, কোনটাই নয়; জিনিসটা আসলে কি ধরতে পারল না সায়রা।

'তাই?' ধীরে ধীরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। আপনার চোখে পড়েনি?'

'উঁহুঁ, একটা বাচ্চা ওর বাবা নাকি মা-র মত হয়েছে সেটা কি আসলে সঠিক ভাবে বলা সম্ভব?'

'নিশ্চই। ওকে দেখলে যে কেউ বুঝবে সায়মার মত হয়নি, বরং ওর সঙ্গে আপনারই মিল বেশি।'

বাপের মনোযোগ অন্য দিকে সরে গেছে, টের পেয়ে সায়রার দিকে তাকাল প্রভা। নিষ্পাপ কালো চোখে রাজ্যের কৌতূহল, সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল ওর উদ্দেশে।

'প্রভা, এই মহিলা তোমার আন্টি,' খানিকটা দ্বিধার পর বলল ফাহিম ইমতিয়াজ, স্মিত হাসল মেয়ের উদ্দেশে। 'যদিও কারও খালা হওয়ার মত বয়েসী ওকে দেখায় না! তোমাকে দেখতে এসেছে ও।'

পলকহীন দৃষ্টিতে সায়রাকে দেখছে প্রভা, মুখে মৃদু হাসি। 'সত্যি?' বাপের দিকে না ফিরেই জানতে চাইল।

'সত্যি।'

মুহূর্তের নীরবতা। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দিল ফাহিম ইমতিয়াজ। দ্রুত পায়ে রকিং ঘোড়ার কাছে চলে গেল প্রভা, পিঠে চড়ে সামনে-পিছনে দোল খেতে শুরু করল।

'সায়রা, ইনি মিসেস হাম্না রহমান,' মাঝবয়সীর পরিচয় দিল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'প্রভার নার্স, টীচার বা মিস্ট্রেস সবই বলা যায় ওঁকে। প্রভার জন্মের পর থেকেই ওর যত্ন নিচ্ছেন হাম্না খালা। খালা, এ আমার স্ত্রীর বোন, সায়রা।'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন হাম্না রহমান।

'চলো, ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি,' ঘুরে দাঁড়াল ফাহিম ইমতিয়াজ।

'শুনুন!'

ফিরে তাকাল সে।

'আমি কি···কিছুক্ষণের জন্যে থাকতে পারি এখানে?'

'নিশ্চই! খালা, ও চলে যাওয়ার সময় ডাকবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

ফাহিম ইমতিয়াজ চলে যেতে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই মহিলা, নিরীখ করছে একে অন্যকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন হাস্না রহমান, ক্ষীণ হেসে একটা চেয়ার দেখালেন। 'বোসো, তুমি করে বললাম কিন্তু!'

'বেশ তো,' হেসে বলল সায়রা, সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে মহিলার আন্তরিক আচরণে।

'তুমি আসায় ভালই হয়েছে, অন্তত প্রভার জন্যে। মাঝে মধ্যেই ভাবতাম কোথাও নিশ্চই আপনজন আছে মেয়েটার, মায়ের দিকের। তোমার বোনের মতই দেখতে তুমি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। মেইড মেয়েটা এসে কি বলল জানো? আগে খবর পেয়েছি বলেই, নইলে ওর মতই ভড়কে যেতাম–ভেবে বসতাম সত্যিই সায়মা চৌধুরীর ভূত এসে উপস্থিত হয়েছে!' উচ্ছল হাসি মহিলার চোখে-মুখে, মুহূর্তের মধ্যে আড়ষ্টতা কেটে গেল সায়রার। অনুভব করছে পরিবেশটা সহজ হয়ে গেছে, মনেই হলো না সবে পরিচয় হয়েছে ওদের।

খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ করল ওরা। তবে ঘুরে-ফিরে প্রভার প্রসঙ্গই আসতে থাকল–কি কি পছন্দ করে, কিভাবে জেদ ধরে কিংবা কারা ওর পছন্দের মানুষ···। 'মাত্র চার বছর হলে কি হবে, নিজের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে খুব সচেতন ও,' বলছেন হাস্না রহমান। 'অপছন্দের কোন কাজ করানো যায় না ওকে দিয়ে। যেমন ধরো: প্রতি রাতে শোয়ার আগে এক গ্লাস দুধ খায় ও, হঠাৎ কোন দিন যদি বলে খাবে না, তো সত্যি খাবে না। ঠিক বাপের মত হয়েছে–জেদী, অভিমানী।'

এদিকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত প্রভা। বালি ভরা একটা ট্রে রয়েছে খেলনা-বাড়ির পাশে, সেটার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে। বালির একটা দুর্গ তৈরি করছে ও, পাশে বসে পরামর্শ দিচ্ছেন হাস্না রহমান। ঘাড় কাত করে সায় দিচ্ছে প্রভা। তবে হঠাৎ হঠাৎ চোরা চাহনিতে দেখে নিচ্ছে সায়রাকে, চোখাচোখি হতে নিস্পলক দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

একটা শিশুর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধহয় সরলতা। ভান

করতে জানে না এরা। সরাসরি কৌতূহল প্রকাশ করেনি প্রভা, কিন্তু সায়রা যে ওকে আগ্রহী করে তুলেছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'হয়তো মা নেই বলেই, শত ব্যস্ততার মধ্যেও ওকে সময় দেয়ার চেষ্টা করে ফাহিম। কিন্তু যথেষ্ট নয়। এই বয়সের বাচ্চারা মা-বাবাকে সারাক্ষণ কাছে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ফাহিম সাহেবের কথায় যা বুঝেছি, প্রভার জন্যে যথেষ্ট করছেন আপনি!' আন্তরিক স্বরে বলল সায়রা।

'কিন্তু একজন মা-র অভাব কি কখনও পূরণ হয়?'

'হয় না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বীকার করল ও, প্রভাকে দেখছে এক দৃষ্টিতে। বালির দুর্গ তৈরি করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে মেয়েটা, বারবার ভেঙে শুরু করছে নতুন করে; কিন্তু বিরক্তি বা অসন্তোষ নেই ওর মধ্যে।

'সাধারণ যে কোন বাচ্চার চেয়ে বেশি কৌতূহলী ও। মাঝে মধ্যে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠি আমি—এটা কেন, ওটা কিভাবে হচ্ছে, অন্যরকম হয় না কেন, হলে কি হত···হাজারো প্রশ্ন!'

প্রভার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই স্মিত হাসল সায়রা।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। 'তোমাকে কি বলে ডাকব?'

'আন্টি ডাকবে!'

'আন্নি?'

'হ্যাঁ।'

ট্রে-র পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল প্রভা, গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল সায়রার দিকে। সামনে এসে দাঁড়াল, নিষ্পাপ দুই চোখে কৌতূহল, কি যেন খুঁজছে মেয়েটা ওর মুখে।

হাত বাড়াতে হলো না, নিজেই ওর কোলে উঠে এল প্রভা। তারপর সায়রাকে চমকে দিয়ে টুক্ করে ওর গালে চুমো খেল।

'জানিয়ে দিল তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওর,' হেসে বললেন হাস্না রহমান।

দু'হাতে ছোট্ট শরীরটা আঁকড়ে ধরল সায়রা, বুকে টেনে নিল প্রভাকে। মুখ নামিয়ে মেয়েটির কপালে আলতো চুমো খেল, দেখল চোখ পিটপিট করে ওকে এখনও দেখছে প্রভা। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হাস্না রহমানের দিকে তাকাল। 'ও আমার আম্মুর মত, তাই না?'

ছোট্ট একটা ঝড় উঠল সায়রার বুকে। বোনের কথা মনে পড়ল ওর। অদ্ভুত এক মায়ার বাঁধনে ওদের জড়িয়ে রেখে গেছে সায়মা, ছোট্ট এই মেয়েটি সেই মায়ার কেন্দ্রবিন্দু–ভালবাসা আর অবলম্বনের নিটোল এক স্বর্গ।

'প্রভার দাদা-দাদী কেউ থাকে না এখানে?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল সায়রা, আনমনে বিলি কাটছে প্রভার চুলে।

'নাহ্, চট্টগ্রামে থাকেন ওঁরা। ফাহিমের মা বছর খানেক আগে প্রভাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নিজের কাছে রাখবেন বলে, ওঁদের ইচ্ছে ফাহিমকে আবার বিয়ে করাবেন।'

নড়ে উঠল প্রভা, দু'হাতে সায়রার গলা জড়িয়ে ধরল। 'তুমি ঠিক আমার আম্মুর মত!' মুগ্ধ বিস্ময়ে টেনে টেনে বলল মেয়েটি।

'আমি যে তোমার আম্মুর বোন, তাই!'

'সব বোনরা কি দেখতে একরকম হয়?'

'না, তা হবে কেন।'

'তাহলে তোমরা একইরকম কেন?'

'কি জানি!'

ফের সায়রাকে চুমো খেয়ে কোল থেকে নেমে গেল প্রভা, বালির ট্রে-র কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

'কিন্তু রাজি হয়নি?' পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল সায়রা। 'অথচ প্রভার জন্যে হলেও বিয়ে করা উচিত ওর।'

'কিন্তু কে রাজি করাবে ওকে? এতদিন তো শুনেই হেসে উড়িয়ে দিত। প্রভার দাদা-দাদীও রাজি করাতে পারেননি। অথচ প্রভা যখন মা-র অভাব কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে, ঠিক তখনই চৈতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো ওর। এদিকে চৈতী চৌধুরীকে মোটেও পছন্দ করে না প্রভা, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তাকেই মা ডাকতে হবে ওর।'

'চিনি।'

'তাই? ফাহিম অবশ্য খুব একটা পাত্তা দেয় না চৈতী চৌধুরীকে, কিন্তু প্রভার দাদা-দাদীর ইচ্ছে দু'জনের বিয়ে দেবেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে ওদের। সেই সূত্রে ইদানীং এ বাড়িতে বড় বেশি যাতায়াত করছে চৈতী।' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন হাম্না রহমান, সায়রাও খুশি হলো তাতে। অন্যের সমালোচনা শুনতেও বাধছে ওর, যেখানে সুপার মডেলের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন পরিচয়ই

নেই।

'কিছু মনে কোরো না, সায়রা, তুমি কি প্রভার সঙ্গে থাকবে কিছুক্ষণ? ওর গোসলের আয়োজন করতে হবে। কাজটা অন্য কেউ করুক, পছন্দ করে না ও।'

'নিশ্চই।'

মহিলা বেরিয়ে যেতে আবারও ওর কোলে এসে বসল প্রভা। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এক হাতে টেনে নিয়েছে ওর এক গোছা চুল। মাঝে মধ্যেই নিজের গালের সঙ্গে চুলগুলো ছোঁয়াচ্ছে। 'একটা গল্প বলো, আন্নি!' আব্দার জুড়ল প্রভা।

'কি গল্প শুনবে?'

'সিনডারেলার গল্প।'

বলতে শুরু করল সায়রা। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল অনভ্যস্ত এই কাজটা করতে খারাপ লাগছে না, অথচ জীবনে প্রথম কোন বাচ্চাকে গল্প শোনাচ্ছে। স্কুলে নয়-দশ বছরের বাচ্চাদের পড়ায় ও, তাদের সঙ্গে আনন্দেই কেটে যায় সময়। কিন্তু এত ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কখনও অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ হয়নি। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পরিচয়ের শুরুতেই প্রভার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে, বরং ভেবেছিল ছোট্ট মেয়েটির মন জয় করতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে ওকে।

'আবার বলো!'

'গল্পটা বুঝি খুব প্রিয় তোমার?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল প্রভা, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। 'রাজার ছেলে কিভাবে সিনডারেলাকে খুঁজে পেল সেই ঘটনাটা আবার বলো।'

কিন্তু বলার আগেই ঘরে ঢুকলেন হাম্না রহমান। 'খালা-ভাগনীতে খুব গল্প হচ্ছে বুঝি? নিশ্চই সিনডারেলার গল্প শোনার আব্দার করেছে ও?'

বিস্ময়ে একটা ভুরু কোঁচকাল সায়রা।

'এ গল্পটাই বেশি প্রিয় ওর। সবার কাছে এটাই শুনতে চায়। কি যে পেয়েছে ওই গল্পে, কেবল খোদা আর ও-ই জানে!' এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'চলো, প্রভা, গোসল করবে। তারপর খেয়ে ঘুমোবে।'

'কিন্তু...আন্নি...'

'এক কাজ করা যাক, তুমি বরং ওকে আরেকদিন আসতে

অনুরোধ করো।'

এবার উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল প্রভার মুখ। 'আসবে, আন্নি?'

'নিশ্চই!' প্রভাকে নামিয়ে দিয়ে ঘড়ি দেখল ও। একটা বেজে গেছে! 'ওহ্, ভাবতেই পারিনি এত সময় চলে গেছে! হাস্না খালা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকালটা সত্যিই দারুণ কেটেছে আমার।'

'শিগ্‌গিরই আসবে কিন্তু, নইলে প্রভা জ্বালিয়ে মারবে আমাকে।'

'আসব।' ঝুঁকে প্রভার কপালে চুমো খেল ও। 'পরেরবার নতুন একটা গল্প বলব, ঠিক আছে, সোনা?'

মাথা ঝাঁকাল প্রভা, তারপর ঘুরে চুমো খেল সায়রার গালে।

'খোদা হাফেজ।'

হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল প্রভা। পেছন থেকে ওকে দেখছে সায়রা। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোধহয় একেই রক্তের টান বলে, বুকটা শূন্য শূন্য লাগছে ওর। মেয়েটিকে দেখার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে হারানোর আশঙ্কা বাজছে হৃদয়ে। ক'দিন পরেই ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে প্রভাকে দেখার সুযোগ হয় কে জানে!

স্টাডির দরজায় ফাহিম ইমতিয়াজের দেখা পেল সায়রা।

'এখানেই লাঞ্চ করে যাও,' প্রস্তাব করল সে।

সন্দেহ নেই লোভনীয় প্রস্তাব, কারণ প্রভার সঙ্গ পাবে ও। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, ফাহিম ইমতিয়াজও থাকবে সঙ্গে। একদিনের জন্যে বেশি হয়ে যাচ্ছে না? মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

'ধন্যবাদ। কিন্তু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে সে। 'গতরাতে তোমার সঙ্গে ছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল, কিন্তু সায়রার মনে হলো রীতিমত নির্দেশের সুর রয়েছে প্রশ্নটায়, যেন জবাবটা সত্যিই পাওনা হয়েছে সে।

'হ্যাঁ, শওকত হাসান।'

'ওঁর সঙ্গেই এসেছ?'

'হ্যাঁ। ভাইয়ার বন্ধু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল ফাহিম ইমতিয়াজ, পিছু পিছু এগোল সায়রা। বাইরের দরজার কাছে এসে থামল সে, তারপর নবে হাত রাখল। ঠিক সেই মুহূর্তে ডোর-বেল বেজে উঠল। দু'জনেই

চমকে উঠল ওরা।

দরজা খুলল সে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই থমকে গেল। পেছন থেকে ফাহিম ইমতিয়াজের ঘাড়ের পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখল সায়রা। 'জাবির! এখানে কেন এসেছ?' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

'এরচেয়ে আন্তরিক সম্ভাষণ কি পেতে পারি না? এতদিন পর ভাইকে দেখলে, অথচ এ কেমন আচরণ!' ভরাট গম্ভীর একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

এটা সত্যি যে ফাহিম ইমতিয়াজের কণ্ঠে আন্তরিকতা বা উষ্ণতা, কোনটাই নেই। সায়রার উপস্থিতির কথা মনে পড়তেই হয়তো, শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে আহ্বান করল সে: 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকল যুবক। দারুণ সুদর্শন। দুই চোখে গভীর আগ্রহ। ভাইয়ের শীতল অভ্যর্থনার কথা এ মুহূর্তে প্রায় বিস্মৃত হয়েছে, উজ্জ্বল চোখে খুঁটিয়ে দেখছে সায়রাকে।

ফাহিম ইমতিয়াজের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে সে। দীর্ঘ, মেদহীন শরীর। চুল, চোখের রঙ, হাসি–প্রায় একই রকম দু'জনের।

'এই পরীটা কে, ফাহিম?' চাপা স্বরে জানতে চাইল যুবক, মুহূর্তের জন্যেও সায়রার ওপর থেকে চোখ সরায়নি; মিটিমিটি হাসি লেগে আছে মুখে। 'মনে হচ্ছে একেবারে মোক্ষম সময়ে এসেছি!'

'সায়রা, সায়মার বোন ও,' শুকনো স্বরে দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'সায়রা, ও আমার ছোট ভাই, জাবির।'

'সৎ ভাই,' শুধরে দিল জাবির, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সায়রার উদ্দেশে। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই ধরে রাখল সে হাতটা। দুই ভাইয়ের সম্পর্কটা যেন সরু সুতোয় বাঁধা, অন্তত জাবিরের ভঙ্গিতে তাই মনে হচ্ছে, এবং সেটা ছিঁড়ে গেলেই যেন সন্তুষ্ট হবে। 'সায়মার বোন? সত্যি? আমার তো মনে পড়ছে না কখনও বলেছে কোন বোন আছে ওর!'

'সবকিছু তোমার জানা থাকবে, কিংবা তোমাকে জানাতেই হবে এমন কোন কথা আছে কি?' তীক্ষ্ণ স্বরে বিদ্রূপ করল ফাহিম।

বিব্রত ভঙ্গিতে দু'জনের দিকে তাকাল সায়রা, স্পষ্ট বুঝতে পারছে শীতল একটা সম্পর্ক রয়েছে দুই ভাইয়ের মধ্যে, অজ্ঞাত কোন কারণে খেপে আছে পরস্পরের ওপর। ফাহিম ইমতিয়াজের চোখে স্পষ্ট

বিদ্বেষ, এবং সেটা মুখে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছে না; কিন্তু জাবিরের মনোভাব আরও বিস্ময়কর, ব্যাপারটা যেন রীতিমত উপভোগ করছে সে।

'ক'দিনের জন্যে এসেছ?' জানতে চাইল ফাহিম, এখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এবং দরজাটা হাট হয়ে খোলা। সায়রার কাছে মনে হলো সে যেন চাইছে বেরিয়ে যাক জাবির।

'এই তো···হপ্তা দুয়েক,' সায়রার চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল জাবির। 'বেশিও হতে পারে। ঢাকায় ক'দিন থাকছ তুমি, সায়রা?'

'নিশ্চিত বলতে পারছি না। হয়তো দুই সপ্তাহ।'

খুশি দেখা গেল জাবিরের চোখে। 'আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের?'

মানুষটা সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করতে পারছে সায়রা। সঙ্গী হিসেবে নিশ্চই মজার লোক, সারাক্ষণ হাসি-তামাশার মধ্যে থাকে বোধহয়। এরকম লোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু কোন মেয়েই গুরুত্ব দিয়ে নেবে না জাবিরকে।

ভাইয়ের দিকে ফিরল জাবির। 'ভাবছি এখানেই উঠব,' নিস্পৃহ স্বরে জানাল সে, খেয়াল করল উত্তরে কোন মন্তব্য করল না ফাহিম। বিশাল বাড়িটায় নিশ্চই বেডরুমের অভাব নেই, জাবির যেন আশা করছিল আমন্ত্রণ পাবে, কিন্তু তা না পাওয়ায় কিছুটা হলেও অসন্তোষ দেখা গেল চোখে। 'প্রভা কোথায়?' শ্রাগ করে, কিছুটা বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল সে।

'খাচ্ছে ও।'

'দেখা করে আসি, ওর জন্যে কিছু গিফট এনেছি,' এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল জাবির, সায়রার দিকে ফিরল। 'তো, সায়রা, শিগ্‌গিরই তাহলে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে?' প্রশ্ন নয়, স্রেফ বিবৃতির মত শোনাল কথাটা, যেন নিশ্চিত জানে সত্যিই তাই ঘটবে।

হলরুমের দিকে তাকে চলে যেতে দেখল সায়রা, তারপর ঘুরে ফাহিমের দিকে তাকাতে রীতিমত বিস্মিত হলো।

স্পষ্ট বিদ্বেষ আর অসন্তোষ ঝরে পড়ছে তার দৃষ্টিতে, আরও কি যেন আছে–কুৎসিত সেটা–বোধহয় ঘৃণা; সেটা এতই বেশি, সুযোগ পেলে যেন ভাইয়ের হাত-পা আলাদা করে ফেলবে সে।

'আমি বরং যাই এখন,' অনিশ্চিত স্বরে বলল ও, দেখল নিজেকে

সামলে নিয়েছে ফাহিম, প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল ওর উদ্দেশে।

'হ্যাঁ···দুঃখিত, সায়রা। এখানেই অপেক্ষা করো, গাড়ির ব্যবস্থা করছি।'

'দরকার নেই! শুধু শুধু ঝামেলা করছেন!'

'ঝামেলা কি! ড্রাইভার পৌঁছে দেবে তোমাকে।' দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ইন্টারকম তুলে নিল সে, দ্রুত কথা বলল সেকেন্ড দশেক। 'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'সন্ধেয় চলে এসো না!' হঠাৎ প্রস্তাব করল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'প্রভার সঙ্গে দেখা হবে, তাছাড়া···ছোট্ট একটা পার্টি। তেমন লোক হবে না। বাইরের কেউ নেই, আমার কিছু ব্যবসায়ী বন্ধু আর ওদের পরিবার।' সায়রাকে দ্বিধা করতে দেখে দ্রুত যোগ করল: 'শওকত সাহেবকেও নিয়ে এসো না হয়। অন্য কারও সঙ্গে যেহেতু পরিচয় নেই তোমার, হয়তো ওর উপস্থিতিতে ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ তো দিলে! কিন্তু আসবে তো?' হেসে উঠল সে, সরু চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'হ্যাঁ।'

'দারুণ! তাহলে আটটার মধ্যে চলে এসো।' ফোন বেজে উঠতে মনোযোগ সরে গেল ফাহিম ইমতিয়াজের। রিসিভার তুলে ও-প্রান্তের কথা শুনল, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে দিল। 'গাড়ি চলে এসেছে।'

'ধন্যবাদ। রাতে দেখা হচ্ছে আবার।'

'হ্যাঁ। বিদায়, সায়রা।'

বেরিয়ে এল সায়রা, সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল। লনের ঠিক শুরুতেই গাড়িটা, ধবধবে সাদা একটা টয়োটা করোনা। দরজা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

সিঁড়িতে মাত্র আটটা ধাপ। কিন্তু সায়রার কাছে বেশিই মনে হচ্ছে। পেছনে দরজা বন্ধ করেনি ফাহিম ইমতিয়াজ, জানে ও, এবং দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

'স্লামালেকুম, ম্যাডাম,' সালাম দিল ড্রাইভার।

গাড়িতে ওঠার আগে ফিরে তাকাল সায়রা, একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম। স্মিত হেসে খানিকটা মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর হাত নাড়ল।

মানুষটা নিঃসঙ্গ! পরক্ষণে ভাবনাটার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করল ও। বোকা! এমন একজন লোক কেন নিঃসঙ্গ হবে? সুদর্শন, ধনী, ব্যক্তিত্ববান–যে কাউকে সঙ্গী হিসেবে পেতে পারে সে। অন্তত *আমার সঙ্গ প্রয়োজন নেই তার,* কঠোর স্বগতোক্তি করল সায়রা। *সায়রা রশীদ, নিজেকে হাস্যকর করে তোলো না! স্রেফ ভদ্রতা বশত লাঞ্চ করার জন্যে তোমাকে থেকে যেতে বলেছে সে, আর কিছু নয়। একটা টেলিফোন করলে তোমার চেয়ে আকর্ষণীয় যে কোন নারীর সঙ্গ পেতে পারে সে।*

'কোথায় যাব, ম্যাডাম?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

নিচু স্বরে ঠিকানাটা জানাল সায়রা, দেখল ঝকঝকে নীল রঙের একটা করোলা এসে থেমেছে কার-পার্কে। ভেতরে চৈতী চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। দারুণ সেজেছে মেয়েটা, নীল শাড়িতে অপূর্ব লাগছে। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে, খুব তাড়া রয়েছে যেন। মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকাল, ভুরু কুঁচকে গেছে।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল চৈতী চৌধুরী, গট্‌গট্ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল।

গাড়ির সীটে হেলান দিল সায়রা। নিজেকে ছোট এবং দুর্বল মনে হচ্ছে, এবং কোণঠাসা। মৃদু শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠল গাড়ির এঞ্জিন। কার-পার্ক ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল কিছুক্ষণের মধ্যে।

মিনিট বিশেক লাগল গেস্ট হাউজে পৌঁছতে।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদের সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিল সায়রা। দ্রুত উঠে এল নিজের কামরায়। কিছুক্ষণ হলেও একা থাকতে চাইছে ও।

ফাহিম ইমতিয়াজের বাসায় নির্মল আনন্দে সময়টা কেটেছে ওর, প্রভার সঙ্গ উপভোগ করেছে। ঢাকায় আসার একটা উদ্দেশ্য পূরণ হলেও অন্যটা সম্পর্কে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে–সায়মার রহস্যজনক চিঠিটার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়েনি! পরিস্থিতি কি আরও ঘোলাটে হলো না, চাইলেও কি ফাহিম ইমতিয়াজকে প্রশ্নটা করতে পারবে ও? সেই সাহস হবে ওর?

জট পাকিয়ে গেছে সবকিছু, তিক্ত মনে ভাবল সায়রা, যখন যা করা উচিত, তা না করে কেন তালগোল পাকিয়ে ফেলি আমরা?

চার

ডাইনিং টেবিলে সায়রার মুখোমুখি বসেছে শওকত হাসান, কফির শূন্য কাপ নাড়াচাড়া করছে হাতের মুঠিতে। 'তারপর, কেমন হলো তোমার *ভ্রমণ?*' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল সে, শেষ শব্দটার ওপর জোর দিল বিশেষ ভাবে। 'কি বলল ফাহিম ইমতিয়াজ?'

ভুরু কোঁচকাল ও। 'কি ব্যাপারে?'

'সায়মার চিঠির ব্যাপারে! সত্যি কথা বলো তো, এ নিয়ে নিশ্চই সরাসরি কথা বলেছ ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে? সায়মার মৃত্যু প্রসঙ্গে ওর মতামত জেনেছ? চিঠিতে লেখা সায়মার আশঙ্কার কথা নিশ্চই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সে?'

অজান্তে শিউরে উঠল সায়রা। কিভাবে সত্যি কথা বলবে? ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চিঠিটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, বিশ্বাস করবে সে? নির্বোধ কিংবা খামখেয়ালী ভাববে না ওকে?

সত্যি, কিন্তু বলার উপায় নেই। 'উঁহুঁ, এ ব্যাপারে কোন কথা হয়নি আমাদের। আসলে প্রথম দিনই এসব তুলতে চাইনি,' খানিকটা আপসের সুরে বলল ও। 'তবে প্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছে। দারুণ চটপটে মেয়ে! হাসি-খুশি। এত ভাল লেগেছে ওকে!'

'ঝামেলা মিটেই গেল!' সায়রা বিশদ বলার পর মন্তব্য করল সাংবাদিক। 'অন্তত প্রভার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আর, মা ছাড়াও সুখী একটা পরিবেশে বড় হচ্ছে ও।'

'চৈতী চৌধুরীর সঙ্গে এলিট হাউজে আসা লোকটাকে মনে আছে, শওকত ভাই? ওই লোকই ফাহিম ইমতিয়াজ কেমন লাগছে শুনতে?

আমাকে দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম তার! আমি নাকি দেখতে হুবহু সায়মার মত। সায়মার ভূত দেখেনি বলে খুশি সে।'

'তাই?' চোখ সরু করে তাকাল শওকত হাসান, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাল একটা। 'কিন্তু ভূতুড়ে ব্যাপার শুধু অপরাধীদের ক্ষেত্রে ঘটে, দোষী লোকই ভূত দেখতে পায়!'

'মানে?'

'বলতে চাইছি, ফাহিম ইমতিয়াজ যদি সায়মাকে খুন করে থাকে, স্বভাবতই তোমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে...'

'না, তা হবে কেন!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল সায়রা। নিজেও জানে না অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে, প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে তীব্র এবং অপ্রত্যাশিত। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিতে যাচ্ছিল, মনোযোগ সরে যাওয়ায় কাত হয়ে ঢলে পড়ল কাপটা, টেবিলে ছলকে পড়ল চা।

বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল ও, চোখ তুলে দেখল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সাংবাদিক। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। কিন্তু পাত্তা দিল না সায়রা, টিস্যু পেপার তুলে নিয়ে টেবিল মুছল, নিচু স্বরে দুঃখ প্রকাশ করল।

'চা দিতে বলি?' পরিবেশটা সহজ করার জন্যে প্রস্তাব করল শওকত।

'না, থাক্। একটা কথা, শওকত ভাই...ঠিকমত না জেনে-শুনে একজন মানুষ সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করা কি ঠিক হচ্ছে? এর সবই অনুমান, হয়তো সত্যের লেশমাত্র নেই এতে। অন্তত কোন কিছু প্রমাণ হওয়ার আগে...সায়মার ব্যাপারে আমার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছে ফাহিম ইমতিয়াজ, কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাইনি আমি। যতক্ষণ না আপনার অনুমানের সপক্ষে কিছু পাচ্ছেন...দয়া করে কথাগুলো চেপে যান।'

'কাউকে তো বলতে যাচ্ছি না আমি,' থমথমে দেখাচ্ছে শওকত হাসানের মুখ, মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল সে, তারপর আনমনে শ্রাগ করল। 'কিন্তু আমি একজন সাংবাদিক, সায়রা, স্বভাবতই আমার মধ্যে কৌতূহল বেশি। একেবারে না জেনে-শুনে কথাগুলো বলেছি, তা ভাবলে কি করে?

'ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে দেখা করতে গেছ তুমি। আমি কিন্তু

বসে থাকিনি, কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি।'

সায়রা অনুভব করল গলা শুকিয়ে এসেছে ওর, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। 'কি জানতে পারলেন?'

'সবই ফাহিম ইমতিয়াজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক খবরাখবর। হাসান ইমতিয়াজ চৌধুরীর বড় সন্তান, চট্টগ্রামে ওদের আদি নিবাস। পরিবারটা প্রতিষ্ঠিত। বাপের ব্যবসা দেখাশোনা শুরু করার পর থেকে ঢাকায় থাকছে ফাহিম ইমতিয়াজ। কয়েকটা গার্মেন্টস, শিপিং ব্যবসা বা গাড়ির ব্যবসা ছাড়াও ফাহিম ইমতিয়াজের নিজস্ব একটা এড-ফার্ম আছে। একটা স্যাটেলাইট চ্যানেলের শেয়ারও আছে ওর। এক কথায় কোটিপতি।

'ফাহিম ইমতিয়াজের জন্মের তিন বছর পরই মারা যান ওর মা। আবার বিয়ে করেন হাসান ইমতিয়াজ, সৎমার গর্ভে জন্ম নেয় জাবির মাহমুদ চৌধুরী।

'জাবির সাহেবের সঙ্গেও দেখা হয়েছে আমার,' প্রায় অনিচ্ছার সঙ্গে বলল সায়রা।

'তাই? সে অবশ্য চট্টগ্রামে বাপ-মার সঙ্গে থাকে। চট্টগ্রামের ব্যবসাগুলো দেখে। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে গেছেন হাসান ইমতিয়াজ, নিজেকে একরকম গুটিয়ে নিয়েছেন, খুব ঘনিষ্ঠ না হলে কারও সঙ্গে দেখাও করেন না। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ওঁর, ডায়াবেটিস ছাড়াও হার্টের অসুখ আছে। শুনেছি সিঙ্গাপুর থেকে বাই-পাস করে এসেছেন।

'বাপ মারা গেলে ছেলেদের যে কোন একজন কোটিপতি বনে যাবে। কে জানে শেষপর্যন্ত কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে! যদ্দূর শুনেছি ছোট ছেলের প্রতিই বেশি দুর্বল বুড়ো।'

'একটা কথা বলব, শওকত ভাই? বুঝতে পারছি না অন্য লোকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত আগ্রহ পাচ্ছেন কি করে! কিংবা,' সোজাসাপ্টা বলল ও। 'এসবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কি!'

'পেশার খাতিরেই লোকজন সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করি, এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। যাকগে, একটা ব্যাপার অস্বাভাবিক মনে হয়েছে আমার কাছে। তিন বছর আগে, সায়মার মৃত্যুর খবরটা প্রায় চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। পত্রিকায় গুরুত্বহীন খবরের মত ছাপা হয়েছিল সংবাদটা, অথচ কোন কোটিপতির যুবতী স্ত্রী...'

'তাতে কি? এর মধ্যে অস্বাভাবিক...'

'পত্রিকার ব্যাপারে কি জানো তুমি?' উল্টো সায়রাকে থামিয়ে দিল শওকত হাসান, প্রায় অসহিষ্ণু শোনাচ্ছে কণ্ঠ। 'এরকম একটা দুর্ঘটনা আরও বেশি কাভারেজ পাওয়া উচিত ছিল! বাপের টাকা বাদ দিলেও যথেষ্ট ধনী ফাহিম ইমতিয়াজ, আর তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশে টাকা হলে মিডিয়াকেও হাতে রাখা সম্ভব।'

'এসব কি বলছেন, শওকত ভাই? এখন বুঝতে পারছি, সায়মার চিঠির ব্যাপারে আপনাকে জানানোই ঠিক হয়নি আমার!'

'হয়েছে কি তোমার?' রুক্ষ, অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল শওকত। 'গতকাল সব সত্য খুঁজে বের করার জন্যে মুখিয়ে ছিলে, অথচ আজ যেন উল্টোটা চাইছ! ব্যাপার কি? ফাহিম ইমতিয়াজ তোমাকে এমন কি বলেছে যে...'

না দেখেও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সায়রা, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ওর। 'তাড়াহুড়ো করে কিংবা সবকিছু না জেনে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কি ঠিক হবে?' আড়ষ্ট স্বরে বলল ও। 'ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে কথা বলে ধারণা হয়েছে পুরো ব্যাপারটাই আসলে আজগুবি, আমার অতি কল্পনার ফসল। এ আসলে অসম্ভব!' একটা হাত তুলে শওকতকে থামিয়ে দিল ও। 'প্লীজ, শওকত ভাই! এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না আমি, অন্তত এখন।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শওকত হাসান, বিরক্তি বোধ করছে। সায়রার প্রতিক্রিয়ায় অবাক হলেও চেপে গেল। কয়েক জায়গায় খবর নিয়েছিল সে, আরও কিছু খবর পাওয়ার আশা করছে। হয়তো তেমন কিছুই জানা যাবে না, কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে ওর কৌতূহল তো মিটবে।

'সন্ধেয় আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ দিয়েছে ফাহিম ইমতিয়াজ,' একটু পর বলল সায়রা। 'ঘরোয়া পার্টি। কয়েকজন বন্ধু থাকবে তার বলেছে চাইলে আপনাকেও নিয়ে যেতে পারি।'

'আমাকে?' বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল শওকত।

'হ্যাঁ।'

আনমনে কাঁধ উঁচাল সাংবাদিক। সুযোগটা হেলায় হারানো ঠিক হবে না, ভাবল সে, কোটিপতিকে কাছ থেকে দেখা যাবে। দেখা যাক, ওর ধারণার সঙ্গে রক্তমাংসের ফাহিম ইমতিয়াজের কতটা মিল

রয়েছে।

'কিন্তু একটা কথা দিতে হবে, শওকত ভাই,' খানিক দ্বিধার পর বলল সায়রা, প্রত্যাশা ওর চোখে। 'ওই চিঠি বা সায়মার মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে, তুমি যেমন চাও!' শ্রাগ করে বলল শওকত।

এবার হাসি দেখা গেল সায়রার মুখে।

'বিকেলটা কিভাবে কাটাবে?'

'ভাবছি। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেইনি।'

'চলো, আশপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসি। ঘোরার জন্যেই তো এখানে এসেছি আমরা, নাকি?'

স্মিত হাসল ও। 'কাপড় বদলে আসছি আমি। পাঁচ মিনিট লাগবে।'

'কোথায় যাব?'

'আগে তো বেরোই, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু সন্ধের আগেই ফিরে আসতে হবে। ফাহিম ইমতিয়াজকে বলেছি আটটার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

সংসদ ভবনের সামনের প্ল্যাটফর্মে উঠতে ক'টা সিঁড়ি ভাঙতে হয়? পুরো কম্পাউন্ডটি কত একর জমিতে? মূল ভবনের আকার কি রকম? দারুণ সুন্দর এই স্থাপত্যের স্থপতির নাম কি? এরকম হাজারটা তথ্য জানা আছে শওকত হাসানের। দারুণ কৌতূহলী মানুষ, কোথাও গেলে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতে পছন্দ করে।

তবে এরচেয়েও মজার কিছু তথ্য রয়েছে তার কাছে। সংসদ ভবনের পেছনে, লেকের পাড়ে উদ্যানটির নাম এ পর্যন্ত ক'বার বদল করা হয়েছে; সংসদে গণতন্ত্রের চর্চার নামে আসলে চলে বড় দুই দলের পরস্পরের সমালোচনার রিলে-রেস, ওয়াক-আউট আর সংসদ বর্জনের খেলা; অধিবেশনের সময় প্রতি মিনিটে কত টাকা খরচ হয়; বিরোধী দলবিহীন কয়টি অধিবেশন হয়েছে কিংবা কোরামের অভাবে ক'দিন নির্ধারিত কার্যদিবস শুরু হয়নি...

সৌহার্দ আর জাতীয়তাবাদের প্রতীক সুদৃশ্য এই ভবনের ঘাড়ে চেপে বসেছে গাম্ভীর্য এবং মৌনতার ভার–মিথ্যাচার, হাজারো ব্যর্থতা আর মূল্যহীন প্রতিশ্রুতির নীরব সাক্ষী। নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভবনটা

দেখে মানুষ, সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরের এক মিলনমেলা; গর্ব বোধ করে শুধুই একটা সুদৃশ্য এবং আধুনিক দালানের জন্যে, কিন্তু ভেতরে এর কার্যকলাপের জন্যে সমীহ বোধ করে না কেউ।

দুঃখজনক, শওকত হাসানের সঙ্গে একমত না হয়ে পারেনি সায়রা। দেশটার বয়সই মাত্র ত্রিশ বছর। সময় লাগবে, গণতন্ত্র তো সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করছে। গণতন্ত্রের লীলাভূমি খোদ বৃটেনেই সত্যিকার রূপ পেতে লেগেছিল দেড়শো বছর!

সংসদ ভবনের পেছনে লেকের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন–হাজারো মানুষ দেখা যায় এখানে, স্রেফ ঘুরতে আসেনি সবাই; কেউ ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, কেউ স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেষ্ট। যেখানে খুশি যেতে পারে সবাই, সংসদ কম্পাউন্ডের সঙ্গে মূল পার্থক্য এটাই।

লেকের সিঁড়িতে বসেছে ওরা। আসার পথে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী মিলেনিয়াম হল দেখে এসেছে। ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই, তাই বাইরে থেকে দেখে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। হেঁটে এরপর চলে এসেছে লেকের ধারে।

বাদাম চিবুচ্ছে শওকত হাসান। 'অতিরিক্ত লোক!' মন্তব্য করল সে। 'বিশ বছর পর এই শহরের কি অবস্থা হবে কে জানে!'

'এ নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে আপনার, যারটা তাকে ভাবতে দিন!'

'কিন্তু আমার পেশাটাই এমন। সবাই যেটাকে উপেক্ষা করতে পারে, আমরা পারি না।' বাদামের প্যাকেট এগিয়ে দিল সে সায়রার দিকে। 'বড় শহর সুবিধে দেয় ঠিকই, কিন্তু জনসংখ্যার চাপে খোদ শহরেরই নাভিশ্বাস উঠে যায় একসময়।'

'বাংলাদেশ ছোট দেশ। বড় শহর বলতে একটাই। এখানে ভিড় হবে না তো কোথায় হবে!'

'কিন্তু ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতা থাকা উচিত! মানুষের জীবনযাত্রার মান তো কমছেই, অপরাধও বেড়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিনের পত্রিকা ঘাঁটলাম, এমন একদিনও নেই যেদিন খুনোখুনি বা দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

'কলকাতাও নোংরা শহর ছিল একসময়।'

'নোংরা ছিল বটে, কিন্তু সন্ত্রাস বা অপরাধের শহর ছিল না। আফসোসের ব্যাপার কি জানো, ঢাকার মানুষও এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বেশিরভাগ মানুষই অসচেতন. এ নিয়ে ভাবে না কেউ।'

'যাদের ভাবা উচিত, তারা না ভাবলে সাধারণ মানুষ ভাববে কেন?'

'ঠিকই বলেছ। ...চা খাবে?'

'নাহ্। চলুন, সন্ধে হয়ে গেছে প্রায়। মনে নেই, আটটার মধ্যে পৌঁছতে হবে?'

ক্যাব পেতে দেরি হয়ে গেল ওদের। ছুটির দিনের বিকেল বলেই বোধহয়। 'সোনারগাঁয় যাবে নাকি?'

'সোনারগাঁ?'

'মোঘলদের সময়ে বারো ভূঁইয়াদের রাজধানী ছিল। বাংলার সুবেদাররা থাকত ওখানে। চারটা নদী দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা দ্বীপ বলা যায় ওটাকে। ...ঢাকা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। ভাবছি ঘুরে আসব। সোনারগাঁ...নামটাই কেমন রোমান্টিক, তাই না?'

'রোমান্টিক হলো কি করে?' হেসে উঠল সায়রা।

'রোমান্টিক নয়? স্বর্ণগাঁ...গোল্ডেন ভিলেজ, নাকি ভিলেজ অব গোল্ড বলা উচিত?'

'কি জানি!'

'বাংলার স্বর্ণযুগের এক গ্রাম! মসলিনের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। একটা দেয়াশলাইয়ের বাক্সে পুরো শাড়িটাই ভাঁজ করে রাখা যেত?'

'ওটা হয়তো স্রেফ কথার কথা! এক বন্ধুর কাছে শুনেছি ওসমানী জাদুঘরে একটা মসলিন আছে।'

'তাহলে তো দেখতে হয়, আসলেই কেমন শাড়িটা।'

সন্ধে সাড়ে সাতটায় তৈরি হয়ে নিজের কামরা থেকে নিচে নেমে এল সায়রা। ডাইনিং টেবিলে বসে আছে শওকত হাসান, সামনে কফির মগ। কিছুটা হলেও নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। ধূসর রঙের পরিপাটি সুট পরনে, সাদা শার্টের সঙ্গে ম্যাচ করে ধূসর টাই পরেছে।

নিজের ওপর সাংবাদিকের মুগ্ধ দৃষ্টি টের পেয়ে খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করল সায়রা। টেবিলে এসে বসল ও।

'হয়তো ডিনার জ্যাকেট বা ওরকম কিছু পরা উচিত ছিল,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল সে।

'এমনিতেই যথেষ্ট স্মার্ট দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'তাই? কিন্তু তোমাকে যে ডানাকাটা পরীর মত লাগছে?' একটা ভুরু বাঁকিয়ে বলল শওকত হাসান। 'ফাহিম ইমতিয়াজকে রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে আমার!'

'কেন?'

'ওর জন্যেই সেজেছ তুমি, অস্বীকার করতে পারবে?'

স্মিত হাসল সায়রা। 'একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি আমরা, যেনতেন কাপড় পরে তো যেতে পারি না!'

'হতে পারে। যাক্‌গে, মনে হচ্ছে কফি খেয়েই টেনশন কাটাতে হবে। খানিকটা রঙিন পানি হলে মন্দ হত না। কিন্তু ঢাকায় দেখছি কলকাতার মত সব জায়গায় পানীয় বিক্রি হয় না।'

'সত্যি নার্ভাস লাগছে আপনার?'

'খানিকটা তো লাগছেই।'

'সেটা কি অস্বাভাবিক নয়? আমি তো জানতাম আপনার পেশায় সব ধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থাকে।'

'সত্যি, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে কোটিপতিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ হয় না আমাদের। পেন্সিল আর নোট-বুকের আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে রেখে যখন এদের উদ্দেশে একটার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেই, নিজেকে দুর্ভেদ্য বর্ম পরা একজন অধিকর্তা মনে হয় তখন, আর ওদের মনে হয় আমার দয়ার ওপর নির্ভর করা কিছু মানুষ!'

'কারণ ইচ্ছে করলেই অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে এদের বিব্রত করতে পারেন?'

'ঠিক।'

'তাহলে টেনশন করছেন কেন? টেনশন তো করবে ফাহিম ইমতিয়াজ, আপনি হয়তো ওকে বা ওর বন্ধুদের অস্বস্তিকর কোন প্রশ্ন করে বসবেন।'

সরু চোখে তাকাল শওকত হাসান, বোঝার চেষ্টা করছে প্রশ্নটার তাৎপর্য। শেষে শ্রাগ করল, ধরে নিয়েছে কথাচ্ছলে প্রশ্নটা করেছে সায়রা। 'পেন্সিল আর নোট-বুক সঙ্গে নেই যে!' একই রকম হালকা সুরে উত্তর দিল সে।

স্মিত হাসল সায়রা। 'আমার তো মনে হয়, সময়টা ভালই কাটবে আপনার। চৈতী চৌধুরীর চোখের নীরব একটা ইশারায় আপনার সমস্ত নার্ভাসনেস কেটে যাবে!'

'চৈতী চৌধুরীও থাকবে নাকি?' অকপটে জানতে চাইল সে।

'জানি না, তবে আমার ধারণা থাকবে। প্রভার মিস্ট্রেসের কাছে যা শুনেছি, ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে ওর।'

মন্তব্যটা প্রায় নিস্পৃহ সুরে করতে পারায় সন্তুষ্ট হলো সায়রা। গতকাল ফাহিম ইমতিয়াজের উপস্থিতিতে নিজের মধ্যে অচেনা এক প্রভাব আবিষ্কার করেছে, যদিও কারণটা জানা নেই। সায়মার চিঠির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল! শুধুই প্রভাকে সুখী দেখে? নাকি ফাহিম ইমতিয়াজেরও প্রভাব ছিল তাতে?

কালকের সবকিছুই দূরবর্তী মনে হচ্ছে এখন। শওকত হাসানের উপস্থিতিতে পুরানো, চেনা–এবং বাস্তব-জগতে ফিরে এসেছে ও, যে জগতে ফাহিম ইমতিয়াজের মত লোক কখনোই সায়রা রশীদের মত মেয়েদের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না।

এমনিতে যথেষ্ট বাস্তববাদী ও, কল্পনা আর বাস্তবের সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন। যে কোন কিছু বা মানুষ সম্পর্কে কল্পনা করা ওর ধাতের বাইরে। স্বপ্ন লজ্জাহীন, কথাটার সঙ্গে সায়মারই সখ্যতা ছিল বেশি; এবং স্বপ্ন পূরণের জন্যে নির্দ্বিধায় কৌশল খাটাত। ফাহিম ইমতিয়াজের মত কোটিপতিকে প্রলুব্ধ করার মানসিকতা কখনও হবে না ওর, অথচ সায়মা তাই করেছে। অসাধারণ সৌন্দর্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর বনেদী আচরণ দিয়ে মুগ্ধ করেছে মানুষটাকে।

এদিকে সায়রা একেবারে বোকা না হলেও, নিজস্ব আবেদনের সীমা এবং সেটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার ন্যায্যতা উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং সচেতন; সুশ্রী, অকপট, বিনম্র এবং লাজুক; ফাহিম ইমতিয়াজের মত সুদর্শন লোকের উপস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করে। সে কি বলেনি যে ওকে আসলে কুড়ি বছরের তরুণীর মত দেখায়?

'ফাহিম ইমতিয়াজ সম্পর্কে যা শুনেছি, মহিলাদের কাছে সত্যিই আকর্ষণীয় পুরুষ,' সায়রার মুখে স্থির হয়ে আছে শওকত হাসানের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

কিন্তু প্রায় নির্বিকার মুখে তাকাল সায়রা, কথা বলল নিরুত্তাপ এবং নিরপেক্ষ সুরে। 'সেটাই তো স্বাভাবিক। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অর্থের প্রভাব যোগ হলে পুরুষদের ক্ষেত্রে কম্বিনেশনটা সোনায় সোহাগা হয়, শোনেননি? মেয়েরা যে আকৃষ্ট হবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে!'

'রাশিচক্রের ভাষাও জানো দেখছি!' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সাংবাদিক। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল। 'চলো, রওনা দেই।'

মিনিট চল্লিশ পর ফাহিম ইমতিয়াজের বাসায় পৌঁছে গেল ওরা। আগেরবারের মতই, মেইড মেয়েটি দরজা খুলল। সায়রাকে চিনতে পেরে উজ্জ্বল হলো চোখ। 'স্লামালেকুম, আপা! কেমন আছেন?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে শওকত হাসানকে দেখছে সে।

বেশিরভাগ অতিথি আগেই চলে এসেছে, ভেতরের কামরা থেকে মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। হলরূমে ওদের নিয়ে এল মেয়েটি। দুটো দরজা পেরিয়ে তৃতীয়টা খুলল। সায়রার পাশে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল শওকত হাসান, যদিও কণ্ঠে চাপা আমোদ আর বিস্ময় প্রকাশ পাচ্ছেঃ 'আরিব্বাপ্‌স্! প্রাচুর্যেরও গন্ধ আছে, টের পাচ্ছ, সায়রা?'

স্মিত হাসল সায়রা। সুদৃশ্য বিশাল লাউঞ্জে পৌঁছল ওরা। দূর থেকে ওদের দেখে এগিয়ে এল ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী। কালো একটা সুট তার পরনে, গাঢ় নীল রঙের ভেলভেট বো-টাই দারুণ মানিয়ে গেছে সাদা সিল্কের শার্টের ওপর। মুখে উজ্জ্বল হাসি নিয়ে আন্তরিক সম্ভাষণ জানাল সে; তারপর ভেতরে গিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। শরবত, লেমোনেড আর পানীয় পরিবেশন করছে দু'জন বেয়ারা; যার যা ইচ্ছে তুলে নিচ্ছে ট্রে থেকে। সুযোগটা ছাড়তে রাজি নয় শওকত, ট্রে থেকে শ্যাম্পেনের একটা গ্লাস তুলে নিল সে।

'কি নেবে?' ভুরু কুঁচকে সায়রার উদ্দেশে জানতে চাইল সে।

'শরবত।'

ক্ষীণ হাসল সাংবাদিক, তারপর একটা গ্লাস তুলে এগিয়ে দিল ওর দিকে।

সপরিবারে তিনজন ব্যবসায়ী এসেছে, কারও বয়সই পঞ্চাশের কম নয়। একজনের যুবতী মেয়েও এসেছে। সবাই ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর বন্ধু। প্রত্যেকেই ধনী, একনজর দেখেই বুঝতে পারছে সায়রা। খানিকটা হলেও অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল, যেন অচেনা একটা জায়গায় চলে এসেছে, এখানে ওর বা শওকত হাসানের উপস্থিতি বেখাপ্পা, অসঙ্গতিপূর্ণ।

মানুষগুলো আন্তরিক এবং সহৃদয়, এমন ভাবে কথা বলছে যেন বহুদিনের পরিচিত। অথচ সদ্য পরিচয় হয়েছে ওদের, এবং সম্পূর্ণ

ভিন্ন একটি দেশের মানুষ ওরা। এই হচ্ছে ফাহিম ইমতিয়াজের অভ্যাগত শ্রেণী, আনমনে ভাবল সায়রা।

মানুষটাকে এ মুহূর্তে দারুণ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। হাসি মুখে সবার সঙ্গে কথা বলছে, আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি।

রাজশাহীর ব্যবসায়ী হাবিবুল হাসানের সঙ্গে জমিয়ে তুলেছে শওকত হাসান, সমানে হাসছে দু'জন, অন্য কোন দিকে খেয়ালই নেই। মিসেস হাসানও আছে ওদের সঙ্গে, মহিলাই যেন আড্ডাটা বেশি উপভোগ করছে।

সবাই ওর উপস্থিতি সহজ ভাবে নিলেও অন্তত একজনের কাছে নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে সায়রার। দূর থেকে চৈতী চৌধুরীর শীতল দৃষ্টি আঁচ করতে পারছে। খায়রুল কবীরের দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সুপার মডেল, কিন্তু খুব একটা স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছে না তাকে, তবে নিজের সরব এবং উজ্জ্বল উপস্থিতি সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন–দুধে-আলতা ত্বক, নিখুঁত মুখাবয়ব, পটলচেরা চোখ, নিটোল ফিগার…সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ সুন্দরী।

হঠাৎ করে সঙ্গীদের ফেলে ওর দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল চৈতী চৌধুরী। মুখটা নির্লিপ্ত, দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। অজানা এক অস্বস্তি ঘিরে ধরল সায়রাকে। সহসা বাহুতে একটা সবল হাতের স্পর্শ পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফাহিম ইমতিয়াজ। চাপা কৌতুকের হাসি মুখে, কিন্তু হাসিটার গভীরে এক ধরনের প্রশান্তি আর নির্ভরতা খুঁজে পেল সায়রা।

কাউকে ভ্রূক্ষেপ করল না সে, দূর থেকে মাথা নুইয়ে উইশ করল এক ব্যবসায়ী বন্ধুর উদ্দেশে, তারপর উল্টো ঘুরে পেছনে ফেলে দিল আগুয়ান চৈতী চৌধুরীকে। দীর্ঘদেহী ফাহিম ইমতিয়াজ দ্রুত পা ফেলছে, টের পেল সায়রা, তাল মেলাতে গিয়ে প্রায় ছুটতে হলো ওকে। কোথায় যাচ্ছে জানে না, হঠাৎ টের পেল দোতলার ব্যালকনিতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

নানান ফুলের ঝাঁঝাল গন্ধ প্রায় ধাক্কার মত অভ্যর্থনা জানাল ওকে। প্রবল বিস্ময় নিয়ে দেখল দুই কামরা-সমান বিশাল ব্যালকনিতে অসংখ্য কাঠ আর মাটির টব সারি করে রাখা, চেনা-অচেনা হরেক রকম ফুলের সমাবেশ মুগ্ধ করল ওকে।

ব্যালকনির কিনারে এসে দাঁড়াল সায়রা। দূরে আলো-আঁধারিতে

ঘেরা ধানমন্ডি লেক চোখে পড়ছে, পাড়ের নিঃসঙ্গ বাতিগুলো ফুচকুচে কালো পানিতে রূপালী ঝিলিক তুলছে। কুয়াশার পাতলা চাদর ঘিরে রেখেছে রাস্তা আর বাড়িগুলোকে।

'দারুণ সুন্দর জায়গা!' সবিস্ময়ে বলল সায়রা। 'কে জানত বাড়ির ভেতরে লুকানো এত সুন্দর একটা জায়গা আছে?'

'লুকানো থাকবে কেন,' স্মিত হেসে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'সুন্দর যে কোন জিনিসই উন্মুক্ত থাকা উচিত, অন্তত আমার তাই ধারণা, যাতে সবাই সেটা উপভোগ করতে পারে।' সায়রার মুখে স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি, কথাগুলোর যেন বিশেষ তাৎপর্য আছে; আরও গভীর কিছু বোঝাতে চাইছে সে?

'তুমি দেখছি খুব দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছ, সায়রা,' হালকা সুরে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ, মুচকি হাসছে। 'আজ রাতে তোমাকে কুড়ি বছরের তরুণীর মত দেখাচ্ছে!' উত্তরে সায়রাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে হাসিটা প্রসারিত হলো। 'জানো না, এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা আছে যারা কুড়ি বছরের বয়সটা ফেরত পেতে প্রয়োজনে দাঁত বা একটা চোখও হারাতে রাজি?'

'কিন্তু যখন তাদের বয়স চব্বিশ বা ছাব্বিশ, তখন নিশ্চই চাইবে না?'

'তাহলে কি পঁয়ত্রিশ বছরের মাঝবয়সী মহিলা হতে চাও তুমি? অভিজাত, বনেদী মহিলা···হীরা আর সিল্কের আবরণে নিজেকে মুড়ে রাখার সৌভাগ্য চাও?'

'উঁহুঁ, চব্বিশেই সন্তুষ্ট আমি। ধন্যবাদ। হীরার প্রতি আগ্রহ নেই আমার, কারণ যে কোন সময়ে হারিয়ে ফেলতে পারি ওসব। সিল্কের ব্যাপারেও আগ্রহী নই। কিছু সুন্দর প্রাণীকে হত্যা করে যে জিনিস তৈরি হয়, সেসব পরে ধনী মহিলা হতে চাই না আমি।'

হাসল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'তারুণ্যের অহঙ্কার! তোমার পায়ের জুতো বা ব্যাগের ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা দেবে, ওগুলো তো পশুর চামড়া থেকে তৈরি, তাই না?'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার, আপনিও তা জানেন! আমি নিরামিষভোজীও নই। দুর্বলকে শিকার করে বেঁচে থাকে সবলরা, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। চামড়া বা মাংসের জন্যে কোন প্রাণীকে হত্যা করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু স্রেফ আনন্দ বা বিলাস সামগ্রীর জন্যে প্রাণী হত্যা রীতিমত জঘন্য

অপরাধ!'

'তোমার সঙ্গে অনেকেই একমত হবে না।'

'আমার মতামত তো স্রেফ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তাতে কেন কেয়ার করবে অন্যরা?' স্থির দৃষ্টিতে ফাহিম ইমতিয়াজকে দেখছে সায়রা, মনে আশঙ্কা ওর যুক্তি শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসবে সে, কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেল না।

'সম্পূর্ণ একমত আমি, সুতরাং এভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না! চৈতীর উদ্দেশে আবার লেকচার দিয়ে বসো না! হীরা আর সিল্ক পরনে আছে ওর, তোমার কথা শুনে হাসবে ও।'

'কাউকে বিদ্রূপ করা যেমন অপছন্দ, তেমনি কেউ আমাকে সেটা করলেও ভাল লাগে না আমার,' গম্ভীর স্বরে বলল ও।

'হুঁ...সতর্ক করে দিচ্ছ?'

ঝট করে ফিরে তাকাল সায়রা, ফাহিম ইমতিয়াজের চোখে চোখ রাখল। কৌতুক তার চোখের গভীরে, মিটিমিটি হাসছে। 'আপনাকে কেন সতর্ক করতে যাব আমি?' চোখ সরিয়ে লেকের দিকে তাকাল ও। 'আপনি আসলে আমাকে বাজিয়ে দেখতে চাইছেন, তাই না?'

দুই আঙুলে ওর মাথায় আলতো চাঁটি মারল ফাহিম। 'বাহ্, ছোট্ট মাথায় এত বুদ্ধি তোমার!'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে, স্পষ্ট শুনতে পেল সায়রা। 'হ্যাঁ, কিছুটা বাজিয়ে দেখতে চাইছি তোমাকে, জানতে চাইছি...'

'কেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল ও।

'কৌতূহল।'

'বেশি কৌতূহল ভাল না।'

'কিন্তু সেটা কেবলই বেড়ে যাচ্ছে,' চিন্তিত স্বরে স্বীকার করল সে। 'দু'জন দুই মেরুর মানুষ তোমরা–তুমি আর সায়মা।'

মন্তব্যটা এড়িয়ে গেল সায়রা। 'প্রভাকে দেখলাম না যে?' প্রসঙ্গ বদলাল ও।

'ঘুমাচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই ওর, বিকেল থেকে জ্বর উঠেছে।'

'বেশি?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সায়রা। 'দেখে আসি ওকে?'

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ফাহিম ইমতিয়াজের মধ্যে, নীরব বিস্ময়ে জরিপ করছে সায়রাকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'অদ্ভুত

হলেও সত্যি, সায়রা, প্রভার জন্যে তোমার বোনের মধ্যে ন্যূনতম উদ্বেগও দেখিনি কখনও!' প্রায় হতাশার সুরে বলল সে।

থমকে গেল সায়রা। 'অবাস্তব একটা কথা বললেন! কোন মা কি নিজের মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারে?'

'পারে। যাক্‌গে, প্রসঙ্গটা ভুলে থাকাই ভাল। সায়মার সম্পর্কে সমালোচনা শুনতে নিশ্চই আসোনি তুমি!'

সায়রাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিল না সে, ব্যালকনির আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের কামরায়। সুন্দর, পরিপাটি কামরা। প্রভার নার্সারিতে যেমন দেখেছিল, দেয়ালে রঙিন ছবি আর অসংখ্য খেলনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সারা ঘরে। বিছানায় ঘুমাচ্ছে প্রভা, মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

প্রভার শিয়রে গিয়ে বসল ও, ছোট্ট মেয়েটির কপাল স্পর্শ করল হাতের তালু দিয়ে। জ্বর নেই তেমন। 'জ্বর মেপেছিলেন?' ঘাড় ফিরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো ফাহিম ইমতিয়াজের উদ্দেশে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, সন্ধেয় একশো ডিগ্রি ছিল।'

'কিছু খাইয়েছেন?'

'এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে প্যারাসিটামল সিরাপ দিয়েছি।'

ঘুমের মধ্যে কেশে উঠল প্রভা, পাশ ফিরে শু'লো। হাত প্রসারিত করতে সায়রার কোলে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা। মায়া ভরা দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 'সিনডারেলা আন্নি!' তন্দ্রালু স্বরে বিড়বিড় করল প্রভা।

চাপা স্বরে হেসে উঠল সায়রা।

উঠে বসেছে প্রভা, তারপর বাপকে দেখল একনজর। 'জ্বর ভাল হয়ে গেছে আমার, বাবা!'

'সিনডারেলা আন্টিকে দেখে?' মুখ টিপে হেসে উঠল ফাহিম ইমতিয়াজ, চোখ স্থির হয়ে আছে সায়রার মুখে।

মাথা ঝাঁকাল প্রভা, তারপর সায়রার কোলে এসে বসল। ছোট্ট দুই বাহু প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরল সায়রার গলা, চুমো খেল ওর গালে। 'কখন এসেছ, আন্নি?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

'আমাকে ডাকোনি কেন?'

'তুমি যে ঘুমাচ্ছিলে।'

সায়রার বুকের সঙ্গে গুটিয়ে এল প্রভা, গলা ছাড়েনি এখনও। 'ঘুম পাচ্ছে আমার, আন্নি,' জড়ানো স্বরে বলল ও।

'ঘুমাও।' প্রভার রেশমী চুলে বিলি কাটতে শুরু করল সায়রা, ঝুঁকে চুমো খেল মেয়েটির কপালে। ঠোঁটে প্রভার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছে।

'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি, আন্নি?' চোখ না মেলেই প্রশ্ন করল প্রভা। 'তোমাকে দেখিনি কেন?'

'আমি যে অন্য একটা দেশে থাকি!'

'অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'সেজন্যেই তো তুমি সিনডারেলা আন্নি!'

শিশুসুলভ যুক্তি, অদ্ভুত হলেও বেখাপ্পা লাগছে না সায়রার কাছে। মা-হারানো একটা ছোট মেয়ের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আবারও প্রভাকে চুমো খেল ও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে নিষ্পাপ মুখটা। টানছে ওকে। কোন বাচ্চাকে এতটা কাছের মনে হয়নি, নিজেরই একটা অংশ মনে হচ্ছে, হয়তো সায়মার মেয়ে বলেই···

'ক'দিন পরেই চলে যাবে তুমি, তাই না?' প্রভার বিষণ্ন স্বরের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরল ওর।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সায়রা, কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। দৃষ্টি নামাতে দেখতে পেল নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে প্রভা, চাহনিতে প্রত্যাশা ঝরে পড়ছে।

'থাকবে ও,' উত্তরটা দিল ফাহিম ইমতিয়াজ, এবং এতক্ষণে তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো সায়রা, ভুলেই গিয়েছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। সায়রা ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতে দ্রুত যোগ করল: 'অন্তত কিছুদিন।'

কিন্তু বাপের দিকে তাকায়নি প্রভা, যেন প্রশ্নটার উত্তর সায়রার কাছ থেকেই আশা করছে।

'থাকব,' বলল সায়রা।

খুশির ঝিলিক দেখা গেল প্রভার চোখে, মিষ্টি করে হাসল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বন্ধ করল প্রভা, সায়রার আদর উপভোগ করছে।

'কাউকে ঠকাতে চাই না আমি,' কিছুক্ষণ পর, না তাকিয়েই ফাহিম ইমতিয়াজের উদ্দেশে বলল সায়রা। 'কোন বাচ্চাকে তো নয়ই। আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন!'

'সত্যিও তো হতে পারে। আজব কত কিছুই তো ঘটে দুনিয়ায়!' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল কোটিপতি।

'কিন্তু নিষ্পাপ একটা বাচ্চাকে ঠকানোর মধ্যে...'

'সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন ব্যাপারটা?'

'না নিয়ে উপায় আছে? শেষে ও-ই কষ্ট পাবে।'

'দেখা যাবে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। নিরুত্তাপ স্বরে বোঝা গেল প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করতে চাইছে। 'ওদিকে বোধহয় আমাকে খুঁজতে শুরু করেছে সবাই। যাবে না?'

'কিন্তু ওর কাছে কারও থাকা উচিত।'

'হাস্না খালাকে পাঠিয়ে দেব।'

'উঁহুঁ, আপনি বরং চলে যান। আমার অভাব বোধ করবে না কেউ। প্রভা ঘুমিয়ে পড়লে চলে আসব আমি।'

'আমি করব,' বিড়বিড় করে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত।

প্রভা ঘুমিয়ে পড়ার পরও উঠল না সায়রা। পার্টির ভিড়ে শামিল হওয়ার চেয়ে ছোট্ট এই মেয়েটির সঙ্গই বেশি ভাল লাগছে ওর।

হাস্না রহমানের পদশব্দে ফিরে তাকাল ও।

'ওরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে,' নিচু স্বরে বললেন মহিলা।

প্রভাকে শুইয়ে দিল সায়রা। ঝুঁকে চুমো খেল মেয়েটির কপালে। 'আপনি থাকবেন ওর কাছে?'

'হ্যাঁ। টেবিলে খাবার দেওয়ার জন্যে অবশ্য যেতে হবে একটু পর। কাউকে ডেকে নেব এখানে থাকার জন্যে। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

বেরিয়ে এল সায়রা।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম ইমতিয়াজ। সিগারেট ফুঁকছে।

সায়রা অপেক্ষা করবে কিনা ভাবছে এসময় ওকে দাঁড়াতে বলল সে। 'আমি দুঃখিত, সায়রা।'

'কেন?'

'ওই যে বললে...তোমাকে বাধ্য করেছি। প্রভাকে খুশি করার

জন্যে বলেছি কথাটা।'

'ভুলে গেছি ব্যাপারটা।'

সিগারেট শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'চলো।'

'আপনার ভাই কি এসেছে?'

'জাবির? ও না এসে পারে? দুঃসময় আর নোংরা টাকা যেমন এড়ানো যায় না, ওকেও এড়ানো কঠিন!'

সায়রা বুঝতে পারল না ঠিক কিভাবে নেবে মন্তব্যটা, শেষে হালকা ভাবে নেওয়াই মনস্থির করল। 'তাই? আমার কাছে তো দারুণ হাসি-খুশি মানুষ মনে হলো। যে কেউ পছন্দ করবে তাকে।'

গাঢ় কালো চোখজোড়া স্থির হলো সায়রার মুখে, মুহূর্তের জন্যে নিরীখ করল; প্রায় নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে ফাহিম ইমতিয়াজের মুখটা। 'হ্যাঁ, ভাল মনে হতে পারে ওকে, পছন্দও করতে পারো। কিন্তু খুব বেশি পছন্দ করে বসো না আবার।'

'মনে হয় না সেরকম কিছু হবে,' অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে বলল সায়রা। ফাহিম ইমতিয়াজের অকপট পরামর্শ প্রায় বিহ্বল করে তুলেছে ওকে।

অতিথির সংখ্যা বেড়েছে। দূর থেকে জাবির মাহমুদকে দেখতে পেল সায়রা। চৈতী চৌধুরী যদি অনুষ্ঠানে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে জাবির সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ। বাদামী রঙের একটা সুট পরেছে সে, চৈতী চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছে এক কোণে দাঁড়িয়ে। কি যেন বলল জাবির, আর খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল চৈতী। ডান হাতে কিল বসিয়ে দিল জাবিরের বুকে। পাল্টা চৈতীর নাক চেপে ধরে টান দিল সে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দু'জনে শুধু পূর্ব পরিচিতই নয়, বরং অন্তরঙ্গও।

চৈতী চৌধুরীর ওপর সেঁটে আছে সায়রার অনুসন্ধানী দৃষ্টি। দারুণ লাগছে সুপার মডেলকে, নিঃসঙ্কোচে ভাবল ও, নীল সিল্কের শাড়িতে অপূর্ব সুন্দরী মনে হচ্ছে। সৌন্দর্য, নিটোল ফিগার আর মোহনীয় ভঙ্গিমার কারণে ঘরের যে কোন পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথার ওপর খোঁপা বাঁধা চুল কুচকুচে কালো। হাতা-কাটা ব্লাউজের কারণে ফর্সা সুগঠিত কাঁধ আর ঘাড়ের বেশ কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। আনমনে মেয়েটির ছবি আঁকল সায়রা, পেন্সিল আর কালিতে অপূর্ব একটা মুখ ফুটিয়ে তুলল মনের আয়নায়, সপ্রতিভ অসাধারণ সুন্দরী এক নারী।

একটু আগের আড়ষ্ট পরিবেশ আর নেই এখন, টের পেল সায়রা, জমজমাট এবং সরব হয়ে উঠেছে। চৈতী চৌধুরীর সঙ্গে জাবিরের অন্তরঙ্গতা দেখে আলোচনার মওকা পেয়ে গেছে অন্যরা, জল্পনা-কল্পনা-রটনায় মেতে উঠল বেশিরভাগ লোক, ভদ্রমহিলারা পর্যন্ত যোগ দিয়েছে।

সরাসরি সায়রার দিকে এগিয়ে এল জাবির, সোফায় ওর পাশে বসল। এমন ভাবে ওর একটা হাত তুলে নিল যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিছুটা হলেও অস্বস্তি আর বিরক্তি অনুভব করল সায়রা। আজকের আগে ক্ষণিকের জন্যে সৌজন্য আলাপ হয়েছিল ওদের, অথচ জাবিরের আচরণে মনে হচ্ছে সায়রা যেন কতদিনের চেনা!

'তোমাকে দেখে কি যে খুশি হয়েছি!' উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল সে, পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। 'একটা কথা না বলে পারছি না, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে—এই কামরার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে!'

'বাজে কথা!' তৎক্ষণাৎ বিরক্তি প্রকাশ করল সায়রা। 'বোকার মত কথা বলবেন না!'

বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল জাবিরের চোখ, তারপর ক্লিষ্ট ভাবে হাসল। 'তুমি দেখছি কঠিন চিজ, তোষামোদে গলানো যাবে না!'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আমি কিন্তু তোষামোদ করিনি, সত্যি কথা বলেছি। এবার বলো তো, ফাহিমের সঙ্গে কবে থেকে জানাশোনা তোমার?'

'গতকাল থেকে।'

বিস্ফারিত হলো জাবিরের চোখ জোড়া, নিখাদ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আনমনে একটা কাঁধ উঁচাল। 'সত্যি? ভাবছিলাম তোমাকে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল ও, কিন্তু এও মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে ঠিক মানায় না ওকে, কারণ ওর মত নও তুমি। ফাহিম আসলে অভিজাত বনেদী মেয়েদের প্রতি আগ্রহী, যেমন চৈতী চৌধুরী। দু'জনকে দারুণ মানায়, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বিব্রত স্বরে বলল সায়রা, জাবিরের অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি বিস্মিত করেছে ওকে। ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে ওর মানানোর প্রশ্ন আসছে কেন? তবে ঠিকই বলেছে সে, ফাহিম আর চৈতী চৌধুরীর জুটিটা মানানসই। একজনের অতুলনীয় সৌন্দর্য, আর অন্যজনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব—সোনায় সোহাগা!

খানিকটা হলেও বিষণ্ন বোধ করছে ও। জাবির সরে যাওয়ায় খুশিই হলো, মানুষটার অস্বস্তিকর কথা শুনতে হবে না। শওকত হাসানের খোঁজে চারপাশে তাকাল, দেখল হাবিবুল হাসানের মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে সে।

হাস্না রহমানকে দেখা গেল দরজায়। চড়া কণ্ঠে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন মহিলা: ডিনার টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।

সবাই আশা করছে ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী নিজে পথ দেখিয়ে ডাইনিংরুমে নিয়ে যাবে ওদের। ব্যাপারটা নভেলে পড়া পরিস্থিতির মত মনে হলো সায়রার কাছে, কিছুটা পিছিয়ে থাকল ও, অন্যদের চোখের আড়ালে থাকতে পারলে যেন বাঁচে। আশা করছে চৈতী চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবে ফাহিম, জাবির বা শওকত হাসানের সঙ্গে যেতে পারবে ও।

কিন্তু সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে এল ফাহিম ইমতিয়াজ, কাছে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘরের সবক'টা চোখ এ মুহূর্তে স্থির হয়ে আছে ওর ওপর, স্পষ্ট বুঝতে পারছে সায়রা, এবং এও জানে অজান্তে লালচে হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। তিক্ত মনে গাল দিল নিজেকে। ওর ধারণা ছিল শৈশবের এ অভ্যাসটা দূর করতে পেরেছে, কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজের উপস্থিতিতে ধারণাটা ভেঙে গেছে এখন।

উঠে দাঁড়িয়ে ফাহিম ইমতিয়াজের হাতে নিজের হাত তুলে দিল সায়রা। স্মিত হাসছে সে, অভয় দেয়ার এবং সন্তুষ্টির হাসি। মুহূর্তে স্বস্তি বোধ করল সায়রা, এতক্ষণ মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডের চারপাশে অদৃশ্য একটা ফাঁস এঁটে বসছে; অথচ কি এক জাদুর ছোঁয়ায় সেটাকে সরিয়ে দিয়েছে সে!

ওর হাতে আলতো চাপ দিল ফাহিম। শুধু হাতটাই ধরেনি সে, বরং সায়রার আঙুলের ফাঁকে নিজের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে, বন্ধনটা দৃঢ় করে তুলেছে। নিশ্চিত পদক্ষেপে এবার দরজার দিকে এগোল সে, করিডর পেরোলেই ডাইনিংরুম।

উজ্জ্বল আলোয় রীতিমত ঝলমল করছে কামরাটা। মেহগনি কাঠের বিশাল টেবিলের চারপাশে চেয়ারের সারি, প্রতিটিতে নিখুঁত কারুকাজ করা। ছাদ থেকে ঝুলছে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি, উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে তুলেছে পুরো টেবিল। সায়রার মনে হলো সামান্য একটা

সুঁইও দেখা যাবে। রূপালী কাটলারির কোমল দ্যুতি আর ক্রিস্টালের তৈরি গ্লাসে আলোর প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আনমনে হাসল সায়রা। স্বপ্ন দেখছে না তো? নিজের উপস্থিতি মনে হচ্ছে রূপকথার রাজকন্যার মত…*সিনডারেলা হয়ে গেছি আমি,* স্বপ্নাচ্ছন্ন তরুণীর মত ভাবল ও, চোখ তুলে দেখল ফাহিম ইমতিয়াজকে, *আর এ হচ্ছে*…যুগপৎ বিস্ময় আর মুগ্ধতার সঙ্গে ওর আনন্দ দেখছে সে; *কিন্তু রাত বারোটার ঘণ্টা বাজার ব্যাপারে মাথা-ব্যথা নেই আমার!*

ফাহিম ইমতিয়াজ বসেছে টেবিলের একেবারে মাথায়। ডানের সারির প্রথম চেয়ারে বসেছে সায়রা, তারপর শওকত হাসান। হয়তো নিজেই অতিথিদের আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সে, ভাবল সায়রা, যাতে ও বা শওকত হাসান নিঃসঙ্গ বোধ না করে। নিজে আলাদা বসেছে, এবং ওখান থেকেই সব অতিথির সঙ্গে কথা বলতে পারবে। সুবিবেচনা আর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে সে।

বামের সারির প্রথম চেয়ারে বসেছে চৈতী চৌধুরী, পাশে জাবির মাহমুদ। সুপার মডেলকে সামনে পেয়ে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে শওকত হাসানকে, তাকিয়ে আছে আগ্রহ ভরে–খাওয়ার ফাঁকে চৈতী চৌধুরীর ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ তার হাতের মুঠোয়।

উল্টোদিকের দেয়ালে ছবিটা দেখতে পেল সায়রা। সায়মার পোর্ট্রেট। বয়স্ক এক দম্পতির ছবিও রয়েছে পাশে। বোধহয় প্রভার দাদা-দাদী, ধারণা করল ও। খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বোনের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল, বিস্ময়ের কারণটা নিজেও বুঝতে পারছে না। নীল একটা জামদানী শাড়ি পরনে সায়মার, হাসছে এবং অপরূপাও দেখাচ্ছে ওকে; কিন্তু চোখের গভীরে লুকিয়ে আছে চাপা বিষণ্নতা। অন্য কেউ হলে হয়তো ধরতেই পারত না, কিন্তু সায়মাকে ওর চেয়ে বেশি কে চিনবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিল ও, মৃত বোন সম্পর্কে আপাতত চিন্তা করতে অনিচ্ছুক। দৃষ্টি নামাতে জাবিরের সাথে চোখাচোখি হলো, সায়রার মনে হলো ওর প্রতিটি নড়াচড়া নিরীখ করছে সে–তীক্ষ্ণ এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

'সায়রা দেখতে ঠিক ওর বোনের মত, তাই না?' আচমকা চড়া কণ্ঠে মন্তব্য করল জাবির।

সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। মন্তব্যটা এমনিতেই অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে সায়রাকে, সবার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আঁচ করতে পেরে সেটা যেন আরও বেড়ে গেল। চোখ তুলে জাবিরের দিকে তাকাল ও, দেখল মিটিমিটি হাসছে সে, ওর অস্বস্তি দেখে আমোদ পাচ্ছে।

মন্তব্য করল না কেউ।

'উঁহুঁ, সায়মার মত নই আমি,' খানিকটা নিস্পৃহ সুরে সাফাই গাইল ও। 'আপনাদের দুই ভাইয়ে যতটা মিল, ঠিক ততটাই আমাদের মধ্যে!'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা, শীতল এবং নির্লিপ্ত হয়ে গেল জাবিরের চাহনি। শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে শ্রাগ করল সে। 'স্যালুট তোমাকে, সায়রা! জিভটাও দেখছি ধারাল তোমার!'

মন্তব্যটা এড়িয়ে গেল ও, তর্ক করে জাবিরকে সুযোগ দিতে নারাজ। পাশ ফিরে ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে তাকাল। 'সত্যিই কি মিল আছে আমাদের?'

'তুমি জানো না?'

'বিস্ময়কর হলেও, সত্যিই জানি না। ওর চেহারা মনে করতে পারছি না। পাঁচ বছর আগে শেষ দেখেছি ওকে। ছবিটা কবের?'

'আমাদের বিয়ের পরপরই আঁকা হয়েছিল ওটা,' সংক্ষেপে উত্তর দিল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'কি নেবে, চৈতী?'

'কোক,' আয়ত কালো চোখ ঘুরিয়ে ফাহিমের দিকে তাকাল সে। বিলোল কটাক্ষে কুপোকাত হয়ে যাওয়া উচিত ফাহিম ইমতিয়াজের, কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 'বুঝতে পারছি না এখনও ছবিটা ঝুলিয়ে রেখেছ কেন! অস্বাস্থ্যকর একটা ছবি, এ বাড়ির বেশিরভাগ মানুষই ছবিটা দেখতে দেখতে বিষণ্ন বোধ করবে!'

শ্রাগ করল কোটিপতি। 'এ কামরায় খুব একটা আসি না আমি। তাছাড়া ছবিটার দিকে চোখও পড়ে না, যদি না কেউ প্রসঙ্গ তোলে। আমার মনে হয়···এতদিনে ওটা এ ঘরের আসবাবপত্রের একটা অংশ হয়ে গেছে।'

'সায়মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে না বটে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত আচরণ, কি বলো, সায়রা?' শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে যখন তাকাল সায়রা, কিছুটা নিরুত্তাপ স্বরে খেই ধরল সুপার মডেল। 'মৃত স্ত্রীর শোক বা স্মৃতি নিয়ে কোন যুবক সারা জীবন কাটিয়ে দেবে,

তারও কোন অর্থ নেই, তাই না?'

প্রসঙ্গটাই বিরক্তিকর এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে সায়রার কাছে। এবং ওর জন্যে বিব্রতকর। কিন্তু চৈতী আর জাবির যেন ইচ্ছে করেই আলোচনাটাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। প্রসঙ্গ পাল্টানো জরুরী মনে হলো ওর।

সংসদ ভবনে ঘুরতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই আলাপে যোগ দিল শওকত হাসান। মুহূর্তের মধ্যে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল চৈতী, উল্টোদিকে সাংবাদিকের পাশে বসা মিসেস কবীরের দিকে ফিরল। আড়চোখে ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে তাকাল সায়রা। মৃদু রহস্যময় হাসি তার ঠোঁটের কোণে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ক্ষীণ মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমোদন এবং সন্তোষ প্রকাশ করল সে, শওকত হাসান আর ওর সঙ্গে ঢাকার রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ শুরু করল।

আড়ষ্ট পরিবেশটা সহজ হয়ে গেল এবার। নিচু স্বরে আলাপ করছে কেউ কেউ, গ্লাস আর চামচের টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। খাবারটা রুচিকর, সুস্বাদু।

ডিনারের পর লাউঞ্জে কফি পরিবেশন করা হলো। আরামদায়ক আর্মচেয়ারে বসেছে সায়রা, হাতে কফির মগ। আনমনে ভাবছে চৈতী চৌধুরীর হঠাৎ ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠার কারণ। যার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে, তাকে ছেড়ে মৃত স্ত্রীর বোনকে সময় দিয়েছে বলে? নাকি ডাইনিংরুমে যাওয়ার সময় ফাহিম তার হাত ধরেনি বলে?

কে জানে! আনমনে ভাবল ও। নিঃসন্দেহে কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ফাহিম ইমতিয়াজ–প্রথম দিনেই খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে ওকে, এবং প্রায় উপেক্ষা করেছে হবু স্ত্রীকে! আর কেউ না হোক, অন্তত দু'জন সেটা পছন্দ করেনি–জাবির আর চৈতী।

পশ্চিমা দেশের মতই কয়েক ধরনের পানীয় পরিবেশন করা হলো। মহিলাদের ক্ষেত্রেও বাধা নেই, কিন্তু চৈতী চৌধুরী আর দু'জন বয়স্কা মহিলা ছাড়া কাউকে তেমন আগ্রহী মনে হলো না। বেশিরভাগ পুরুষই কোন না কোন লিকার গিলছে। জাবিরের হাতে সবসময়ই একটা গ্লাস দেখতে পেল সায়রা। প্রায় সারাক্ষণই ওকে চোখে চোখে রাখছে সে, না তাকিয়েও টের পাচ্ছে ও, চাপা অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। উপেক্ষা করার চেষ্টা করেও লাভ হচ্ছে না।

কিন্তু এরচেয়েও অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক একটা ব্যাপার ঘটছে।

ঘরের তাবৎ মহিলাদের মধ্যে যেন একমাত্র ওর সঙ্গই উপভোগ্য ও কাম্য মনে হচ্ছে ফাহিম ইমতিয়াজের, সারাক্ষণই ধারে-কাছে থাকছে সে। এ মুহূর্তে ওর আর্মচেয়ারের হাতলে বসে আছে সে, একটা হাত পড়ে আছে ব্যাকরেস্টের ওপর, ঠিক ওর মাথার পেছনে। সায়রা জানে ইঞ্চিখানেক নড়লেই ওর চুলের ছোঁয়া পাবে ফাহিমের হাত। চিন্তাটা মুহূর্তের মধ্যে অস্থির করে তুলল ওকে, সারা জীবনেও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। শওকত হাসান কিংবা অন্য যে কোন পুরুষের চেয়ে ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গই বা কেন এত ভাল লাগছে ওর? প্রায়ই নিঃশ্বাস আটকে আসছে, হৃদয়ের গভীরে চাপা কিন্তু সরব আলোড়ন টের পাচ্ছে। মানুষটার সামান্য স্মিত হাসিই ওর হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিচ্ছে!

কেন এমন হচ্ছে, জানে না সায়রা। জাবিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অস্বস্তির চাদরের মত জড়িয়ে রেখেছে ওকে সারাক্ষণ, আড়ষ্ট বোধ করছে। দূর থেকে ফাহিম আর ওর ওপর একটা চোখ রেখেছে সে। চৈতী চৌধুরীর মত সেও ঈর্ষা বোধ করছে নাকি?

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে উদ্ধার করার প্রয়াস পেল সায়রা। শওকত হাসান আর এক ভদ্রলোকের আলাপে মনোযোগ দিল। ভদ্রলোক মাঝবয়সী, ফাহিম ইমতিয়াজের কোন ফার্মে কাজ করেন বোধহয়, পরিচয়ের সময় জানিয়েছিল ফাহিম।

'কোন স্টোরি কাভার করতে ঢাকায় এসেছেন?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'না,' উত্তরে জানাল সাংবাদিক। 'স্রেফ ছুটি কাটাতে এলেও চোখ-কান খোলা রাখছি, সুযোগ পেলে চমকপ্রদ যে কোন স্টোরি কাভার করার ইচ্ছে আছে।'

'সারাক্ষণ নিজের চোখ খোলা রাখেন...যদি কোন খবর জুটে যায়?'

'ঠিক। কথায় আছে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?' একমত হলো শওকত। আড়চোখে সায়রার দিকে তাকাল, চোখাচোখি হলো। 'তবে স্বীকার করছি, দু'একটা আইডিয়া আছে মাথায়!'

'সম্ভবত শো-বিজনেসের দিকেই আগ্রহ বেশি আপনার?' মিসেস কবীরের সঙ্গে আলাপরত চৈতী চৌধুরীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'শো-বিজনেসেরও সীজন আছে। এ সময়টা খুব

ব্যস্ত কাটে সবার। মনে হয় না আপনাকে সময় দেবে কেউ।' গম্ভীর, আলসেমি ভরা কণ্ঠে বলল সে। কথার মাঝখানে হাতটা সামান্য নাড়ল, স্রেফ অসচেতন ভাবে, কিন্তু সায়রার চুলের ছোঁয়া পেল হাতখানা। সায়রা নিজেও সচেতন, চোখ তুলে তাকাল ও, চার চোখ মিলিত হলো···

'বলুন তো, কি আইডিয়া চলছে আপনার মাথায়,' তাড়া প্রকাশ পেল জাবিরের কণ্ঠে, উসখুস করছে সে। শওকত হাসানের উদ্দেশে সায়রার অর্থপূর্ণ চাহনি নজর এড়ায়নি তার, ঠিকই বুঝেছে দেশী-ভাইকে সতর্ক করে দিতে চাইছে সায়রা। 'একটু আগে বলেছেন কিছু খবরও নাকি পেয়ে গেছেন···কিসের খবর? সরকারের উঁচু পর্যায়ে নজীরবিহীন দুর্নীতি, শো-বিজ তারকাদের স্ক্যান্ডাল নাকি খুনের রহস্য?'

জাবিরের কথা শুনে হেসে উঠল ফাহিম। কিন্তু স্রেফ সামান্য কাঁধ উঁচাল শওকত হাসান। 'একটা খুনের রহস্য নিয়ে অবশ্য আগ্রহী হয়ে উঠেছি ইতোমধ্যে!'

ঝটিতি সাংবাদিকের দিকে ফিরল সায়রা, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পুরুষদের আলাপে নাক গলাচ্ছে। 'কিসের খুনের কথা বলছেন, শওকত ভাই?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও। 'সত্যি কথা বলতে কি, ঢাকায় আসার পর সংসদ ভবন ছাড়া কোথাও যাননি আপনি। আমার তো মনে হয়, খুনের রহস্য উন্মোচন দূরে থাক, যে কোন খবর সংগ্রহ করার মত সুযোগই পাননি!'

নীরবতা নেমে এল। স্থবির কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, প্রায় প্রত্যেকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সবার উৎসুক দৃষ্টি আঁচ করতে পেরে অজান্তে আভা ছড়াল সায়রার মুখে, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল, বুঝতে পারছে প্রতিবাদ করে আসলে শওকত হাসানের কথার সত্যতাই প্রমাণ করেছে।

আচমকা যেন আগ্রহী হয়ে উঠল চৈতী চৌধুরী। সায়মার পোর্ট্রেট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপের পর থেকে সায়রার প্রতি একরকম উদাসীন ছিল, এবার যেন মজাদার একটা প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়েছে। 'এত নাখোশ হওয়ার কি আছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করল সে। 'তুমি কি মনে করো সেই যোগ্যতা নেই ওঁর?'

উত্তর দিল না সায়রা। মিসেস কবীর বোধহয় ওর অস্বস্তি ধরতে

পারলেন, দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন। 'রান্নাটা দারুণ হয়েছে, ফাহিম!' হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন মহিলা, 'তোমার কূক সত্যি ভাল রাঁধে।'

'সব কৃতিত্ব হাস্না খালার। উনিই রান্না করেছেন,' জবাব দিল ফাহিম, সায়রার মাথার পেছন থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে।

কূকদের নিয়ে আলাপ চলতে থাকল, যার যার সমস্যার কথা বলছে সবাই, পরামর্শ দিচ্ছে অন্যকে। সায়রার ধারণা অন্তত এই একটা ব্যাপারে কখনও সমস্যা হবে না ওর, নিজের রান্না নিজে করতেই অভ্যস্ত ও, এবং উপভোগও করে।

হাস্না রহমান ডাকতে ক্ষমা চেয়ে সরে গেল ফাহিম ইমতিয়াজ। মিনিট দশেক পরই ফিরে এল সে, চৈতী চৌধুরীর সঙ্গে কামরার এক কোণে সরে গেল। নিচু স্বরে আলাপ করছে দু'জন, দেখল সায়রা। ফাহিমের কাঁধে একটা হাত তুলে দিল সুপার মডেল, কিছুটা সরে এল পুরুষটির দিকে; পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, ফাহিম ইমতিয়াজের কানে কানে বলল কি যেন। হেসে উঠল ফাহিম, উত্তরে নিচু স্বরে বলল কিছু।

চোখ সরিয়ে নিল ও। হয়তো পরোক্ষ ভাবে নিকট ভবিষ্যৎ-আর নিজের দাবি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে চৈতী চৌধুরী, সেজন্যেই গা-জ্বালানো ঢলাঢলি করছে ফাহিমের সঙ্গে। বিতৃষ্ণা বোধ করল সায়রা। নেকামিরও একটা সীমা থাকা উচিত, যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে লোক-দেখানো ঢলাঢলি করার কি আছে!

কিন্তু সায়রা জানে না হতাশা আর বেদনা ফুটে উঠেছে ওর দৃষ্টিতে। আর কেউ না দেখলেও, অন্তত শওকত হাসানের চোখ এড়ায়নি। সায়রার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফাহিম আর চৈতীকে দেখল সাংবাদিক, সুপার মডেলের মেকি আন্তরিকতা ধরতে ব্যর্থ হলো। উৎসুক দৃষ্টিতে তিনজনের ওপর নজর রাখল সে; ঈর্ষা নয়, বরং সীমাহীন আগ্রহ এবং কৌতূহল বোধ করছে কোটিপতির ব্যাপারে।

কারণটা কি, সায়মার রহস্যময় চিঠি? সত্যিই কি স্ত্রীকে খুন করেছে ফাহিম ইমতিয়াজ? কোটিপতিকে ঠিক পছন্দ হয়নি ওর, কিন্তু তারপরও বুঝতে পারছে সাজানো দুর্ঘটনার মাধ্যমে স্ত্রীকে খুন করার মত বিকৃত রুচি বা চরম প্রতিহিংসা নেই তার মধ্যে। মানুষটার ধাত অন্যরকম। কিন্তু এও ঠিক, সঠিক ভাবে বলা কঠিন। হাজার হাজার

খুন হয় প্রতিদিন, কিন্তু এদের ক'জন জাত খুনী? সাধারণ মানুষই আচমকা খুনীতে পরিণত হয়, হয়তো আবেগের কারণে।

সব স্বামীই চায় তার স্ত্রী বিশ্বস্ত থাকুক। স্ত্রীও তাই চাইবে। সায়মা হয়তো সেই বিশ্বাস নষ্ট করেছিল, আনমনে ভাবল শওকত, এবং ফাহিমের কাছে সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা করছিল। হতে পারে অন্য কোন ভাবে সেটা জেনে গিয়েছিল ফাহিম, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই তার খেপে যাওয়ার কথা।

বিশ্বাস হারিয়ে গেলে ভালবাসাও পালিয়ে যায়। ঘৃণা জন্ম নেয়। বিতৃষ্ণা আর ক্ষোভ থেকে একসময় প্রতিহিংসা জাগতে পারে, নিতান্ত নিরীহ মানুষও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। হয়তো পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়িটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ফাহিম, কিংবা—কল্পনায় ডুবে গেল সাংবাদিক—গাড়ি চালানোর সময় স্বামীকে খবরটা জানিয়েছিল সায়মা, প্রচণ্ড রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ফাহিম; দুর্ঘটনাটা ঘটে যায়···

হিসেবটা আর এগোল না। স্রেফ কল্পনা করে কোন রহস্যের কিনারা করা যায় না। সায়রার দিকে তাকাতে থমকে গেল শওকত হাসান, বেদনা উপচে পড়ছে মেয়েটির দৃষ্টিতে। *বোকা মেয়ে*, ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছাড়াই ভাবল ও। নিজেও সায়রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে, কারণ সায়রা যে আকর্ষণীয় মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপার নেই সেখানে। প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারটাই পানসে মনে হয় ওর কাছে, এবং তারচেয়েও বোকামি হচ্ছে সেটা প্রকাশ করা! সায়রা রশীদের মত সাধারণ মেয়েদের দু'তিনজনকে সকালের নাস্তার সঙ্গে হজম করে ফেলতে সক্ষম ফাহিম ইমতিয়াজের মত মানুষ!

সায়রার প্রতি করুণা আর সহানুভূতি বোধ করল সে, একইসঙ্গে মেয়েটিকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার ঘোষণা দিল শওকত। সায়রার চোখে স্বস্তি দেখে বুঝতে পারল ঠিক কাজটাই করেছে। আশপাশে প্রায় সবাইকে বিনয়ী দেখাচ্ছে, জাবির মাহমুদকেও, কিন্তু কেউই উৎসাহী হয়ে বিদায় দিতে এল না ওদের। ভিন্ন একটা ভুবনের বাসিন্দা এরা, এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা, তিক্ত মনে ভাবল শওকত, এবং সেই জগতে সায়রা রশীদ বা শওকত হাসানের মত মানুষদের গুরুত্ব নেই—হয়তো

নির্দিষ্ট একটা পর্যায় পর্যন্ত অন্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব, কিন্তু কখনোই এদের একজন হতে পারবে না ওরা।

'ড্রাইভারকে ডেকে দিচ্ছি, পৌঁছে দেবে তোমাদের,' প্রস্তাব করল ফাহিম ইমতিয়াজ।

'দরকার নেই,' দৃঢ় স্বরে আপত্তি করল শওকত। 'ধন্যবাদ। খুব বেশি দূরে তো নয়। একটা ক্যাব ডেকে নেব আমরা।'

'আমার গাড়ি থাকতে ক্যাব নেবে কেন তোমরা?'

'আমি বরং হাঁটব কিছুক্ষণ,' দ্রুত বলল সায়রা। 'যা খেয়েছি, একটু হাত-পা না চালালে বদহজম হবে।' স্মিত হাসল ও, চোখ তুলে ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি এক হলো ওদের···পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি যেন স্থির হয়ে গেছে, স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হলো দু'জন; অন্যরা, এমনকি সায়রার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শওকত হাসানের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে গেল···নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা, চোখ সরাতে পারছে না কেউ···

কেবল এক মুহূর্ত, সায়রা নিশ্চিত হতে পারল না সত্যিই তেমন কিছু ঘটেছে কিনা। 'ধন্যবাদ আপনাকে,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'সুন্দর একটা সন্ধে কাটিয়েছি এখানে।'

শওকত হাসানও সমর্থন করল ওকে। কোটিপতির সঙ্গে হাত মেলাল সে, তারপর এগোল দরজার দিকে। ঘোরের মধ্যে পিছু নিল সায়রা। খানিক পরই নিজেকে বাইরে আবিষ্কার করল, ওর মনে হলো হঠাৎ করেই যেন বেরিয়ে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পাশ ফিরতে শওকত হাসানের চোখে ভর্ৎসনা দেখতে পেল ও।

'আস্ত বেকুব তুমি!' তীক্ষ্ণ স্বরে মন্তব্য করল সাংবাদিক।

'মানে?'

www.Banglapdf.net

'ডুবতে যাচ্ছ তুমি, সায়রা!'

'অসম্ভব! এসব কি বলছেন, শওকত ভাই?'

তিক্ত হাসল শওকত। 'তাহলে ভুল দেখেছি আমি?' শুরু করেও থেমে গেল সে, শেষ ধাপ টপকে পা রাখল লনে। ফ্যাকাসে রাত, কুয়াশার ঘোলাটে চাদর আর শীতল বাতাসের সঙ্গে ধেয়ে আসা নানান ফুলের মিষ্টি সুবাস অভ্যর্থনা জানাল ওদের। 'কথাটা না বলে পারছি না। ভুল করার আগেই সামলে নাও, সায়রা।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকে দেখল সায়রা। 'কিসের কথা বলছেন?'

স্মিত হাসল শওকত হাসান। 'হয়তো তুমি নিজেও জানো না···'

'বুঝেছি,' বাধা দিল ও। 'কিন্তু ভুল করছেন আপনি, শওকত ভাই। কিভাবে সম্ভব সেটা? সত্যি কথা বলতে, ফাহিম ইমতিয়াজকে ভাল করে চিনিই না আমি!'

'তাতে কিছু আসে-যায়? সুদর্শন মানুষ সে, বিত্ত আর ব্যক্তিত্ব থাকলে যা হয়, যে কোন মেয়েই আকৃষ্ট হবে ওর প্রতি। দেখছ না, চৈতী চৌধুরীর মত সুপার মডেলও ওর পিছু লেগে আছে?'

'হতে পারে। কিন্তু আমি চৈতী চৌধুরী নই!' দ্রুত পা ফেলছে সায়রা, মাথা নিচু। যুগপৎ হতাশা আর রাগ অনুভব করছে। 'ভুল করছেন, শওকত ভাই। নিজেকে কি মনে করেন, সবজান্তা? আসলে কিছুই জানেন না! আমাকে এসব বলার অধিকার কি আছে আপনার; যেখানে সারা সন্ধে চৈতী চৌধুরীর পিছু লেগে ছিলেন?'

'স্বীকার করছি ওর প্রতি আগ্রহী আমি। তবে সেটা আমার পেশার খাতিরে।'

'ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ নেই?'

'আছে, তবে সেটা মুখ্য নয়।'

তর্ক করতে পারে সায়রা, কিন্তু লাভ হবে না বলে নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে। খুব কি ভুল বলেছে শওকত হাসান? *কে জানে!* আনমনে ভাবল ও। কিন্তু অন্তর থেকে অনুভব করছে, সারা সন্ধে প্রভা আর ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করেছে ও।

Suvom

পাঁচ

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল সায়রার। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখা ঘড়ির দিকে। ন'টা বেজে গেছে। মড়ার মত ঘুমিয়েছে ও!

পরনের কাপড় গুছিয়ে দরজার দিকে এগোল ও। 'কে?'

'শওকত হাসান।'

দরজা খুলল ও।

'পেশাগত অভ্যাস,' স্মিত হেসে বলল সে। 'লোকজনের ঘরে উঁকি না দিলে ঘুম হারাম হয়ে যায় আমার!'

বিব্রত বোধ করল সায়রা। ও কিছু বলার আগেই আবার মুখ খুলল সাংবাদিক: 'জলদি নিচে চলে এসো, নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'দুঃখিত, শওকত ভাই। একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছি! কোথায় যেন যাওয়ার কথা আমাদের?'

'আগে তো নিচে এসো, তারপর ভেবে দেখা যাবে।'

মিনিট দশ পর নিচে, ডাইনিংরুমে শওকত হাসানের সঙ্গে বসল সায়রা।

'কালকের কথাগুলোর জন্যে দুঃখিত আমি, সায়রা।'

'দূর! ভুলে যান। আমি তো মনে রাখিনি।'

'গুড গার্ল! কি করবে আজ?'

'ভাবছি কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখব, কিছু স্কেচ আঁকব। আপনি কি করবেন?'

'দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে গেছি!' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'বলিনি তোমাকে? জাবির সাহেবের সঙ্গে গল্‌ফ খেলতে যাব। এক সেট ক্লাব জোগাড় করেছে আমার জন্যে। একটু পর তুলে নেবে আমাকে। এয়ারপোর্ট রোডে কোথাও গল্‌ফ-ক্লাবটা।'

'জানতাম না এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে গেছেন আপনারা।'

'জাবির মাহমুদ? আজব এক মানুষ! ধনী মানুষ খেয়ালী হয়, এই প্রথম দেখলাম। যাক্‌গে; সুযোগটা ছাড়তে রাজি নই আমি। এই ফাঁকে ওদের ভেতরকার খবর পেয়ে যাব। তোমার কি মনে হয়, চৌধুরী পরিবারের সবকিছু কি আসলেই ঠিক আছে, ভেতরে ভেতরে কোন গণ্ডগোল নেই?'

'মানে?'

দুই কাঁধ উঁচাল সাংবাদিক। 'নিশ্চিত বলতে পারব না, অনুমান বলতে পারো···দুই ভাই ভাব দেখায় যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে ওদের, কিন্তু সবই লোক-দেখানো। আসলে কেউ কাউকে দেখতে পারে না ওরা। পরিস্থিতি আর গুজবও তাই বলে।'

সায়রাও টের পেয়েছে, কিন্তু স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। 'সব ভাইয়ে-ভাইয়ে কি ভাল সম্পর্ক থাকে? তাছাড়া···ওরা দু'জন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এসবের মধ্যে অন্য কিছু চিন্তা করা উচিত নয় বোধহয়।'

'হয়তো, কিন্তু তারপরও···মনে হচ্ছে সকালটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে।' কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। 'বিকেলে দেখা হবে। আহ্সান মঞ্জিলে যাব আমরা।'

নিজের কামরায় ফিরে এল সায়রা। একটা ছোট্ট ব্যাগে স্কেচ-বুক আর পেন্সিল ভরল, সাথে লাঞ্চের প্যাকেট নিয়েছে—গেস্ট হাউজের কূক দিয়েছে। কাল রাতে বলে দিয়েছিল। পাউরুটি, স্যান্ডউইচ, পনির, সেদ্ধ ডিম এবং একটা আপেল। যথেষ্ট। প্রয়োজনে বাইরে থেকে ড্রিঙ্কস কিনে নিতে পারবে।

ব্যাগ গোছাচ্ছে এসময় নিচে গাড়ির গর্জন কানে এল। শক্তিশালী এঞ্জিন। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ও। কার-পার্কে হলুদ রঙের একটা স্পোর্টস-কার, ঝকঝকে এবং দামী। ড্রাইভারের আসনে বসে আছে জাবির মাহমুদ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ল শওকত হাসান। আরেকবার গর্জে উঠে চলে গেল গাড়িটা।

কাপড় পরার ফাঁকে সারা দিনের সম্ভাব্য কাজগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিল সায়রা। বাসায় ফোন করতে হবে। জরুরী কাজ এটাই। মাঝহার চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বলা যায় না যে কোন সময়ে দরকার হতে পারে ওঁকে।

চুল বাঁধার সময়, আয়নায় সমালোচনার দৃষ্টিতে নিজেকে দেখল সায়রা। আগের দিন ফাহিম ইমতিয়াজের বাহু ধরে ডাইনিংরুমে প্রবেশ করা মেয়েটি তখন আমূল বদলে গেছে। এই মেয়েটি সতর্ক, বাস্তববাদী, ধীর-স্থির এবং চাপা স্বভাবের; কোটিপতিকে নিয়ে ভাবার বিলাসিতা নেই এর, কিংবা মানুষটার দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবও পড়বে না ওর মধ্যে।

আনমনে হাসল ও, নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল মুখ। ফাহিম ইমতিয়াজ ওর বয়স নিয়ে কি যেন বলেছিল? শাড়ি পরলে মেয়েদের বয়স কমে যায়, নাকি বাড়ে? সেদিন বলেছিল আঠারো বছরের তরুণীর মত দেখায় ওকে, কিন্তু আজ কি বলবে? জিন্স, টি-শার্ট আর ওপরে উলের পাতলা সোয়েটার পরেছে। এ অবস্থায় ওকে পনেরো-ষোলো

বছরের কিশোরীর মত লাগার কথা!

যাই দেখাক, একটা ব্যাপার নিশ্চিত: এই পোশাকের কারও দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবে না ফাহিম ইমতিয়াজ।

অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ফাহিম ইমতিয়াজের কথা ভুলে গেল সায়রা। সেটাই স্বাভাবিক। প্রথমেই পুরানো ঢাকায় গেছে। লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা এবং বড় কাটরা ঘুরে-ফিরে দেখেছে। তারা মসজিদটাও বাদ পড়েনি। রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধে মিনিট ত্রিশ কাটিয়েছে ও, তারপর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর হয়ে ধানমন্ডি লেকে চলে এসেছে। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানানসই বিশাল লেক-টাই বেশি চমৎকৃত করেছে ওকে। বাচ্চাদের খেলার জন্যে ছোট্ট দুটো পার্ক আছে কাছে, বসার জন্যে রয়েছে কয়েকটা বেঞ্চি। আর আছে দুটো ফাস্ট ফুডের দোকান।

ঢাকায় এ জিনিসটার অভাব নেই। আনাচে-কানাচে ফাস্ট ফুডের দোকান। কলকাতায় পুরো এক মাইল চক্কর দিলেও বোধহয় একটা ফাস্ট ফুডের দোকান পাওয়া যাবে না। ঢাকার উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের কাছে ফাস্ট ফুড কালচার প্রায় ফ্যাশনের মত হয়ে গেছে, কোন একটা পত্রিকায় পড়েছিল।

নিজের ভেতর এক ধরনের আত্মবিশ্বাস অনুভব করছে ও। এর আগে কখনও একা কোথাও যায়নি। যেখানে ইচ্ছে যাওয়ার কিংবা ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটাই দারুণ স্বস্তিকর। সময় এবং সুযোগটা সত্যিই উপভোগ্য মনে হচ্ছে সায়রার।

লেকের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল ও। কয়েক মানুষ সমান উঁচু গাছগুলো প্রশান্তির ছায়া বিলিয়ে দিয়েছে রাস্তার ওপর, পাতার ফাঁক দিয়ে নিচে নেমে এসেছে উজ্জ্বল রোদ। লেকের পানি ঘন সবুজ, মৃদু বাতাসে ঢেউ খেলছে।

ঢালু পথ ধরে লেকের কিনারে চলে এল সায়রা। সঙ্গে আনা মাদুর বিছিয়ে বসে পড়ল। ক্যান্‌ভাস ব্যাগ থেকে স্কেচ-বুক আর পেন্সিল বের করল এবার। আসার সময় ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে দুটো অরেঞ্জ জুসের ক্যান আর মিনারেল ওয়াটার নিয়ে এসেছে।

একদিনেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে স্কেচ-বুক। বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধের দুটো এবং বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের তিনটে ছবি এঁকেছে। লেকের পাড় ধরে

মিরপুর রোডের দিকে তাকাল ও, জ্যাম বেধে গেছে রাস্তায়। অসংখ্য রিকশা চোখে পড়ছে।

লেকের ওপর ফিরে এল ওর মনোযোগ। পানির কাছাকাছি তৈরি করা মাচায় বসে ছিপ ফেলেছে দুই মৎস শিকারী। ধৈর্য ধরে তাকিয়ে আছে ফানার দিকে। ঠিক পেছনে, কয়েক হাত দূরে বসে আছে দুই তরুণ। চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঠিকানাহীন মানুষ।

এই মানুষগুলোর দুরবস্থার কথা চিন্তা করলে বলা যায় ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কলকাতার ফুটপাতে গভীর রাতের আগে কখনও শোয়ার সুযোগ পায় না সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলো, কিন্তু এখানে দিব্যি দিনের বেলায় পার্কে বা লেকের ধারে-কাছে বিশ্রাম নিচ্ছে এরা।

সংসদ ভবনের একটা ছবি আঁকছে ও এখন। শাপলা আকৃতির মূল ভবনটিকে কোন ভাবেই ছবিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না বোধহয়, আনমনে ভাবল সায়রা, একমাত্র ওপর থেকে দেখার পর সেটা সম্ভব। বিশাল সিঁড়ি, সামনের সবুজ আঙিনার বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তা আর বিন্দু বিন্দু আকারে অসংখ্য মানুষ ফুটে উঠল ওর ছবিতে। সবই অবশ্য কল্পনা।

নিজের ওপর সন্তুষ্ট ও। পাতা উল্টে নতুন একটা স্কেচ আঁকতে শুরু করল। ক্ষণে ক্ষণে জুসের ক্যানে চুমুক দিচ্ছে। নরম লেডের পেন্সিল ব্যবহার করছে ও, মাঝে মধ্যে হাতের চাপে দু'একটা আঁচড় দিচ্ছে। প্রথমে একটা মুখ ফুটে উঠল, প্রায় দুর্বোধ্য বলা যায়–চৌকোণাকৃতির কিন্তু দৃঢ় চোয়াল, ছোট করে ছাঁটা ঘন চুল। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ঘন কালো ভুরুর নিচে একজোড়া চোখ ফুটিয়ে তুলল ও–গভীর চাহনি চোখ দুটোয়, কৌতূহলদ্দীপক। খাড়া একটা নাক এঁকে ফেলল এবার।

মুখটা নিয়ে সমস্যায় পড়ল–কাঠিন্য ছাড়া কিভাবে দৃঢ়তা আনবে, ঔদ্ধত্য ছাড়াও যেমন অবিচল সঙ্কল্প বা আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করা যায়?

জিভের সঙ্গে আঙুলের ডগা মুছে সযত্নে, হালকা ভাবে কাগজে ঘষল ও–মুখের আকৃতির ওপর। ব্যস, একেবারে অবিকল হয়ে গেল! পাতাটা মেলে ধরে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখল সায়রা। একেবারে মন্দ হয়নি, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল ও, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের বোকামির জন্যে হেসে উঠল, স্রেফ আইডেন্টিটি-কিট ছবি বলা যেতে পারে এটাকে।

ঘড়ি দেখল ও। বারোটা। ক্লান্তি লাগছে। সারা দিনে কম হাঁটা হয়নি। স্কেচ-বুক বন্ধ করে জিনিসপত্র গোছাল। কোথায় যাবে এখন? সবার আগে অবশ্য লম্বা একটা গোসল দিতে পারলে ভাল লাগত, চিন্তাটাই পুলকিত করছে ওকে। গেস্ট হাউজে ফিরে যাওয়া যাক। হেঁটে মোড় পর্যন্ত যেতে হবে, ওখান থেকে কোন ক্যাব বা রিকশা পেয়ে যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। তারপর ঢাল ধরে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল। মাছ শিকারীরা কখন চলে গেছে টের পায়নি। তরুণরাও উধাও হয়ে গেছে। রাস্তার কাছে গাছের ছায়ায় দিবানিদ্রায় ব্যস্ত দুই রিকশাঅলা। ঘাসের ওপর গদি বিছিয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছে লোকগুলো। দূরের ছোট্ট পার্কে এখনও খেলছে বাচ্চারা।

রাস্তায় উঠে এল ও। হুশ-হাশ করে চলে যাচ্ছে গাড়িগুলো। রিকশা চলছে কম, এবং কোনটাই খালি নেই। হাঁটতে ভালই লাগছে ওর। ফুটপাতের ওপর গাছের ছায়া থাকায় রোদে পুড়তে হচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজ পেরিয়ে এল, ওপাশে আসার পর এই প্রথম খেয়াল করল ফাহিম ইমতিয়াজের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। মুহূর্তে ইচ্ছে হলো ঢুকে পড়ে খোলা গেট দিয়ে, প্রভার সঙ্গে দেখা হবে তাহলে! কিন্তু মত বদলে মোড়ের দিকে এগোল ও। পঞ্চাশ গজ দূরে খালি একটা ক্যাব দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার নেই অবশ্য, ছোট একটা দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে ধূসর রঙের ড্রেস পরা ড্রাইভার। চা খাচ্ছে।

'সায়রা?'

থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল ও। হাস্না রহমান। ডানে পার্কের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছেন।

'বাসায় যাচ্ছ নাকি? ফ্ল্যাটে কিন্তু কেউ নেই। শনিবারে আমার ছুটি থাকে। আর ফাহিমও প্রভাকে নিয়ে বেরোয়। ওই তো, পার্কে আছে প্রভার সঙ্গে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সায়রা। পার্কের কোণে জারুল গাছের ছায়ার নিচে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে এক লোক। চেহারাটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না এতদূর থেকে, কিংবা খেলতে থাকা বাচ্চাদের থেকে প্রভাকেও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

'তাই?' বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল সায়রা, ভাবেনি মেয়ের জন্যে দিনের কিছু ব্যস্ত সময় ব্যয় করবে সে।

'হ্যাঁ। প্রতি শনিবার সকালে প্রভাকে নিয়ে বেরোয় ও।'

'কোথাও যাচ্ছেন?'

'মিরপুরে আমার ছেলে থাকে। একটা দিন ওর বাসায় কাটিয়ে দেই। ওর বাচ্চাদের সঙ্গে থাকতে ভালই লাগে।'

সায়রা জানতে চাইল না কেন ছেলের সঙ্গে না থেকে বরং একটা চাকুরী করছে মহিলা। অনধিকার চর্চা হবে। 'কখন ফিরবেন?'

'সন্ধের দিকে।'

হাতছানি দিয়ে একটা বেবীটেক্সী ডাকলেন হাম্না রহমান। ভাড়া ঠিক করে ফিরলেন ওর দিকে। 'বাসায় চলে যাচ্ছ? প্রভার সঙ্গে দেখা করবে না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

বেবীটেক্সীতে উঠে পড়লেন হাম্না রহমান। টেক্সী চলে যেতে পার্কের দিকে ফিরল সায়রা। খানিকটা হলেও দ্বিধা বোধ করছে। প্রভার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গেও দেখা হবে। সেটা কি ঠিক হচ্ছে?

কেন নয়? ঢাকায় হয়তো আর দু'তিন দিন থাকবে ও। প্রভার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ছোট্ট মেয়েটি জায়গা করে নিয়েছে ওর হৃদয়ে, গভীর মমতা আর ভালবাসা অনুভব করছে ও...

ক্লান্তি বা দ্বিধা, সবই চলে গেল। পার্কের গেটের দিকে এগোল সায়রা। মোট চারটে বাচ্চা খেলছে, সবার সঙ্গেই মা-বাবা বা কেউ না কেউ আছে। বেঞ্চে একাই বসে আছে ফাহিম ইমতিয়াজ, পা-র ওপর পা তুলে আয়েশ করে বসেছে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে।

আবারও মানুষটাকে নিঃসঙ্গ মনে হলো সায়রার। জানে বোকার মত চিন্তা করছে, কিন্তু ধারণাটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না। একজন বিধবার চেয়ে বিপত্নীক যে কোন পুরুষই বেশি নিঃসঙ্গ, সে যদি ফাহিম ইমতিয়াজের মত বিত্তের অধিকারীও হয়, কিংবা স্বেচ্ছায় যদি এমন জীবন বেছে নেয়, তবুও।

কাঁধের ওপর ব্যাগটা জুত করে বসিয়ে নিল ও, তারপর দ্রুত পায়ে

পার্কে ঢুকে পড়ল। ফাহিম ইমতিয়াজের পাশে এসে দাঁড়াল, ওর উপস্থিতি টের পায়নি সে। 'স্লামালেকুম!' উৎফুল্ল স্বরে বলল ও, মানুষটা চমকে যাবে ভেবে আনন্দ পাচ্ছে।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে। 'ওহ্, তুমি! এত তাড়াতাড়ি খবর পেলে কিভাবে?'

'খবর?' এবার সায়রার বিস্মিত হওয়ার পালা।

'বোসো,' খানিক সরে বসল সে, জায়গা ছেড়ে দিল সায়রাকে। 'আমার মেসেজ পাওনি বোধহয়?'

'না। হাম্না খালার সঙ্গে দেখা হলো, ওঁর কাছেই শুনলাম এখানে আছে প্রভা।'

'গেস্ট হাউজে ফোন করেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল সে। 'ততক্ষণে অবশ্য বেরিয়ে গেছ তুমি। তোমাকে দেয়ার জন্যে একটা মেসেজ দিলাম ওদের: দুপুর একটা পর্যন্ত বাসার উল্টোদিকের পার্কে থাকব। সন্ধের পর বাসায় ফিরব আবার।'

'কিন্তু গেস্ট হাউজের নম্বর পেলেন কোত্থেকে?' অজান্তে খুশি হয়ে উঠল সায়রা। *তারমানে···ওর সঙ্গ কামনা করছে সে!*

'খুব কঠিন কাজ সেটা?' ভুরু কুঁচকে বলল ফাহিম। 'ড্রাইভারের কাছ থেকে গেস্ট হাউজের নাম আর ডিরেক্টরি ঘেঁটে ফোন নম্বর জেনে নিয়েছি। সন্তুষ্ট?' এবার স্মিত হাসল সে, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

নীরবে কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না সায়রা। এদিকে ফাহিম ইমতিয়াজও নিশ্চুপ, সম্ভবত নীরবতাই উপভোগ করছে সে।

প্রভাই উদ্ধার করল ওকে। খেলার ফাঁকে খেয়াল করেছে ওকে, দেখেই ছুটে এল। সরাসরি ওর কোলে এসে বসল, গলা জড়িয়ে ধরল। সায়রার মুখ নামিয়ে গালে চুমো খেল। 'সিনডারেলা আন্নি! কেমন আছ?' টেনে টেনে, মিষ্টি সুরে জানতে চাইল প্রভা।

প্রভার গভীর উচ্ছ্বাসে পুলকিত সায়রা। প্রবল মমতায় চুমো খেল ছোট্ট মেয়েটিকে। 'ছোট্ট পুতুল! তুমি কেমন আছ?'

'ভাল। কখন এসেছ?'

'এই তো।'

'চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম আমরা।'

'তাই? কেমন লাগল? কি দেখলে?'

'ওহ্, দারুণ! সিংহ, বাঘ, হরিণ, উট, কুমীর…'

তালিকাটা যেন শেষ হওয়ার নয়, হাসতে হাসতে পাশ ফিরে ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে তাকাল সায়রা। স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সে। হাসছে না, বরং গম্ভীর দেখাচ্ছে। অনুসন্ধানী এক জোড়া চোখ! মেয়ে আর শ্যালিকার উচ্ছ্বাসের মধ্যে কি যেন খুঁজছে সে…

'কি জন্যে খোঁজ করেছেন আমাকে?' অস্বস্তি ভরা স্বরে জানতে চাইল ও।

'জরুরী বা বিশেষ কোন কারণ নেই। ভাবছিলাম আজ কি করবে তুমি। …সাংবাদিক সাহেব কোথায়?'

প্রশ্নটা এত আচমকা এসেছে যে ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল সায়রা। 'আপনার ভাইয়ের সঙ্গে গল্‌ফ খেলছে,' শেষে বলল ও, খেয়াল করল ভুরু কুঁচকে গেছে ফাহিম ইমতিয়াজের। 'সম্ভবত গতকালই দাওয়াত দিয়েছে শওকত ভাইকে। নতুন একটা স্পোর্টস-কার নিয়ে গেস্ট হাউজে এসেছিল, শওকত ভাইকে তুলে নিয়েছে।'

কোঁচকানো ভুরু ফিরে গেল যথাস্থানে। 'এসব ব্যাপারে জাবিরের আগ্রহ প্রায় অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে,' নিরুত্তাপ স্বরে মন্তব্য করল সে, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি, ব্যঙ্গ নাকি বিদ্রূপ প্রকাশ করছে বোঝা গেল না। 'গাড়ি এবং মেয়ে–দু'দিকেই সমান দুর্বলতা আছে ওর।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল সায়রা, কোন মন্তব্য করল না। ফাহিম ইমতিয়াজের মুখের রেখাগুলো সহজ হয়ে আসায় স্বস্তি বোধ করছে। ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করে আসলেই দুই ভাইয়ে কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা, কিন্তু চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। অনধিকার চর্চা হবে। দু'জনের কেউই সেটা পছন্দ করবে না।

'আন্নি, আমাদের সঙ্গে যাবে তো?' প্রভার প্রশ্নে মনোযোগ সরে গেল সায়রার। 'বিকেলে ফ্যান্টাসি কিংডমে যাব আমরা!'

'আমার যে কাজ আছে, সোনামণি!'

'তাহলে…বাসায় চলো!'

'হ্যাঁ,' তৎক্ষণাৎ একমত হলো ফাহিম। 'প্রভা, আন্টিকে লাঞ্চের দাওয়াত দাও। বাইরে কোথাও লাঞ্চ করব আমরা।'

'উঁহুঁ, আজ নয়…অন্য কোন দিন।'

'কবীর সাহেবকে বলেছ তুমি নাকি আঁকতে শেখাও ছেলে-

মেয়েদের? আমি কি স্কেচ-বুকটা দেখতে পারি?'

দ্বিধা করল সায়রা, বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। 'আহামরি কিছু নয়। ছেলে-মেয়েদের শেখাতে বড় আঁকিয়ে হওয়ার দরকার হয় না।'

'তারমানে···দেখতে দেবে না?'

'নিশ্চই!' পাশে রাখা স্কেচ-বুকের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

ক্যানভাস ব্যাগ থেকে স্কেচ-বুকের কিছু অংশ বেরিয়ে আছে। সাগ্রহে ওটা তুলে নিল ফাহিম ইমতিয়াজ, প্রথম থেকে দেখা শুরু করল। পাতা উল্টাল সে, তারা মসজিদ আর লালবাগ কেল্লার চারটে স্কেচে চোখ বুলাল।

পরের তিনটে স্কেচই প্রভার। সময় নিয়ে, আগ্রহ ভরে দেখছে ফাহিম; এবং পরেরটা···তৎক্ষণাৎ সায়রার মনে পড়ল পুরানো ঢাকা থেকে ক্যাবে ফেরার পথে দ্রুত হাতে স্কেচটা এঁকেছিল···ফাহিম ইমতিয়াজের। শুধু তাই নয়, একটু আগে লেকের পাড়ে বসে আরেকটা এঁকেছে!

ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই। প্রভার দিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেও পারছে না, বারবার ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি। নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে, মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়াল সায়রা, তারপর প্রভাকে নিয়ে হেঁটে সরে এল কিছু দূর।

'বাসায় যাবে না?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল প্রভা।

'হ্যাঁ, নিশ্চই যাব।'

'তাহলে চলো!'

'হ্যাঁ, যাব, সোনা।'

পেছনে, নীরব আগ্রহ আর বিস্ময় নিয়ে স্কেচগুলো দেখছে ফাহিম ইমতিয়াজ। রঙ দেয়া হয়নি কোনটায়, কিংবা চূড়ান্ত আঁচড় বা ছোপও দেয়া হয়নি; দ্রুত কিন্তু চৌকস হাতে আঁকা হয়েছে। তারপরও প্রতিটি ছবিই জীবন্ত মনে হচ্ছে। স্মৃতিসৌধের স্কেচের মার্বেল বা পাথরগুলো দেখে মনে হচ্ছে স্পর্শ করা যাবে। মেয়েটির প্রতিভা দেখে সন্তুষ্ট বোধ করছে সে, এবং কিছুটা বিস্মিতও। শেষ স্কেচটিতে চোখ পড়তে থমকে গেল ফাহিম, সেকেন্ড কয়েক বেশি সময় লাগল বুঝতে যে আসলে এটা ওরই ছবি। এমন নয় যে ছবির সঙ্গে ওর চেহারার মিল নেই, আসলে এ ধরনের প্রতিকৃতি দেখতে অভ্যস্ত নয় মানুষ। ওর ছবি

আঁকার কারণটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেল ফাহিম। স্রেফ শৈল্পিক প্রবৃত্তি থেকে, নাকি···?

নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। যে এঁকেছে, আঁকার সময় তার মনে কি ছিল, কেবল সে-ই বলতে পারবে। বিষয়টাকে খুব একটা গুরুত্ব দিল না ফাহিম। বোধহয় তাতে কিছু যায়-আসেও না তেমন। স্কেচ-বুক বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ও, দেখল প্রভা আর সায়রা দু'জনেই ফিরে তাকিয়েছে ওর দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মেয়েটি, এক ধরনের নিস্পৃহতা দেখা যাচ্ছে চোখের গভীরে, যেন আশঙ্কা করছে শেষ স্কেচটি সম্পর্কে মন্তব্য করবে ও। কিন্তু সযত্নে স্কেচের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল ফাহিম। এগিয়ে এসে প্রভার হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

'কোথায় যাব আমরা এখন, প্রভা সোনা?'

'কেন, বাড়ি যাব!'

'বাইরে লাঞ্চ করার কথা ছিল আমাদের।'

'কিন্তু আন্নি যে যেতে চাইছে না!'

'তাহলে যাব না। কাউকে জোর করা ঠিক না।'

'আন্নি যাবে না আমাদের সঙ্গে?'

'নিশ্চই!'

নীরবে বাপ-মেয়ের আলাপ শুনছে সায়রা। বেঞ্চের ওপর রাখা ব্যাগ তুলে নিল। টের পেল ওর একটা হাত চেপে ধরেছে প্রভা।

'যাবে না, আন্নি?' করুণ স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল সায়রা, এদিকে ওর হাত ধরে ক্রমাগত ঝাঁকাচ্ছে প্রভা। মায়া ভরা চোখ দুটো দেখে সমস্ত দ্বিধা চলে গেল। একটু আগেও ক্লান্তি লাগছিল ওর, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটির নীরব মিনতিতে সবই ঘুচে গেছে।

ওভাবেই হাত ধরাধরি করে এগোল ওরা। মাঝখানে হাঁটছে প্রভা, দু'হাতে ধরে আছে ফাহিম আর সায়রার হাত। বাসাটা খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে। অনর্গল কথা বলছে প্রভা, মাঝে মধ্যে ওর উদ্দেশে স্মিত হাসছে অন্য দু'জন।

বাসায় এসে নার্সারিতে চলে গেল প্রভা। গতকাল জাবির মাহমুদ ছাড়াও অন্য অতিথিরা গিফট নিয়ে এসেছিল, সেগুলো দেখাতে চাইছে সায়রাকে। মিনিট কয়েকের জন্যে একা হয়ে গেল ওরা।

সায়রার একটা কব্জি চেপে ধরল ফাহিম। চমকে তাকাল দেখল জানালার দিকে ওকে আকর্ষণ করছে সে। জানালার কাছে এসে নিচে লনের দিকে তাকাল, কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজের দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর মুখে। 'সত্যিই তোমার বয়স চব্বিশ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। বিশ্বাস না হলে আমার পাসপোর্ট দেখতে পারেন।'

'বিশ্বাস করছি। কারও তারুণ্য চুরি করার অভিযোগ ঘাড়ে নিতে রাজি নই আমি!' সায়রার বিব্রত হাসির উত্তরে স্মিত হাসল সে, তারপর অপ্রাসঙ্গিক সুরে বলল, 'আমার ধারণা, তুমি আসলে জাদু-টাদু জানো···তোমার চোখ, কালো চুল···' আচমকা থেমে গেল সে, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'সত্যিই কি গতকাল এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমাকে দেখার পর মনে হচ্ছে আজীবনই যেন তোমাকে চিনি আমি!' সায়রার হাতটা ছেড়ে দিল ফাহিম ইমতিয়াজ, কিন্তু পরমুহূর্তে আলতো ভাবে আঙুল দিয়ে ওর মুখ স্পর্শ করল।

সন্ত্রস্ত লজ্জাবতী পাতার মত গুটিয়ে গেল সায়রা, কি এক অস্বস্তি ভর করছে সারা দেহে। ধীর পায়ে সরে গেল ও, যেন ভয় পেয়েছে পরের মুহূর্তে ওকে জড়িয়ে ধরবে সে।

'সবক'টা নিয়ে এসেছি!' প্রভার উচ্ছল কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেল ওরা। মেয়েটির দু'হাতে রাজ্যের খেলনা, যে ক'টা পেরেছে তুলে এনেছে। ক্ষীণ হেসে মেয়ের দিকে এগোল ফাহিম।

তিনজনে মিলে লাঞ্চ করল ওরা। রান্না করে গেছেন হাস্না রহমান। সাধারণ খাবার। মাছের ভর্তা, সব্জি, মুরগীর মাংস আর ছোট মাছ। অন্যদিন নিজের হাতে খায় প্রভা, কিন্তু আজ "আন্নি"কে পেয়ে যেন ভুলেই গেছে কিভাবে খেতে হয়। সায়রাই খাইয়ে দিল ওকে।

প্রভাকে নিয়ে ওর কামরায় এল সায়রা। শোয়ার পরপরই গল্প শোনার আব্দার জুড়ল মেয়েটা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওকে, বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে প্রায়।

কিন্তু গল্প শোনাটা স্রেফ উপলক্ষ মাত্র, আসলে ওর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চাইছে মেয়েটা। ক্ষণিকের জন্যেও ছাড়ল না ওকে, মাঝে মধ্যে মুখ তুলে তাকাচ্ছে, নীরবে চুমো খাচ্ছে কিংবা নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে ওকে; ছোট্ট মাথায় কি চিন্তা চলছে সেটা ধরতে পেরে শিউরে উঠল সায়রা।

পরমুহূর্তে মমতা আর বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠল ওর হৃদয়। মা-হারানো মেয়েটি ঘোরের মধ্যে ওকেই মা বলে ভুল করছে, প্রশান্তি পেতে চাইছে! হয়তো ওর সঙ্গে সায়মার চেহারার কিছুটা মিল আছে বলেই···

ঘুমিয়ে পড়ল প্রভা। কিছুক্ষণ পর নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল সায়রা, কিন্তু মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। নিজের ভেতর অদ্ভুত এক অনীহা বোধ করছে। ঘণ্টা দুয়েক পরে গেস্ট হাউজে ফিরলে এমন কি যাবে-আসবে?

সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বিছানায় ফিরে এল সায়রা। প্রভার পাশে শুয়ে চুমো খেল ওকে, তারপর বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল মেয়েটিকে। ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল প্রভা, ওর বুকের সঙ্গে গুটিয়ে এল। চরম বিস্ময় নিয়ে দেখল ওর শরীরের ঘ্রাণ নিচ্ছে মেয়েটি, ঘুমের মধ্যে হেসে উঠল–স্বর্গীয় হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'জাদু আমি জানি না,' ফিসফিস করে স্বগতোক্তি করল সায়রা। 'জাদু জানে এই পিচ্চি পুতুলটা! কিভাবে ওকে ছেড়ে যাব আমি?'

অদৃশ্য এবং দৃঢ় একটা বন্ধন অনুভব করছে ও–অন্তস্তলে, যার গভীরতা অনেক ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী, কোন ভাবেই সেটাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

'গেস্ট হাউজে ফিরবে?' কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে জানতে চাইল ফাহিম ইমতিয়াজ। বাইরে শীতের বিকেল গড়াচ্ছে। মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে ব্যালকনিতে। রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনের একটা চেয়ারে বসে আছে সায়রা।

'হ্যাঁ।'

'আমি বোধহয় তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

'মোটেই না! প্রভার সঙ্গে সময়টা সত্যি দারুণ কেটেছে।' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ও। সত্যিই তাই। প্রভার পাশে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেও জানে না, ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে একটু আগে। প্রভা ঘুমাচ্ছে এখনও।

'চলো, পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে। সন্ধেয় চৈতীদের বাসায় যেতে হবে।'

কি এক প্রশান্তি আর ভাল লাগা সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে, অস্বীকার করতে পারবে না। এমনকি নিচে এসে গাড়িতে ফাহিম ইমতিয়াজের পাশে বসেও সেটা অনুভব করতে পারল। সুখী মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

'চৈতী চৌধুরীকে বোধহয় বিয়ে করবেন আপনি?' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে ক্ষণিকের জন্যে ওর দিকে তাকাল সে। 'চৈতী সুন্দরী মেয়ে ঠিকই, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্কও আছে, কিন্তু হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপার নেই।'

সায়রার কাছে মনে হলো একটা শব্দ বোধহয় বাদ পড়ে গেছে, ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেছে সে: *এখন*। 'কোন একসময় ছিল?'

'হ্যাঁ এবং না–দুটো উত্তর হতে পারে।'

'মানে?'

'একটা সম্পর্ক হতে যাচ্ছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোয়নি। তবে ওর পক্ষ থেকে বোধহয় চেষ্টার ত্রুটি নেই। চৈতী আসলে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজের ক্যারিয়ারের জন্যে আমাকে ব্যবহার করতে চাইছে ও, সম্পর্কটা স্রেফ উপলক্ষ বা একটা উপায়।

'ও এমন মেয়ে, কারও সঙ্গেই বোধহয় সত্যিকার হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি হবে না কখনও। মেয়ে-মাকড়সার কথা জানো তো, সঙ্গীকেই খেয়ে ফেলে? চৈতী আসলে সেরকম মেয়ে।' হেসে উঠল ফাহিম ইমতিয়াজ, বিস্ময় নিয়ে তার হাসি দেখছে সায়রা। মানুষটাকে প্রাণবন্ত, আন্তরিক দেখাচ্ছে। এই প্রথম এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাকে হাসতে দেখছে। 'হয়তো ওর ফাঁদে পড়ে যেতাম, কিন্তু আগেই এ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে ফেলেছি বলে সতর্ক। দুঃখজনক এবং তিক্ত হলেও সত্যি, অভিজ্ঞতাটা আমাকে দিয়েছে তোমার বোন।' হাসিটা প্রায় তৎক্ষণাৎ ম্লান হয়ে গেল। 'মজার ব্যাপার কি জানো? এরা দু'জন প্রায় একই ধরনের। অথচ দু'জনের সম্পর্ক ছিল একেবারে সাপে-নেউলে। ভদ্রতা বা সামাজিক কোন সমস্যা না থাকলে বোধহয় একজন আরেকজনের চোখ উপড়ে ফেলত!'

'কিন্তু নিজের বোনকে এভাবে চিনতাম না আমি, অন্তত চৈতী চৌধুরীর মত!' খানিকটা উষ্মা প্রকাশ পেল সায়রার স্বরে।

স্মিত হাসল ফাহিম। 'সায়মার হয়ে সাফাই গাইতে হবে না।

আমার মনে হয় না ওকে খুব ভাল করে চিনতে তুমি।'

'কেন চিনব না? অদ্ভুত কথা বলছেন! ও কি আমার বোন ছিল না?'

'সায়মা আমার স্ত্রী ছিল,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'এবং নিশ্চিত বলতে পারি, ওকে দেখতে যতটা শান্ত, সুবোধ মেয়ে বলে মনে হত, ততটা ছিল না ও।'

গেস্ট হাউজের কার-পার্কে থেমেছে গাড়ি। কিছু বলতে গিয়ে মুখ খুলেছিল সায়রা, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ওর মুখে একটা আঙুল চেপে ধরেছে ফাহিম। 'উঁহুঁ, তর্ক করবে না! বাচ্চা মেয়েদের মত দেখাচ্ছে এখন তোমাকে!'

সায়রার মনে হলো ঠোঁট পুড়ে যাচ্ছে ওর, ঝটিতি মুখ সরিয়ে নিল। 'আমাকে যদি এতটাই নাবালিকা ভাবেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি, নিজের অমূল্য সময় আমার পেছনে অযথাই নষ্ট করছেন!'

চোখ সরু করে তাকাল ফাহিম ইমতিয়াজ। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এপাশে এসে সায়রার জন্যে দরজা মেলে ধরল। 'সকাল সাতটায় ফোন করব তোমাকে,' প্রায় নির্দেশের মত শোনাল কথাগুলো। 'সিয়াও ক্যারা মিয়া!'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সায়রা। 'মানে?'

'বুঝবে না তুমি,' এক চিলতে রহস্যময় হাসি ঝুলছে তার ঠোঁটের কোণে।

'যদি নাই বুঝব, তাহলে বললেন কেন?'

'বলব। আগামীকাল।'

ওপরে এসে গোসল করল সায়রা। চা-র কাপ হাতে বারান্দায় এসে বসেছে, এসময় নক্ হলো দরজায়। খানিকটা বিরক্তি অনুভব করল ও। যেহেতু জানে কে হতে পারে, দরজা খোলার সময় বিরক্তি বা অসন্তোষ থাকল না ওর মুখে। শওকত হাসানকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মোটেই অবাক হলো না।

'ভেতরে আসব? কয়েকটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

'আসুন।'

দরজা খোলা রেখেই ভেতরে এসে বসল সে।

'খেলা কেমন হলো?'

'গ্রেট!' আনমনে মাথা নাড়ল সাংবাদিক। 'জাবির মাহমুদকে যত

দেখছি ততই অভিভূত হচ্ছি! কিভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, জানে বটে লোকটা! কেউ যে এত টাকা খরচ করতে পারে, ওকে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাসই করতাম না! কি নেই ওর–বিত্ত, ক্ষমতা, সম্মান? শো-বিজনেসে এমন কোন মেয়ে নেই যার সঙ্গে খাতির নেই ওর, এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি ওর নিমন্ত্রণ পেলে কৃতার্থ হবে এদের যে কেউ!'

'তাই?' খানিকটা নিরুত্তাপ স্বরে বিড়বিড় করল সায়রা।

'জানো, কাকে পার্টনার হিসেবে নিয়ে এসেছে ও? চৈতী চৌধুরী। দেখে মনে হলো যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ওরা। ভাবছি দু'জনের সম্পর্ক জানতে পারলে ওর বড় ভাই কি করবে!'

'কিছুই করবে না, আমার তো ধারণা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেবে না ফাহিম ইমতিয়াজ।'

'মনে হয় না। ফাহিম ইমতিয়াজ এমন মানুষ নয় যে হবু স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে মিশতে দেখলে মুখ বুজে সহ্য করবে, হোক না ভাই।'

শুধুই গুজব, ভাবল সায়রা, *চৈতী চৌধুরীকে বিয়ে করতে বয়েই গেছে ফাহিম ইমতিয়াজের!* তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল বিয়ে সম্পর্কিত ওর প্রশ্নটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেও সুপার মডেলের সঙ্গে বিয়েতে স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেছে সে। এটাও উত্তর হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত করে কি কিছু বলা যায়?

'জিতলেন না হারলেন?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল ও।

'ওরাই জিতেছে। কিন্তু খেলা নিয়ে আলাপ করার জন্যে আসিনি আমি, কিংবা সেজন্যেও এত কথা বলছি না। ব্যাপার হচ্ছে, ক্লাবে লাঞ্চ করার পর, মেয়েদের বিদায় করে দিয়ে জাবির মাহমুদের সঙ্গে একান্তে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে আমার। ফাহিম ইমতিয়াজ আর তোমার বোন সম্পর্কে...'

'তাই?' কিছুটা হলেও উদ্বেগ বোধ করছে সায়রা।

'সব শুনে মনে হচ্ছে, সায়মাকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জানত জাবির মাহমুদ। দু'জনের সম্পর্কটা স্রেফ বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি ছিল। যদ্দূর শুনেছি, ফাহিম ইমতিয়াজের ইচ্ছেমত সাদাসিধে দাম্পত্য জীবন বেছে নেয়নি সায়মা–বাচ্চা সামলানো, ঘরকন্নার কাজ করা...শুধু এসবে সন্তুষ্ট ছিল না ও। ব্যবসার কাজে বেশিরভাগ সময়ই বিদেশে বা ঢাকার বাইরে থাকত ফাহিম ইমতিয়াজ, স্বাভাবিক ভাবেই একঘেয়েমিতে

ভুগতে শুরু করে সায়মা। বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ঢাকার ব্যবসা দেখাশোনা করত তখন জাবির, প্রায়ই ওর সঙ্গে কথা হত সায়মার।

'সায়মা অভিযোগ করত, ব্যক্তি জীবনে ফাহিম ইমতিয়াজ দারুণ ঈর্ষাকাতর মানুষ। সবসময়ই সন্দেহ করত সায়মাকে, ওর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে কথা বলতে দেখলেই খেপে যেত। এ নিয়ে বহুবার ঝগড়া করেছে দু'জনে। রাস্তায় কোন যুবক যদি সায়মার দিকে তাকাত, সেটাও বাঁকা চোখে দেখত সে। সায়মা সুন্দরী ছিল, যে কোন পুরুষ ওর দিকে তাকাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সাংবাদিকের দিকে তাকাল সায়রা। 'আপনার সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি না, শওকত ভাই। সায়মা হয়তো অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা ছিল, কিন্তু স্বামীর অমতে এসব করার কথা নয় ওর। কোন মেয়েই এতটা সাহস করবে না···তাছাড়া ওর যা স্বভাব, চাহিদাও ছিল সেরকম–ফাহিম ইমতিয়াজের বিত্ত, ক্ষমতা বা নিরাপত্তা···সবই দরকার ছিল ওর। তাছাড়া, আমার ধারণা, শুধু এসব পাওয়ার জন্যে ফাহিম ইমতিয়াজকে বিয়ে করেনি ও।'

বিদ্রূপ মেশানো হাসি ঝুলছে শওকত হাসানের ঠোঁটে। 'তাহলে তোমার ধারণা প্রেমে পাগল হয়ে ফাহিম ইমতিয়াজকে বিয়ে করেছিল সায়মা? ভুল! শুনে হয়তো দুঃখ পাবে তুমি, কিন্তু না বলেও উপায় নেই···সায়মা সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে স্পষ্ট বুঝেছি কোন সময়েই কাউকে সত্যিকার ভাবে ভালবাসেনি ও। হয়তো শুধু নিজেকেই ভালবাসত। জীবন সম্পর্কে কতটা জানো তুমি, সায়রা? মানুষের জীবনের সবচেয়ে জঘন্য পাপগুলোই চাপা থাকে, কথাটা শুনেছ কখনও?'

'বুঝেছি! হয়তো একটু পর বলবেন···হ্যাঁ, সেদিকেই ইঙ্গিত করছেন–অবৈধ কোন সম্পর্ক ছিল সায়মার, পরকীয়া? এবং সেটা জানতে পেরেই ওকে খুন করেছে ফাহিম ইমতিয়াজ?'

'খুনোখুনির ব্যাপারটা তর্ক এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারটা আসলেই বাস্তব। নির্জলা সত্য। জাবির মাহমুদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সায়মার, এবং সেটা জেনে ফেলে ফাহিম ইমতিয়াজ। কল্পনা করো, ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক আছে জানতে পারলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার? চিঠিটা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করলেও আসলে কোন ভালবাসা ছিল না ওদের মধ্যে।'

চরম বিরক্তি আর অসন্তোষে ফেটে পড়ল সায়রা। 'এসব কি বলছেন, শওকত ভাই? চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ফাহিম ইমতিয়াজকে সবকিছু খুলে বলতে চাইছিল সায়মা, কিন্তু দ্বিধাও কাটাতে পারছিল না। সেটা যদি পরকীয়া প্রেমই হয়ে থাকে, বোকার মত কেন স্বীকার করবে ও?'

'এমনও হতে পারে, সায়মা হয়তো ভেবেছিল আগে-পরে ফাহিম ইমতিয়াজ ঠিকই জেনে যাবে, অন্য কোন ভাবে। তারচেয়ে নিজে বলে দিলেই কি পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয় না? .তামাকে চিঠিটা লিখেছিল ও দারুণ ভয় আর আশঙ্কা নিয়ে, বুঝতে পারছিল শুনেই খেপে যাবে ফাহিম ইমতিয়াজ। এ থেকেই বোঝা যায় কেমন মানুষ সে!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আসলে আজগুবি কল্পনা করছেন আপনি। সায়মাকে খুন করেনি ফাহিম ইমতিয়াজ, বরং স্রেফ দুর্ঘটনার কারণে মারা গেছে ও। ফাহিম ইমতিয়াজ একজন নিপাট ভদ্রলোক, ওভাবে নিজের স্ত্রীকে খুন করার মত বিকৃত মানসিকতা বা রুচি নেই তার, এটা নিশ্চিত বলতে পারি। তেমন বদমেজাজ বা বিদ্বেষও নেই। আজই সায়মার ব্যাপারে কথা হলো, সায়মাকে যদি সত্যিই খুন করত, তাহলে এ নিয়ে কথা বলত না সে কিংবা ঘরে পোর্ট্রেট টানিয়ে রাখত না।'

'নিশ্চই! সবাই যাতে উল্টোটা বিশ্বাস করে, এজন্যেই এসব করেছে সে। তুমি যেমন করছ।'

বিস্ময়ে কথা জোগাল না সায়রার মুখে। 'মাফ করবেন, শওকত ভাই, এ নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না আমার। যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু দয়া করে আপনার আজগুবি গল্প আমাকে শোনাতে আসবেন না!'

'ধরো, সত্যিই তোমার বোনকে খুন করেছে সে···সেক্ষেত্রে তুমি কি চাও না উচিত সাজা হোক তার?'

'যেহেতু ওই জঘন্য কাজটা সে করেনি, সুতরাং সাজা পাওয়ার প্রশ্নও অবান্তর। প্লীজ, শওকত ভাই! আর একটা কথাও শুনতে চাই না আমি। আপনি দয়া করে যান।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শওকত হাসান, মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, অবুঝ এক কিশোরীকে বোঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে যেন, করুণার সঙ্গে দেখল ওকে, তারপর ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'আমি প্রমাণ করে ছাড়ব, সায়রা!' বিড়বিড় করে বলল সে, সারা

ঘরে অনেকক্ষণ ধরে ভেসে বেড়াল কথাটা। অস্থির সায়রাকে আরও অস্থির, অধৈর্য, শঙ্কিত করে তুলল শওকত হাসানের শপথ।

ছয়

পাঁচদিন পর। শুক্রবার।

ঘুম থেকে উঠেই আবহাওয়ার পরিবর্তন টের পেল সায়রা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে কামরায়। শীত শীত লাগছে।

জানালার পাল্লা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল ও, গায়ের ওপর একটা কাঁথা টেনে নিল। শুয়ে থেকে মেঘে ভারী হয়ে থাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মন খারাপ করে দেওয়ার মত আবহাওয়া; কিন্তু বিষণ্ন বোধ করছে না ও, বরং শুয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। বহুদিন এভাবে আলসেমি নিয়ে কোন সকাল কাটায়নি। মাঝে মধ্যে স্রেফ নীরস অবসরও আনন্দময় হতে পারে।

শওকত হাসানের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। সায়মার মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সাংবাদিক, অথচ ও নিজে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। সত্যিই কি এতটা উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল সায়মা, জাবিরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল ওর?

গতকালও ধারণা ছিল বোনকে ঠিকই চিনত ও, এবং নিশ্চিত ছিল এ ধরনের ভুল করতে পারে না সায়মা। নেহাত নির্বোধ মেয়েরাই এমন ভুল করে। হয়তো স্বার্থপর, একগুঁয়ে কিংবা উদ্ধত ছিল সায়মা, কিন্তু কখনোই বোকা ছিল না।

অথচ এখন আর ততটা নিশ্চিত নয় সায়রা। সায়মা সম্পর্কে ওর বিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে দু'জন মানুষ—শওকত হাসান এবং ফাহিম ইমতিয়াজ। কোটিপতি তো রীতিমত বিদ্রূপ করেছে: মায়ের পেটের বোনকে ঠিক চিনতে পারেনি ও!

মানুষটা কি সত্যিই অকপট? আপাত নির্বিকার মুখের আড়ালে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত স্মৃতি বয়ে বেড়ানো নিঃসঙ্গ মানুষ, নাকি শওকত হাসানের দাবিই ঠিক–বদমেজাজী, অহঙ্কারী, উন্নাসিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ একজন সেকেলে পুরুষ?

ওর অন্তত বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। বৃষ্টি কমে এসেছে।

মিনিট দশেক পর তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল সায়রা। ডাইনিং টেবিলে বসে আছে শওকত হাসান, কফির মগে চুমুক দেয়ার ফাঁকে দৈনিকে চোখ বুলাচ্ছে। তার পোশাক দেখে অবাক হলো সায়রা। পাজামা-পাঞ্জাবী পরেছে। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'মসজিদে!'

'আজ না সোনারগাঁয়ে যাওয়ার কথা আপনার?'

'বলেছি নাকি? তাহলে যাব! মসজিদ তো সেখানেও আছে, তাই না? না হয় ঈসা খাঁর সোনা বিবি মসজিদে জুম্মার নামাজটা আদায় করে নেব। মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তত একদিন হলেও মসজিদে যাওয়া উচিত। জানো তো, শুক্রবার হচ্ছে গরীবের জন্যে হজ্জের দিন?'

ভুরু কোঁচকাল সায়রা। শওকত হাসান বোধহয় খোশমেজাজে আছে আজ, নইলে এত হালকা কথাবার্তা বলছে কেন? 'নিজেকে গরীব মনে হচ্ছে আপনার?'

'মনে হবে কেন? আমি তো গরীবই। অন্তত ফাহিম ইমতিয়াজ বা ওদের মত মানুষদের কাছে নেহাত ফকির!'

সায়রা নিশ্চিত হতে পারল না ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে কিনা। ওর সন্দেহ ইচ্ছে করেই ফাহিম ইমতিয়াজের প্রসঙ্গ তুলেছে সে। 'ভাবছি কিছু কেনাকাটা করব,' প্রসঙ্গ বদলাল ও। 'পরে হয়তো সুযোগ হবে না। বিকেলে কি করবেন?'

'উঁহুঁ, তোমার সঙ্গে যেতে পারব না,' আগেই বলে উঠল শওকত হাসান, মুখে রহস্যময় হাসি। 'জাবির মাহমুদের সঙ্গে যাব এক জায়গায়।'

'আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছে সে!'

'মানুষটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং।'

'ইন্টারেস্টিং তো বটেই। নিজের ভাই সম্পর্কে আজগুবি সব গুজব

ছড়াচ্ছে সে, এবং আমার বোনও সেসব থেকে বাদ পড়ছে না। হয়তো ফাহিম ইমতিয়াজকে এর কিছু কিছু জানানো উচিত।'

'ভুলেও ওই কাজ কোরো না।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, কারও বদনাম করার রুচি নেই আমার!' বলেই আনমনা হয়ে গেল সায়রা। ফাহিম ইমতিয়াজকে এসব বলতে বয়েই গেছে ওর! এ পর্যন্ত যতবার দেখা হয়েছে, কত কিছুই তো তুচ্ছ হয়ে গেছে তার উপস্থিতিতে!

নাস্তা সেরে নিজের কামরায় ফিরে এল ও। বৃষ্টি বেড়ে গেছে। বেরোনোর ইচ্ছে স্থগিত রেখে স্কেচ নিয়ে বসল। প্রভার ছবিগুলো শেষ করল। কাজটা উপভোগ করছে ও, নিজেও জানে না মিটিমিটি হাসছে। হঠাৎ ইচ্ছে হলো ফোনে কথা বলে মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজ ফোন ধরতে পারে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা।

নিচে নেমে কলকাতায়, জহিরের অফিসে ফোন করল ও। এমনিতে কম কথার মানুষ সে, প্রভা বা ফাহিম ইমতিয়াজ সম্পর্কে সাধারণ কৌতূহল প্রকাশ করল শুধু। অস্বস্তিকর কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি বলে স্বস্তি বোধ করছে সায়রা। মাঝহার চাচার সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল নিজের কামরায়। লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে এখনও।

রাইমা নামের ছোট একটা মেয়ে চা দিয়ে গেছে ওকে। এক ফাঁকে মেয়েটার একটা স্কেচ এঁকেছে সায়রা। টের পেল ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাইমা, বিস্ময় আর মুগ্ধ চোখে নিজের ছবিটা দেখছে।

'দিদি, ওটা আমার ছবি?' পুলকিত স্বরে জানতে চাইল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

'খুব সুন্দর হয়েছে।'

স্কেচ-বুক থেকে পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে মেয়েটিকে দিল সায়রা। 'তোমার কাছে রেখে দাও।'

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল মেয়েটি, রাজ্যের খুশি উপচে পড়ছে চোখে-মুখে। 'আমার ভাই, আলম, কাজ করে এখানে। চিনতে পেরেছেন? ওর একটা ছবি এঁকে দেবেন?'

মাথা ঝাঁকাল সায়রা। বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে। সে-ই টেবিলে খাবার পরিবেশন করে। নতুন পৃষ্ঠায় চট করে আলমের স্কেচ তুলে ফেলল ও। চোখ তুলে দেখতে পেল এবার একা নয় রাইমা, বরং

ভাই-বোন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আলমের মুখে চাপা উত্তেজনা, যেন দারুণ রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার ঘটছে।

বেড-সাইড টেবিলের ওপর চা-র কাপ নামিয়ে রাখল আলম। 'আর কিছু লাগবে, দিদি?'

'না।'

'দিদি, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'একত্রে আমাদের দু'জনের একটা ছবি এঁকে দেবেন? মা-র কাছে পাঠাব।'

'একসঙ্গে দাঁড়াও ওখানে,' জানালা দেখিয়ে দিল সায়রা, হাত চলছে ওর। কয়েক মিনিট পর ছবিটা ধরিয়ে দিল আলমের হাতে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল পুরো বাড়িতে। কাজের বুয়াও ঘর পরিষ্কার করতে এসে অযথা বেশিক্ষণ থাকছে কামরায়, খেয়াল করল সায়রা। মুখ টিপে হাসল ও, তবে আরেকটা স্কেচও আঁকল। ছবিটা হাতে ধরিয়ে দিতে খুশিতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ময়নার মা। 'আপনি খুব ভাল, আপা!' রুদ্ধ স্বরে বলল মহিলা।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল সায়রা। একাই খাচ্ছে ও। শওকত হাসান ফেরেনি। ওর যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে আলম। সারাক্ষণই দাঁড়িয়ে আছে কাছে, উদগ্রীব। যেন ও কিছু চাইলেই কৃতজ্ঞ বোধ করবে। ঝকঝকে পরিষ্কার গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি, নরমাল পানিও দিয়েছে একটা বোতলে। হাতের কাছে টিস্যু পেপারের নতুন বাক্স। টেবিলে ন্যাপকিন দিয়েছে আজ। মিনারেল ওয়াটারের বোতল পৌঁছে দিয়েছে ওর কামরায়।

মনে মনে একচোট হাসল সায়রা। এভাবেই ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইছে ছেলেটা। রাইমা সুযোগ পেলেই খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে ওর কিছু লাগবে কিনা। সায়রা ধারণা করল এ বাড়িতে ছোটখাট দরকারে লোকের অভাব হবে না ওর।

দুপুরের পর মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠল আকাশে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। তৈরি হয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ও। লবিতে আলমের দেখা পেল।

'ঘুরতে যাবেন, দিদি?'

'হ্যাঁ। আড়ং কি খুব বেশি দূরে?'

'নাহ্, পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া। বলবেন আসাদ গেটে যাবেন।'

বেরিয়ে এসে রিকশায় চড়ল ও। মিনিট কয়েক লাগল পৌঁছতে। দাদা আর জহিরের জন্যে চারটে পাঞ্জাবী, মা-র জন্যে দুটো শাড়ি, নিজের জন্যে হীরার দুল, বাসার জন্যে ওয়াল-ম্যাট আর শো-পীস কিনেছে।

প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল ও। ছুটে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে দুটো বাচ্চা, খেয়ালই করছে না অন্য কাউকে। বাচ্চাদের এড়াতে গিয়ে পিছু পিছু আসা মোটাসোটা এক মহিলার সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হলো সায়রার। কোনরকমে সামলে নিল, কিন্তু মহিলার ভারী কাঁধের ধাক্কায় টলে উঠল ওর দেহ। রেলিং ধরে পতন ঠেকাল বটে, কিন্তু ব্যাগটা ছেড়ে দিতে হলো।

বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ করল সায়রা। অবাক হয়ে খেয়াল করল বিষদৃষ্টিতে ওকে দেখছে মহিলা।

কাঁধে কারও স্পর্শে চমকে উঠল ও। পাশ ফিরে ফাহিম ইমতিয়াজকে দেখে চরম বিস্ময় বোধ করল, একইসঙ্গে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। 'ওহ্, আপনি!'

মহিলার দিকে তাকাল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'কি হয়েছে, আপা?'

'আরেকটু হলে এই মেয়েটা...'

'আমরা দু'জনেই দুঃখিত!' মিষ্টি হেসে দ্রুত দুঃখ প্রকাশ করল ফাহিম, কিন্তু চোখের গভীরে বিরক্তি দেখা যাচ্ছে।

মুখটা বাংলা পাঁচের মত হয়ে গেল মহিলার। সায়রার উদ্দেশে শেষবারের মত তীব্র অসন্তোষ ছুঁড়ে দিল চাহনিতে, তারপর হনহন করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

প্যাকেটগুলো তুলে নিতে ঝুঁকে পড়ল সায়রা। দেখল ফাহিম ইমতিয়াজও তাই করছে। দুটো প্যাকেট নিজের হাতে রাখল সে। 'চলো।'

এগোল সায়রা।

'কি হয়েছিল?'

'সিঁড়িতে ধাক্কা লাগল মহিলার সঙ্গে।'

'দোষটা তোমার ঘাড়ে চেপেছে? যাক্‌গে, কি কিনেছ?'

'সবার জন্যে...প্রভার জন্যে...'

'আমার জন্যে কিছু কেনোনি?'

সিঁড়ির ওপর থমকে দাঁড়াল ও, বিব্রত। 'আপনি...আমার দেয়া জিনিস নেবেন? না হয় এখন কিনে দেই একটা কিছু?'

'কেন নেব না? প্রভা যদি নিতে পারে, আমার দোষ কি!'

ঘুরে ফিরতি পথে এগোতে শুরু করল ও। খপ্ করে ওর কব্জি চেপে ধরল ফাহিম। 'হয়েছে! তামাশা করেছি। দেখতে চাইছিলাম বিব্রত হলে দেখতে কেমন লাগে তোমাকে।'

'কেমন দেখলেন?' কপট অভিমানে ঠোঁট উল্টাল সায়রা।

'সুন্দর, দারুণ সুন্দর!' নিচু স্বরে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ। 'অন্য সময়ের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগল।'

আরক্ত হয়ে গেল সায়রার মুখ, না দেখেও বুঝতে পারছে। খেয়াল করল ধূসর রঙের ট্রাউজার আর সাদা টি-শার্ট পরেছে সে, বয়সটা অন্তত পাঁচ বছর কম লাগছে।

'আপনাকেও সুন্দর, স্মার্ট দেখাচ্ছে,' বিব্রত স্বরে বলল ও, ঠোঁটে স্মিত হাসি। কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজের দিকে তাকাতে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা। মানুষটার চোখে শীতল কঠিন দৃষ্টি, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। *প্রশংসা করায় খেপে গেছে? আজব মানুষ তো!*

অনিশ্চিত পদক্ষেপে ফাহিমকে অনুসরণ করল সায়রা। রাস্তার ওপাশে সাদা একটা করোনা পার্ক করা। গাড়ির দরজা মেলে ধরল সে, তারপর ঘুরে অন্য পাশে উঠল। প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে পাশ ফিরে তাকাল সায়রা, থমকে গেল মানুষটার মুখে নির্লিপ্ততার মুখোশ দেখে–চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, গম্ভীর দেখাচ্ছে এখনও। 'প্রশংসা করাও কি অন্যায়?' খানিকটা অসন্তোষের সঙ্গে জানতে চাইল ও।

'তোমার ক্ষেত্রে!'

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল সায়রা। 'মানে?' এঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে অসন্তোষ আর প্রতিবাদের ঝড় উঠল ওর হৃদয়ে, নিজেকে শান্ত রাখতে হিমসিম খাচ্ছে।

'মানে হচ্ছে...তোমার প্রশংসা আদৌ সত্যি কিনা, বুঝতে পারছি না।'

এ কেমন কথা? 'আমি যা বলি...সবই তাহলে মিথ্যে?'

'আমি অন্তত পার্থক্য করতে পারছি না

'কিন্তু আমি তো মিথ্যে বলিনি!'

'কোন্‌টা মিথ্যে কোন্‌টা সত্যি, কেবল তুমিই জানো।'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন!' এছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না সায়রা, রাগে সারা শরীর জ্বলছে। ইচ্ছে হলো এখনই নেমে পড়ে গাড়ি থেকে, আসলে গাড়িতে ওঠাই ভুল হয়ে গেছে, তিক্ত মনে ভাবল ও।

আড়চোখে ওকে দেখল ফাহিম ইমতিয়াজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'মনে প্রশ্ন জাগেনি, কিভাবে তোমার দেখা পেলাম?'

উত্তর দিল না ও। জেদ আর অসন্তোষে পরস্পরের ওপর চেপে বসেছে ঠোঁট জোড়া।

'গেস্ট হাউজে ফোন করেছিলাম,' বলে গেল সে। 'ওরাই জানাল এখানে এসেছ।'

স্থির দৃষ্টিতে উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে সায়রা, আড়ষ্ট শরীর বিন্দুমাত্র নড়ছে না। সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'দুঃখিত, সায়রা! অন্যায় হয়ে গেছে···' সায়রাকে গ্রাহ্য করতে না দেখে থেমে গেল ফাহিম, আনমনে শ্রাগ করল।

ধানমন্ডি মিনিট পাঁচেকের পথ। বাকি সময়ে নীরবতা ভাঙল না কেউ। চৌধুরী লজের সামনে থামল গাড়ি। মূল দরজার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার মজনু; বিব্রত এবং আড়ষ্ট, যেন গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তাকে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল মালিকের দিকে।

'কোয়ার্টারে চলে যাও,' নির্লিপ্ত স্বরে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল ফাহিম।

'গাড়ি নিয়ে যেতে হবে না, স্যার?'

'না!'

'তাহলে আমাকে যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন?'

'দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি, সেজন্যে থেকেছ। এখন চলে যেতে বলছি।'

দ্রুত কেটে পড়ল মজনু। বোঝা গেল সায়রা একাই নয়, ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর তপ্ত মেজাজের আঁচ এর গায়েও লেগেছে।

'ভেতরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' কিছুটা কোমল স্বরে বলল ফাহিম।

সিঁড়ি ভেঙে ওঠা শুরু করতে টের পেল পাশাপাশি আসছে সে,

এক হাতে ওর কনুই চেপে ধরেছে। সযত্নে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল সায়রা। 'ধন্যবাদ, আমি একাই হাঁটতে পারব।'

হাত ছাড়ল না কিংবা মুহূর্তের জন্যেও থামল না ফাহিম, দ্রুত উঠে গেল শেষ ক'টা ধাপ। ওকেও তাল মেলাতে বাধ্য করল। দরজা খুলে পিছিয়ে গেল সে, যাতে সায়রা আগে ঢুকতে পারে। 'আমার স্টাডিতে চলে যাও,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে।

মাছিকে নির্দেশ দিচ্ছে মাকড়সা, সকৌতুকে ভাবল ও। জড়তা কাটাতে ক্ষীণ হাসল আপনমনে। চোখ তুলে ফাহিম ইমতিয়াজের নির্বিকার মুখ দেখল, অদ্ভুত হলেও সত্যি রাগ বা নির্লিপ্ততার পরও যে কোন সময়ের চেয়ে সুদর্শন এবং আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে।

ভেতরে কোথাও কোন সাড়া নেই, একেবারে নীরব হয়ে আছে। সায়রা ভেবেছিল ছুটে আসবে প্রভা কিংবা হাস্না রহমানের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাবে। নার্সারি বা রান্নাঘর থেকেও কোন শব্দ আসছে না। 'অন্যরা কোথায়?' স্টাডিরুমের দিকে এগোনোর সময় জানতে চাইল ও।

'বাইরে। তোমাকে যেসব কথা বলব, আমি চাই না অন্য কেউ শুনে ফেলুক।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো সায়রা। স্থির দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে সে। চাহনিটা তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী; সায়রার মনে হলো এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে ওকে। ওর দীর্ঘ ছিপছিপে শরীর, প্রতিটি বাঁক আর সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো নিরীখ করল সে, ক্ষণে ক্ষণে থামল, মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখল। অবশ্য এর কিছুই জানতে পারল না সায়রা, ততক্ষণে মাথা নিচু করে ফেলেছে ও।

শেষে সায়রার মুখে স্থির হলো ফাহিম ইমতিয়াজের দৃষ্টি। মুগ্ধ বিস্ময়ে চাঁদমুখটা দেখল, ওর মনে হলো দীঘল কালো চুলের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে হাত বুলাতে ইচ্ছে করবে যে কারও। বিব্রত, বিহ্বল এবং একইসঙ্গে শঙ্কিত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে; এবং যেন তর্ক করবে এখুনি, প্রবল অবজ্ঞা ভরে বিদ্রূপ করবে ওকে। দৃশ্যটা সহজে ভোলার নয়, কিংবা উপেক্ষা করার মতও নয়।

প্রভার কথা মনে পড়ল ফাহিমের। ওর কাছ থেকে তীক্ষ্ণ স্বরের কোন নির্দেশ পেলে এভাবেই প্রতিবাদ করে মেয়েটা, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে, যেন কখনও চড়া কণ্ঠে কথা বলতে পারে না ওর বাবা।

এ মুহূর্তে ঠিক প্রভার মতই দেখাচ্ছে সায়রাকে–বিব্রত, অসন্তুষ্ট। চোখে আশাহতের বেদনা। চাহনিটা সত্যিই উপভোগ করত ফাহিম, প্রভারটা যেমন উপভোগ করে, যদি না জানত যে আসলে পুরোটাই ভান। মেয়েটি যে দারুণ চালাক, সেটা আবারও প্রমাণ করল। তলে তলে শীতল ক্রোধে ফুঁসছে ও, সেটা সংবরণ করার কোন চেষ্টাই করল না; যেহেতু জানে কাউকে বিশ্বাস করে, ঠকে বেদনায় দগ্ধ হওয়ার চেয়ে রাগ আর উষ্মা প্রকাশ করাই শ্রেয়তর।

'দারুণ বোকা বানিয়েছ আমাকে, সায়রা,' শীতল সুরে বলল ফাহিম, ওর চোখের দৃষ্টি অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে সায়রার মনে। মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল মুখ, সীমাহীন বিব্রত বোধ করছে তীক্ষ্ণ অভিযোগটা শুনে। 'ভাবতেও অবাক লাগছে পুঁচকে একটা মেয়ে এভাবে বোকা বানিয়েছে আমাকে! তোমার সহজ-সরল আচরণে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, সায়রা, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…' বলার চেষ্টা করল সায়রা, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল ফাহিম।

'চুপ করো! আগে আমি শেষ করে নিই, পরে তোমার কথা শুনব…যদি সত্যিই কিছু বলার থাকে তোমার, এবং জানি কি বলবে। বহু মেয়েকে দেখেছি আমি, ভদ্র উঁচু বংশের শিক্ষিত যে কোন মেয়েকে অনায়াসে সামলাতেও পারি, কিন্তু তোমার মত পুঁচকে মেয়ে আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আরেকটু হলে তোমার ফাঁদে পা দিয়েছিলাম, কিন্তু নিজের নোংরা কৌশলে শেষে তুমিই ফাঁদে পড়েছ! ঢাকায় আসার আসল উদ্দেশ্যটা মা-কে জানিয়ে আসলেই পারতে, তাহলে চিঠি লিখে সবকিছু ফাঁস করে দিতেন না উনি!'

'কিসের কথা বলছেন আপনি?' চরম বিস্ময় চেপে জানতে চাইল সায়রা, শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছে। মনে হচ্ছে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে ও, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। ভয় হলো কেঁদে ফেলবে, কিন্তু নিষ্ঠুর মানুষটার সামনে কাঁদবে চিন্তাটাই অসহায় করে তুলছে ওকে।

পকেট থেকে একটা খাম বের করল ফাহিম ইমতিয়াজ। দ্রুত হাতে ভেতরের চিঠি বের করে মেলে ধরল ওর চোখের সামনে। তিন হাত দূর থেকে রাহেলা সুলতানার কাঁপা হাতের লেখা স্পষ্ট চিনতে পারল সায়রা। 'সকালে পেয়েছি চিঠিটা,' বিতৃষ্ণার সুরে বলল সে। 'তারপর থেকেই ভাবছি কিভাবে তোমার অভিনয় দেখে মজে গেছি আমি!'

'অভিনয়?'

সায়রার প্রশ্নটা উপেক্ষা করল সে। 'তোমার মা খানিকটা উস্কে দিয়েছেন, আসল কাজ তুমিই করেছ। উনি লিখেছেন প্রভাকে নিয়ে দড়ি টানাটানির কোন প্রয়োজন আসলে নেই। আইনের ঝামেলায় না গিয়ে আমি যদি প্রভাকে তোমার হাতে তুলে দেই, তাহলে কোনরকম তিক্ততা ছাড়াই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়, দু'পক্ষেরই মুখরক্ষা হয়।' আচমকা বেরসিকের মত হেসে উঠল সে–কর্কশ তিক্ত হাসি, তাতে কোন কৌতুক বা রসবোধ নেই। 'যদি আমি নিজের মেয়েকে তোমার হাতে...'

'কি বলছেন এসব!' বিড়বিড় করল ও, অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে। 'আপনি আসলে কিছুই বোঝেননি! চিঠির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারব...আপনি বোধহয় জানেন না যে মা আসলে অসুস্থ, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মানসিক রোগে ভুগছেন। যেসব কথা লিখেছেন, আসলে এর কিছুই মীন করেননি তিনি। প্রভাকে দেখার কথা বলেছেন মা, কিছুদিনের জন্যে যদি কলকাতায় বেড়িয়ে আসে প্রভা...নাতনীকে দেখার অধিকার নিশ্চই আছে ওঁর...'

'কোন অধিকারই নেই ওঁর!' তপ্ত, কঠিন স্বরে বাধা দিল ফাহিম। 'তোমাদের কারোই সেই অধিকার নেই। প্রভা আমার মেয়ে! তোমার বোন যখন নেই, ওর অধিকার সম্পূর্ণ আমার। তুমি কি মনে করো যে মহিলা এ ধরনের চিঠি লিখতে পারেন, তাঁর কাছে আমার মেয়েকে পাঠাব? কিংবা তোমার মত পুঁচকে মেয়ের কাছেও নয়!'

'বাজে কথা বলবেন না!' রাগে চেঁচাল সায়রা, প্রবল অসন্তোষ জমছে মনে–যতটা না ফাহিম ইমতিয়াজের অন্যায্য অভিযোগে, বরং তারচেয়ে অপমানকর কথাগুলোই বেশি আঘাত করেছে ওকে। 'আপনি আসলে গোঁড়া, অন্ধ একজন মানুষ! এবং বোকা! যদি মনে করে থাকেন, প্রভাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছি আমি, তাহলে বলতেই হচ্ছে আসলে মানুষকে চেনা হয়নি আপনার, মানুষ সম্পর্কে কিছুই জানেন না! অথচ নিজেকে মনে করছেন দারুণ চালাক। হ্যাঁ, প্রভাকে দেখতে ঢাকায় এসেছি আমি, কাছ থেকে ওকে দেখতে চেয়েছি। দেখেছি অসুখী নয়, বরং মা না থাকার পরও সুখী পরিবেশে বড় হচ্ছে ও, ভাল আছে–কোন অভাবই নেই ওর। ওকে দেখার অধিকার আছে আমাদের, কারণ ও আমাদের রক্তের! অস্বীকার করতে পারবেন?

'আপনাকে মহৎ এবং উদার একজন মানুষ ভেবেছিলাম। অথচ নিজের বিপরীতে আমাদের ভেবেছেন তুচ্ছ, লোভী কিছু মানুষ হিসেবে! বড়লোক ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর সাথে যেন আমাদের সম্পর্ক থাকাটাও পাপ! বিলাসবহুল এই বাড়িতে পচে মরুন আপনি, আমার তো মনে হয় টাকার অহঙ্কারই শেষপর্যন্ত ডুবিয়ে ছাড়বে আপনাকে!'

কথাগুলো বলার পর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সায়রা, ফাহিম ইমতিয়াজকে পাশ কাটিয়ে ছুট দিল দরজার উদ্দেশে। চাইছে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে, তারপর ছুটতেই থাকবে, যতটা সম্ভব দূরত্ব তৈরি করবে অহঙ্কারী, একগুঁয়ে লোকটির সঙ্গে।

কিন্তু মূল দরজাটা বেঈমানি করল ওর সঙ্গে। একটু ভিন্ন ধরনের লক্ দরজায়, তাছাড়া চোখে উপচে পড়া নোনা জলের কারণে ঠিকমত দেখতেও পাচ্ছে না সায়রা; দরজাটা তাই খোলা আর হলো না। লক্ ধরে টানাটানি করতে থাকল ও, ফোঁপাচ্ছে সেই সঙ্গে।

পেছন থেকে ওর দু'হাত চেপে ধরল ফাহিম ইমতিয়াজ। সবল দুটো হাতের অস্তিত্ব টের পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সায়রার দেহ। 'সায়রা?' কানের কাছে তার কণ্ঠ শুনতে পেল ও, সম্পূর্ণ বদলে গেছে এখন—কোমল, অনিশ্চিত শোনাচ্ছে।

উত্তর দিল না ও, আসলে দিতেই পারল না। অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

'সায়রা?' আবারও ডাকল সে। 'আমি দুঃখিত!'

এবারও কোন উত্তর দিতে পারল না সায়রা। চোখ তুলে তাকাল ও, চোখে জমা পানির কারণে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। জানে এখনই সরে পড়া উচিত, কিন্তু সারা শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই, দেহটা হাড়-মাংসহীন হয়ে গেছে যেন, জড় পদার্থ মনে হচ্ছে; নড়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছে সবই হারিয়ে ফেলেছে।

ওর হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল সে, তারপর কাঁধে রাখল। সরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল ফাহিম ইমতিয়াজ, মুহূর্তের মধ্যে ওকে বুকে টেনে নিল। এতটা জোরে চেপে ধরল যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল সায়রার জন্যে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, সায়রার চাঁদিতে চিবুক চেপে ধরেছে।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, সায়রা—লজ্জিত!' অনেক, অনেকক্ষণ পর আবারও বলল সে।

চোখ বন্ধ করে রেখেছে সায়রা, ওর মুখ লেপ্টে আছে ফাহিমের বুকের সঙ্গে। দু'হাতে ওকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে। শক্ত বাঁধনের মধ্যেই যেন মিনতি প্রকাশ পাচ্ছে, আড়ষ্ট শরীর জানিয়ে দিচ্ছে সত্যিই আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

মিনিট কয়েক চলে গেল। মনে হলো সময় যেন আটকে আছে, স্থির হয়ে আছে নীরব উষ্ণ এই কামরায়; সায়রার হৃৎস্পন্দন শ্লথ হয়ে এল। অনুভব করল ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ফাহিম, স্বস্তির নিঃশ্বাস। তারপর ধীরে ধীরে ওকে সরিয়ে দিল নিজের শক্তিশালী বাঁধন থেকে, পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সযত্নে ওর গালের নোনা পানি মুছে দিল সে। অন্য সময় হলে হয়তো হেসেই ফেলত সায়রা। কিন্তু এখনও নিজেকে ফিরে পায়নি ও, সত্যিই আড়ষ্ট বোধ করছে। এক হাতে ওর চিবুক তুলে ধরল সে, আলতো চুমো খেল কপালে।

'ক্ষমা করে দাও!' ফিসফিস করে বলল ফাহিম।

মাথা নিচু করে ফেলল সায়রা।

কি থেকে কি ঘটেছে জানে না ও, একটু পর অনুভব করল সোফায় এসে বসেছে। স্থির ভাবে চিন্তা করতে পারছে, কিছুটা হলেও নিজেকে সামলে নিয়েছে এখন। ঠিক পাশে বসে আছে ফাহিম, ঘনিষ্ঠ হয়ে। এক হাতে ওর দু'হাত চেপে ধরেছে সে, অন্য হাতটা পড়ে আছে ওর কাঁধে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা—সায়রা সলজ্জ ভঙ্গিতে, কিন্তু ফাহিম ইমতিয়াজ সকৌতুকে, সবিস্ময়ে।

'কি হয়েছে বলুন তো, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!' নিচু স্বরে বলল ও। 'যখনই মনে হলো চিৎকার করছি, তারপর...'

'চুপ করো! কথা বোলো না, তোমাকে দেখতে দাও!'

'কেন?'

'কেন? প্রশংসা শুনতে চাও? কারণ তুমি সুন্দর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতেও ক্লান্তি লাগবে না আমার! তোমার চোখ এত সুন্দর...মুখ...ঠোঁট...'

'লিপস্টিক দেওয়া!'

'দূর! সামান্য লিপস্টিকও নেই! মনে হয় না জিনিসটা কখনও দরকার হয় তোমার।' আলতো হাতে ওর ঠোঁট স্পর্শ করল সে, আদুরে স্পর্শ বিলিয়ে দিল। অজান্তে শিউরে উঠল সায়রা। 'মনে হয় না

কেউ তোমাকে চুমো খেয়েছে কখনও!'

'নিশ্চই খেয়েছে–আপনি!'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'আমি কি দুঃসাহস করেছি, সায়রা?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ফাহিম। 'ভুল করছি না তো?'

'কিসের ভুল? সবকিছুর ব্যাখ্যাই আছে, কিন্তু আপাতত ওসব বাকি থাকুক। মিথ্যে অভিযোগগুলো থেকে নিষ্কৃতি পেলেই সন্তুষ্ট হব আমি!'

'পেয়ে গেছ!' দীর্ঘক্ষণ নীরবে কেটে গেল আবার। 'শিখতে শুরু করেছ তুমি।'

'শিখছি?'

'অনেক কিছুই তোমাকে শেখাতে চাই আমি।'

স্মিত হাসল সায়রা। 'ইশ্‌শ্‌, আমি যেন শিখতে চেয়েছি!'

কৌতুক ফাহিম ইমতিয়াজের চোখে, মুখে রহস্যময় হাসি। 'দেখা যাচ্ছে একেবারে নিষ্পাপ নও তুমি!'

'নিষ্পাপ না হতে পারি, কিন্তু কৌশল বা ভান করতে জানি না।'

'একটু আগে যা খেপে গিয়েছিলে, এরপরও কি সন্দেহ থাকে, ঘুমন্ত রাজকন্যা?'

'ঘুমন্ত? হতে পারে। কিন্তু আমি অতটা পুঁচকে মেয়ে নই! দেখে আমাকে যা মনে হয়, সেটাও বদলানোর উপায় নেই আমার। সুতরাং দয়া করে বাচ্চা মেয়ের মত আচরণ করবেন না আমার সঙ্গে।'

'তাই করছি নাকি?' এবার দু'হাতে ওর কোমর বেষ্টন করল সে, শিউরে উঠল সায়রা। 'এভাবে কি বাচ্চাদের কাছে টানে কেউ?'

'ওহ্, আমি কি বলতে চেয়েছি জানেন আপনি!' ফাহিমের টি-শার্টের দ্বিতীয় বোতামে হাত বুলাল ও। 'সত্যিই কি বিশ্বাস করেন প্রভাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছি আমি কিংবা সেই ইচ্ছে আছে আমার?'

'মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু চিঠিটা পাওয়ার পর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। অন্য কেউ হলে হয়তো পাত্তাই দিতাম না, কিন্তু তুমি আমাকে ঠকাতে চাইছ–চিন্তাটাই অস্থির করে তুলছিল আমাকে!'

'প্রভা আঘাত পাবে এমন কিছুই করব না···ওকে আমি ভালবাসি।'

'জানি আমি,' ওর চোখে চোখ রাখল ফাহিম ইমতিয়াজ, কি যেন

খুঁজছে চঞ্চল চোখ জোড়া। 'খুব নরম তোমার মন, এত নিষ্পাপ সারল্য কেবল বাচ্চাদের মধ্যেই থাকে। সমস্যাটা এখানেই, যে কেউ তোমার আন্তরিকতাকে ভুল বুঝতে পারে। চিঠিটা পাওয়ার পর আমিও ভুল করেছি। প্রভার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতাকে অস্বাভাবিক মনে হলো, অথচ একইসঙ্গে তোমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নারী ভাবতে শুরু করেছি।

'ঠকতে কারও ভাল লাগে? যে মেয়েকে এত মর্যাদা দিচ্ছি, যদি জানতে পারি সে-ই ঠকাতে চাইছে আমাকে, কেমন লাগবে? অন্য কেউ হলে হয়তো কিছুটা খারাপ লাগত, কিন্তু তুমি করছ বলেই সেটা অসহ্য মনে হয়েছে...'

'আমি তো করিনি!'

'জানি আমি। কিন্তু...'

আচমকা দু'হাতে ওর মুখ চেপে ধরল ফাহিম, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল চোখে চোখে। মানুষটার চোখে গভীর মমতা আর আবেগ দেখতে পেল সায়রা। নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া এগিয়ে আসছে, দেখল ও, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিল সায়রা।

'সায়রা!' আহত শোনাল তার কণ্ঠ, যেন হাহাকার করছে।

'না! ...এসব কেন?'

দু'হাতে এখনও মুখটা ধরে রেখেছে সে। কোমল দৃষ্টিতে দেখছে ওকে, যেন কোন রহস্য করেছে সায়রা। ক্ষীণ হাসল এবার, হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। 'বুঝেছি! অভিমান ভাঙেনি?' তারপর সায়রা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ঝটকায় ওকে বুকে টেনে নিল। হাত দিয়ে ঠেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সায়রা, কিন্তু সফল হলো-না। নিজের ঠোঁটে এবার একজোড়া পুরুষালি ঠোঁটের অস্তিত্ব অনুভব করল ও।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, সায়রা!' ফিসফিস করে বলল সে।

সায়রার মনে হলো বুকে বিস্ফোরণ ঘটেছে, উদ্দাম গতিতে ছুটতে শুরু করেছে রক্তকণিকারা। সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরণ, হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণে মধুর এক ছন্দ: *ও আমাকে ভালবাসে!*

মুখ সরিয়ে নিল ফাহিম। 'আজ থেকে তুমি আমার!' যেন দাবি করছে সে, গম্ভীর স্বরে কিন্তু গভীর মমতা নিয়ে বলল কথাটা।

'সম্পত্তি?' তির্যক সুরে জানতে চাইল ও। চোখে ... জলে

এসেছে, হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছল।

'উঁহুঁ, সম্পদ। মহামূল্যবান সম্পদ। আজীবন তোমাকে আগলে রাখব আমি!'

এক হাত তুলে ফাহিমের ঘন চুলে হাত বুলাল সায়রা। 'আমার মতামতের কোন মূল্য নেই? নাকি সবকিছু জোর করেই ছিনিয়ে নেন আপনি?'

'যদি ভুল করে না থাকি কিংবা তুমি যদি ভান না করে থাকো, মতামতটা আগেই পেয়ে গেছি আমি!'

'আমি ভান করতে জানি না!' আহত স্বরে প্রতিবাদ করল ও।

'জানি বলেই তো এতটা নিশ্চিত আমি, এবং এমন ভুলও আর হবে না!' সায়রার একটা হাত গালের সঙ্গে চেপে ধরল সে, তারপর আলতো চুমো খেল তালুতে। 'একটু আগে তোমার সঙ্গে যে আচরণ করেছি, তারপর বোধহয় এসব পাওনা নয় আমার!'

'আপনি যা বলেছেন...'

'শব্দটা ছেঁটে ফেলো!'

SPSM

'কোন্ শব্দ? ঠিক আছে...যা বলেছেন...'

'উঁহুঁ, সম্বোধনটা পাল্টে ফেলো...'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল সায়রার মুখ, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল। 'পরে...যখন সবকিছু স্বাভাবিক, সহজ হয়ে যাবে! প্লীজ, জোর করবেন না!' গালের সঙ্গে ফাহিম ইমতিয়াজের হাত দুটো চেপে বসতে শঙ্কিত হয়ে উঠল সায়রা। নিশ্চিত জানে আবার ওকে চুমো খাবে সে। দ্রুত চোখ তুলল ও, দেখল কঠিন হয়ে গেছে তার চাহনি, নেমে আসছে নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া। দু'হাতে ফাহিমের গলা জড়িয়ে ধরল ও, রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: 'আই লাভ ইউ!'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ফাহিম, ঘোর লেগেছে চোখে। আলতো হাতে সায়রার নাক টিপে ধরল। 'চালাক মেয়ে! দ্রুত শিখে ফেলছ সবকিছু!' সায়রার চুলে হাত বুলাচ্ছে সে, মিটিমিটি হাসছে। 'কি যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম...এখানে আসার পর যেসব কথা বলেছেন,' সম্বোধন পাল্টায়নি দেখে ভুরু কোঁচকাল ফাহিম, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না সায়রা। 'সেটাই স্বাভাবিক ছিল। আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি জানি, মা আপনাকে অদ্ভুত একটা চিঠি লিখেছেন...'

'তাতে কিছু যায়-আসে না, মাই লাভ।'

'অবশ্যই যায়-আসে! বুঝতে পারছেন না, উনি আমার মা? কোন অজুহাত না থাকলে একটা কথা ছিল,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল ও, বেশভূষা ঠিক করে নিল। তারপর হাত বাড়িয়ে ফাহিমের দুটো হাতই তুলে নিল নিজের হাতে। 'প্লীজ, সবকিছু ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে!'

'ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে মেজাজটা আরেকটু ঠাণ্ডা করা দরকার। তুমি কি আমাকে কড়া এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে? বউ হিসেবে তোমার রান্নার হাত কেমন এই উসিলায় পরীক্ষা হয়ে যাক!' কৌতুকে নেচে উঠল তার চোখ জোড়া। 'কাবার্ডে পাবে সবকিছু। এই ফাঁকে কাপড় বদলে আসছি আমি।'

রান্নাঘরটা গোছানো। সবকিছু হাতের নাগালে রয়েছে। কফি তৈরির জন্যে ইলেকট্রিক পারকুলেটরও আছে। স্রেফ একটা সুইচ টিপতে হলো ওকে, হাসনা রহমান সবকিছু তৈরি করে রেখেছেন।

ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে দেখল এখনও নিজের কামরা থেকে বেরোয়নি ফাহিম। কফির মগ ঢেকে রেখে ব্যালকনিতে চলে এল ও। আনমনা হয়ে যাচ্ছে প্রায়ই, সারাক্ষণ কি এক প্রশান্তি ঘিরে রেখেছে ওকে। আনমনে ভাবছে গত আধ-ঘণ্টা ঠিক কি কি ঘটেছে, কি এক মায়াবী ঘোরে ঘটে গেছে সবকিছু—ওর জীবনটাই বদলে গেছে, কোন কিছুই আর আগের মত নেই বোধহয়।

পেছনে পদশব্দ শুনতে পেল ও। ঢিলেঢালা ট্রাউজার আর একটা সুতীর শার্ট পরেছে ফাহিম, চশমা খুলে রেখেছে। টি-শার্ট খোলার সময় বোধহয় চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, আর আঁচড়ায়নি। কপালে এসে পড়েছে কয়েকটা চুল।

ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল সে। সায়রার চাঁদিতে আলতো চুমো খেল। 'জেগে ওঠো, স্বপ্নময়ী!'

হেসে উঠল সায়রা, চোখ তুলে তাকাল। এবার ওর ঠোঁটে এল চুমোটা। একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল সে, তারপর সিগারেট ধরাল।

'চিঠিটা দেখতে পারি?' খানিক দ্বিধার পর জানতে চাইল ও।

'নিশ্চই, যদি চাও,' ভেতরে গিয়ে চিঠিটা নিয়ে এল সে।

দ্রুত পড়ল সায়রা. শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ তুলে দেখল

আগ্রহ ভরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফাহিম, কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে।

শূন্য দৃষ্টিতে বাগানের দিকে তাকাল সায়রা, কিছুটা হলেও অসহায় বোধ করছে। জানে অসুস্থতার কারণেই এমন আজগুবি চিঠি লিখেছেন রাহেলা, সুস্থ অবস্থায় লিখলে হয়তো আন্তরিক এবং সৌহার্দপূর্ণ হত চিঠিটা।

একটা হাত ওর কাঁধে তুলে দিয়েছে ফাহিম, তালু দিয়ে ঘাড় চেপে ধরেছে। কানের পেছনে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে ওর ত্বকে। মমতা, নির্ভরতা আর সহানুভূতির স্পর্শ, জানে সায়রা। শরীর শিথিল করে দিল ও, ফাহিমের বাহুতে মাথা রাখল। 'বিশ্বাস করবেন, উনি আসলে ঠিক এরকম নন?' অনিশ্চিত সুরে শুরু করল ও। 'বেশিরভাগ সময় একেবারে স্বাভাবিক থাকেন মা, কিন্তু মাঝে মধ্যে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত বিষণ্নতায় ভুগছেন, অথচ বরাবরই হাসি-খুশি ছিলেন তিনি, সারা দিন বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন। বাবা আর সায়মার মৃত্যুর কারণে এই পরিবর্তন। বেশিরভাগ মহিলাই বোধহয় স্বামী হারানোর শোক সামলে নিতে পারেন না, অভাবটা দিনে দিনে বুঝতে পারেন। তারপর···সায়মার মৃত্যুর খবর পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন মা। মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহও চলে যায় ওঁর মুখ থেকে একটা শব্দও শুনতে পাই না আমরা!'

'কি হয়েছিল তোমার বাবার?' মৃদু, কোমল স্বরে জানতে চাইল ফাহিম, খেয়াল করেছে ওর স্পর্শ সাহায্য করছে মেয়েটিকে, ভরসা এবং সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছে সায়রা।

চোখ তুলে তাকাল সায়রা, বিহ্বল দেখাচ্ছে। 'আপনি কি সত্যিই জানেন না? সায়মা কখনও বলেনি?' ফাহিমকে মাথা নাড়তে দেখে মুখটা বেদনায় নীল হয়ে গেল। 'হায় আল্লাহ্! কিভাবে ও···'

'তোমাদের পরিবার সম্পর্কে কখনোই তেমন কিছু বলেনি ও।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফাহিমের দিকে তাকাল সায়রা। সম্ভব, সায়মা বরাবরই স্বার্থপর ছিল। কিন্তু নিজের বোনকে এতদিন পর, এবং মৃত জেনে, স্বার্থপর বলতে সত্যিই খারাপ লাগছে ওর।

কতদিন হলো, সাত বছর? বাবার অভাব সামলে নিয়েছে ওরা, কিন্তু তিক্ততা এতটুকু ম্লান হয়নি। এতদিন পর ঘটনাটা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছে সায়রা, যেহেতু অন্যদের মধ্যে সেটার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে

পুরোপুরি সচেতন, বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ওর। হয় সহানুভূতি আর করুণা অনুভব করে এরা, কিংবা বিতৃষ্ণায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। সায়রা কখনোই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কোন্‌টা বেশি খারাপ। 'অফিসে কি একটা ঝামেলা হচ্ছিল ওঁর, সম্ভবত টাকা-পয়সার ব্যাপার। আমি তখন খুব ছোট, ষোলো-সতেরো হবে বয়স। একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি। বাবা বোধহয় আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, পুলিশ ওঁকে ধরার আগেই পালিয়ে গেলেন।

'কয়েক মাস ওঁর কোন খোঁজ পেলাম না আমরা। পরে জানলাম, বারাসাতের ছোট্ট একটা হোটেলে উঠেছেন, পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন।'

ক্ষণিকের জন্যে থামল ও। ফাহিমের দিকে তাকাতে পারছে না, লজ্জায় নুয়ে পড়েছে মাথা। জানে না তন্ময় হয়ে ওকে দেখছে ফাহিম ইমতিয়াজ। আচমকা যেন বয়েস বেড়ে গেছে ওর, ষোলো বা আঠারো নয়, কিংবা চব্বিশও নয়। পরিপূর্ণ এক নারী মনে হচ্ছে সায়রাকে—পরিণত এবং কাঙ্ক্ষিত।

'ওখানেই আত্মহত্যা করেন বাবা,' চেষ্টাকৃত নিরুত্তাপ স্বরে খেই ধরল সায়রা। পলকের জন্যে চোখ তুলে ফাহিমের দিকে তাকাল, কালো চোখে কি যেন খুঁজছে। ফাহিমের উজ্জ্বল চাহনিতে যা আছে, তা অন্তত বিতৃষ্ণা বা করুণা নয়, সায়রার তাই মনে হলো; বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু—গভীর মমতা আর একইসঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে, ভালবাসার মানুষটির কষ্ট বোঝার বা লাঘব করার আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু সায়মা আপনাকে বলল না কেন? বলা উচিত ছিল ওর!' তীক্ষ্ণ স্বরে শেষ করল ও।

'সায়রা, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এবং শতভাগ সততা নিয়ে বলছি, বোনকে চিনতে পারোনি তুমি। সায়মা শুধু নিজেকেই ভালবাসত। তোমাদের কোন সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায়নি ও, ভোগ-বিলাসে এতটাই ব্যস্ত ছিল…' সায়রার মুখটা বেদনায় ম্লান হয়ে যেতে থেমে গেল ফাহিম। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু এটাই সত্যি।'

অদ্ভুত হলেও সত্যি, সায়মা সম্পর্কে শওকত হাসানের মতই মূল্যায়ন করছে সে। "কেবল নিজেকেই ভালবাসত সায়মা"—জাবির মাহমুদের সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে সাংবাদিক। 'জানি আমি,' রুদ্ধ স্বরে বলল সায়রা। 'আমার অদ্ভুত ধারণা ছিল

কিছুটা, বাবার মৃত্যুর পর কষ্টেসৃষ্টে যাচ্ছিল আমাদের দিন। সেসবের মুখোমুখি হতে চায়নি সায়মা, সেজন্যেই ঢাকায় মডেলিংয়ের অফার পেয়ে দেরি করেনি। মা তখন হাসপাতালে, দাদু আর ভাইয়া আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু কারও কথায় কান দেয়নি সায়মা। বাবার মৃত্যুর পর বছর খানেকও অপেক্ষা করেনি ও। ওর বিয়ের খবর প্রায় কয়েক মাস পর পেয়েছিলাম আমরা…আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, প্লীজ, দয়া করে ভুল বুঝবেন না! কিংবা সায়মাকেও দোষ দিচ্ছি না। আসলে ওর ধাতটাই ছিল এমন। সুখে থাকলে নিজেকে নিয়ে মেতে থাকত, কিন্তু যখনই কষ্ট হত, অন্যদের ষোলোআনা মনোযোগ বা সহযোগিতা আদায় করতে চাইত।

'বাবার মৃত্যুর পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন মা। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন দু'বার। সায়মার বিয়ের খবর পেয়ে আরও ভেঙে পড়লেন। সায়মা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং চটপটে ছিল বলেই হয়তো, মার ইচ্ছে ছিল গর্ব করে বলার মত কারও সঙ্গে বিয়ে দেবেন ওকে।

'মা সামলে নিলেন একসময়। নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন যে পছন্দমত স্বামী পেয়েছে সায়মা, সুখে আছে। আশা করতেন আপনাকে নিয়ে কলকাতায় যাবে ও, কিন্তু দুই বছরেও যখন তেমন কিছু ঘটল না, মা সত্যিই দুঃখ পেলেন। মাঝে মধ্যে বলতেন ঢাকায় এসে দেখে যাবেন আপনাদের…কিন্তু টানাটানির মধ্যে যাচ্ছিল আমাদের। তাছাড়া মা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন, হাসপাতালে ভর্তি হতে হত…'

নীরবে কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। অস্পষ্ট হলেও কিছু ঘটনা মনে পড়ছে ফাহিমের। প্রভা তখন সায়মার গর্ভে, রাহেলা চিঠি লিখেছিলেন দেখতে আসবেন ওদের, প্রভার জন্মের সময়ে থাকবেন মেয়ের কাছে। কিন্তু সাফ না করে দেয় সায়মা, এমনকি ফাহিমের সম্মতি থাকার পরও। দু'জনে এ নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে নিজের মা-কে যখন সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, এড়িয়ে গিয়েছিল সায়মা।

'মা কিন্তু এখনও আসতে চাচ্ছেন এখানে,' খেই ধরল সায়রা। 'প্রভাকে দেখতে। হয়তো জানুয়ারীর দিকে আসবেন, ভাইয়াকে তাই বলেছেন।'

'বেশ তো। অসুবিধে কি!'

'অসুবিধে? অবশ্যই আছে। কারণ…আমি চাই না ওরা এখানে

আসুক। নিজের পরিবারকে তো চিনি আমি। ওরা একেকজন অদ্ভুত মানুষ। মা-র কথাই ধরুন, বেশিরভাগ সময় ভাল থাকলেও, যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আর কারও কাছে ভাল লাগবে না ওঁকে। করুণা আর বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার থাকে না ওঁর। গুছিয়ে চিন্তা করতে পারেন না, স্নায়ু দুর্বলতার শিকার···দাদু হয়তো আসবেন ওঁর সঙ্গে। কিন্তু সেকেলে একজন মানুষ তিনি, সারাক্ষণ বকবক করে আপনার মাথা ঘুরিয়ে দেবেন!'

'তাই? কিন্তু তাতে সমস্যাটা কি, হানি?' সহাস্যে জানতে চাইল সে।

সায়রা খেয়াল করেছে বিভিন্ন ভাবে ওকে সম্বোধন করছে ফাহিম। 'সমস্যা···সমস্যা তো আছেই। আপনার হয়তো ভাল লাগবে না ওঁদের!'

'সেটা আমাকে দেখতে দাও। বলো, বাকিটাও শুনতে চাই।'

'বলার মত তেমন কিছু নেইও আর। সায়মার মৃত্যু মা-র জন্যে স্রেফ আরেকটা আঘাত, আবার নার্ভাস ব্রেকডাউন হলো ওঁর। পুরো সাত মাস হাসপাতালে থাকতে হলো। হঠাৎ করেই প্রভার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জানি না কতদিন ধরে আপনাকে চিঠি লিখে আসছেন উনি, কিন্তু খুব বেশিদিন হয়নি ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছি আমরা। ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু এত মন খারাপ করে থাকতেন–আসলে প্রভাকে পেয়ে মেয়ে হারানোর শোক ভুলতে চেয়েছেন তিনি।'

লজ্জিত দেখাচ্ছে ফাহিমকে। 'তোমাদের যে কেউ সত্যিকার অবস্থাটা আমাকে জানালে, প্রভাকে তাহলে নিয়ে যেতাম আমি। স্রেফ স্বার্থপরতার কারণে নিজের কাছে ওকে রাখার কোন অধিকার নেই আমার।···সত্যি কথা বলতে কি, আরেকটু বড় হওয়ার পর, ওকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। তখনই চিঠিগুলো আসতে থাকল, তাতেই বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। আমার মনে হলো জোর করে ওকে ছিনিয়ে নিতে চান প্রভার নানী। ওঁর অসুস্থতার কথা জানতে পারলে হয়তো রাগ হত না আমার···'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমাদের। সায়মার ভুলের কারণেই এমন হয়েছে। একবার আপনাকে লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনার ওপর কিছুটা বিরক্তিও অনুভব করেছি বলে

লিখিনি,' তিক্ত হাসল সায়রা। 'আপনার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানতাম না আমরা, শুধু জানতাম অনেক ধনী আর ঢাকায় থাকেন। ব্যস, এই হচ্ছে আমাদের ধারণা—সায়মা শুধু এই জানিয়েছে।'

ফাহিমের হাতটা এখনও ওর ঘাড়ের ওপর। উষ্ণ; স্বস্তিকর স্পর্শ লাগছে ত্বকে। গভীর ভালবাসা নিয়ে পুরুষটির দিকে তাকাল ও, দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল। 'যেরকম ভেবেছিলাম, মোটেও তেমন নন আপনি।'

'তাই? কি ভেবেছিলে?'

'জানি না···হয়তো আরও বয়স্ক। কিন্তু দেখতে···'

তিক্ত অতীতের ছাপ সরে গেছে মেয়েটির মুখ থেকে, স্বস্তি নিয়ে দেখল ফাহিম। 'বলে যাও। দেখতে কেমন?'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল সায়রা। 'আমার তো মনে হয়, মডেলিং বা অভিনয়ে নেমে যাওয়া উচিত আপনার।'

ঝটিতি সায়রার মাথায় চাঁটি মারল ফাহিম। মুখে অস্বস্তি আর চোখে কৌতুক। 'দাঁড়াও, পুঁচকে মেয়ে! আগে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাক, তারপর দেখাব আমি কেমন লোক! লাইসেন্সটা পেয়ে নিই···' হেসে উঠল সে, কথাটা শেষ করল না। সায়রাকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

ছুটে পালাল সায়রা, হাসছে ও, কিন্তু পিছু নিল ফাহিম। হলরুমের মাঝামাঝি পুরুষটির বাঁধনে আটকা পড়ল। নির্দয় ভাবে ওকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে, ছাড়া পাওয়ার জন্যে অনুনয় করছে সায়রা। দৃঢ় বাঁধনে ওর কোমর চেপে ধরেছে ফাহিম, এত জোরে ধরেছে যে কোন ভাবেই ছাড়া পাচ্ছে না সায়রা। দুর্বল স্বরে হাসল ও। 'হিস্টেরিয়া আছে আমার। প্লীজ, ছেড়ে দিন! নইলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব এখুনি!'

'কি করবে এখন, মেয়ে? সারা বাড়িতে একটা প্রাণীও নেই। যতই চিৎকার করো, কেউ শুনতে পাবে না!'

'কাঁদব তাহলে···আর অভিশাপ দেব আপনাকে!' সহাস্যে মুখ তুলল ও। সানন্দে ঠোঁট জোড়া দখল করল সে। দীর্ঘক্ষণ, সায়রার মনে হলো মাথা ঘুরছে ওর, ঠোঁট দুটো বোধহয় বিক্ষত হয়ে গেছে।

'স্বীকার করো আমাকে ভালবাস, তাহলে ছাড়া পাবে।'

'না।'

'না কেন?'

'পারছি না।'

'আমার বয়সটা বেশি, তাই না? সেজন্যে...'

হাত তুলে ফাহিমের ঠোঁটে চেপে ধরল সায়রা। 'উঁহুঁ, তা নয়। বরং...'

'বরং কি?'

আরক্ত মুখ নিচু হয়ে গেল ওর। 'ভালবাসার মানুষ হিসেবে একটু বয়স্ক লোকই পছন্দ আমার—অভিজ্ঞ, পরিণত, বিবেচক, দরদী...'

'বলো, এই বুড়োকে ভালবাস তুমি?'

'বাসি!'

'আরও স্পষ্ট করে বলো।'

'ভালবাসি...ভালবাসি তোমাকে!' ফাহিমের বুকে মুখ গুঁজে দিল সায়রা, লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে মুখ। টের পেল আরও দৃঢ় হয়ে গেছে বলিষ্ঠ হাতের বাঁধন, ঝুঁকে ওর কপালে চুমো খেল সে। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল।

ড্রয়িংরুমে এসে ওর ব্যাগ তুলে নিল ফাহিম, হাতে ধরিয়ে দিল। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'প্রভার সঙ্গে দেখা করব না?'

'দুঃখিত, সায়রা, একটু তাড়া আছে আজ।'

'আপনি আসলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন!'

'হ্যাঁ, দুটো কারণে। একটু পরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার। রাজশাহী থেকে এক ভদ্রলোক আসবেন, সস্ত্রীক। পরে ওঁদের সঙ্গে সোনারগাঁয়ে ডিনার করব।'

'ওহ্, কিন্তু তু...তুমি বলেছ দুটো কারণ!'

নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ফাহিমের মুখ। 'দারুণ শিখছ, সায়রা! একদিনেই বেশ উন্নতি হচ্ছে।' একটু থামল সে, মুখটা গম্ভীর হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল, সত্য বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছে। 'আরেকটা কারণ...তুমি যদি এখানে থাকো, হয়তো নিজেকে সামলে রাখতে পারব না আমি!'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে সায়রা, নড়ছে না।

'সত্যি বলছি, সায়রা। আমি মুনী বা রোবট নই, এবং ভান করাও আমার অপছন্দ। যত দ্রুত সম্ভব তোমাকে চাই আমি, আজীবনের জন্যে, এবং সম্ভবত প্রভাও চায়। ইতোমধ্যে ও তোমাকে সিনডারেলা

মা বলে ডাকা শুরু করেছে।'

'সিনডারেলা মা?' প্রবল বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল সায়রার।

'হ্যাঁ। তুমি জানো না, কিন্তু তোমাকে রূপকথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে ও। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বাপ-মেয়ে একসঙ্গে তোমার প্রেমে পড়েছি আমরা; এবং দু'জনেই চাইছি যত দ্রুত সম্ভব তোমার অধিকার পেতে।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু পরে ভাবা যাবে। জলদি করো, ওরা এসে পড়বে।

'সিনডারেলা মা হওয়ার ব্যাখ্যাটা দেবে না আমাকে?'

'নিশ্চই,' দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল ফাহিম। 'সিনডারেলা ওর প্রিয় গল্প। মা যেহেতু নেই, একজন মা-র অভাবই বোধ করবে ও, তাই না? সিনডারেলার গল্প শোনার পর থেকে হয়তো ওর অবচেতন মন আশা করছে কোন একদিন কোন এক মহিলা মা হয়ে আসবে ওর জীবনে, সিনডারেলার মত ভালবাসা আর মমতা নিয়ে...'

সাত

গেস্ট হাউজের লবিতে বিদায় নিয়েছে ফাহিম ইমতিয়াজ। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আগামীকাল সন্ধে সাতটায় এখান থেকে তুলে নেবে ওকে।

সিঁড়ি ভেঙে যখন ওপরে উঠে এল সায়রা, তখনও ঘোর কাটেনি ওর, নিজেকে স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চোখ পড়তে নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল, ভাগ্যিস কারও সঙ্গে দেখা হয়নি! চুল এলোমেলো হয়ে আছে, চোখ জোড়া এখনও চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল, গাল দুটো লালচে হয়ে আছে, জোড়া ঠোঁট কিছুটা ফুলে গেছে।

আঙুল দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করল ও, নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ রহস্যময় হাসি হাসল। *প্রেমে পড়েছি আমি*, আনমনে

ভাবল ও, *প্রেমে পড়েছি এবং ডুবেছি। আদ্যোপান্ত।*

কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। চোখ বুঁজতে মানসচক্ষে ফাহিম ইমতিয়াজের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল, আড়ং থেকে ওকে তুলে নেওয়ার পর ফাহিমের বলা প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছে, উপলব্ধি করতে পারছে প্রতিটি স্পর্শ। তিক্ত অভিযোগটা মনে পড়তে বেদনা অনুভব করল, একইসঙ্গে প্রশান্তিও বোধ করছে, যেহেতু জানে পরের সময়টুকুতে জীবনের সবচেয়ে মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

মিনিট বিশ পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। গোসল করার পর ঝরঝরে লাগল নিজেকে। দুপুরের উত্তেজনা বা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বিদায় নিয়েছে মুখ থেকে, খেয়াল করল, কিন্তু মনে গভীর প্রশান্তি আর ভাল-লাগার অনুভূতিটা রয়ে গেছে। চোখের ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়েনি অবশ্য, কিন্তু সেটার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না অন্য কেউ, নিশ্চিত জানে সায়রা। শওকত হাসানও ধরতে পারবে না।

ভালবাসার ব্যাপারটা কি সত্যি এতই আনন্দের? আনমনে ভাবল ও, সবকিছু রঙিন উজ্জ্বল মনে হয়? মনে সবসময় অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করে সব প্রেমিক-প্রেমিকা? ফাহিমও কি ওর মতই উচ্ছ্বাস বোধ করছে?

'কোথায় ছিলে সারা দিন?' প্রায় ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল শওকত হাসান। সারাটা দিন প্রায় নিরানন্দে এবং হতাশার মধ্যে কেটেছে তার, কাজের কাজ কিছু হয়নি। জাবির মাহমুদের জন্যে একটা শপিং মলের সামনে অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজাই সার হয়েছে শুধু। দুই ঘণ্টা দেরি করে সেখানে পৌঁছায় জাবির। পরে ওকে বন্ধুদের আড্ডায় নিয়ে যায় সে। জায়গাটা কিংবা লোকগুলোকে মোটেই পছন্দ হয়নি সাংবাদিকের। স্রেফ তাস খেলে সময় কাটাচ্ছিল তারা। উঁচু স্টেকের জুয়া।

ফাহিম ইমতিয়াজ সম্পর্কে জানতে পারবে এই আশায় ওখানে চারটে ঘণ্টা ব্যয় করেছে শওকত, কিছুক্ষণ খেলেছেও। কয়েক পেগ হুইস্কি গিলেছে আর ঢাকার বিখ্যাত এক দোকানের কাচ্চি বিরিয়ানি পেটে পড়েছে–লাভের মধ্যে এই যা।

কিন্তু তিনটে বাজার পর আর ধৈর্য রাখতে পারেনি শওকত। সাতজন লোকের অলস গল্প শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। আরও একটা কারণ ছিল–নেহাত আগ্রহ বশে খেলতে বসেছিল, কিন্তু

ভাগ্যদেবী সহায় হয়নি ওর। বেশ কিছু টাকা খসে গেছে পকেট থেকে, যতটা ভেবেছিল তারচেয়েও বেশি। বিদেশ বিভুঁইয়ে চাইলেও তো কারও কাছে ধার পাওয়া যায় না! অগত্যা আগ্রহের আগুনে জল ঢেলে উঠে পড়তে হয়েছে ওকে। একাই বেরিয়ে এসেছে, জাবির আসর ছেড়ে উঠতে রাজি হয়নি।

উচ্ছল, সতেজ এবং হাসি-খুশি সায়রাকে দেখেও মেজাজের উন্নতি হয়নি ওর, বরং তেতে উঠল আরও। কারও আগ্রহে পানি ঢালার মত মানসিকতা না থাকলেও আপাতত একজন নৈরাশ্যবাদী সে, যে কারও স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম।

'বোনের খুনীর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলে?' কিছুটা উপহাসের স্বরে জানতে চাইল শওকত হাসান, সায়রার মুখ দেখেই আঁচ করে নিয়েছে কার সঙ্গে ছিল সারা দিন।

চোখে আহত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে সায়রার। গালের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেল; এমনকি চোখের ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্যও হারিয়ে গেছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একটা চেয়ার দখল করল ও, তারপর শওকত হাসানের দৃষ্টি এড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল।

'দুঃখিত, সায়রা। বোকার মত বলে ফেলেছি কথাটা,' ভুল শুধরে নিল সাংবাদিক। 'আসলে মেজাজটা ভাল নেই আমার। সারাটা দিন এত বাজে কেটেছে!'

স্মিত হাসল ও। শওকত হাসান দুঃখ প্রকাশ করায় মুহূর্তের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ফিরে পেল। 'আমার দিনটা কিন্তু ভাল কেটেছে।'

'চিঠিটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ ফাহিম ইমতিয়াজকে?'

ব্যাপারটা ধরতে মুহূর্ত খানেক বেশি সময় লাগল সায়রার।

'সায়মার চিঠি, তোমার কাছে লিখেছিল যেটা। এখনও নিশ্চই তোমার কাছে আছে চিঠিটা?'

'আছে।'

'ফাহিম ইমতিয়াজকে জিজ্ঞেস করেছ ওটা সম্পর্কে?'

'না।'

'চিঠিটার কারণেই ঢাকায় এসেছ তুমি। আসার পথে সারাক্ষণ ওটাই ছিল তোমার ভাবনার বিষয়–রহস্যের জট খুলতে ব্যস্ত ছিলে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তখন ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'

চোখ সরু করে তাকাল শওকত। তারপর কিছুটা ঝুঁকে এল

সামনে। 'সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফাহিম ইমতিয়াজকে সরাসরি চেপে ধরব এবার। তবে ভয়ও পাচ্ছি, যা মেজাজ লোকটার, শেষে আমার গায়ে হাত তুলে বসে কিনা!'

'এসব শোনার ইচ্ছে নেই আমার।'

'ঠিক আছে, আমিও বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু দয়া করে দুটো কাজ করে দাও–তোমার নিজের স্বার্থেও জরুরী সেগুলো–চিঠিটার কথা ভুলে যেয়ো না, আর···আজ রাতে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? জাবির মাহমুদের সঙ্গে দেখা করব। একটু আগে ফোনে জানিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর জানাবে সে।'

'না! জাবির মাহমুদের আজগুবি গল্প শোনার ইচ্ছে নেই আমার!'

'সায়রা, বোকা নও তুমি, সুতরাং বোকা হওয়ার ভান করে লাভ নেই। তুমি যাই ভাবো না কেন, কোন একটা বিষয়ে দারুণ আতঙ্কে ছিল সায়মা, ভয় পাচ্ছিল সেটা জেনে গেলে চরম কিছু করে বসতে পারে ফাহিম ইমতিয়াজ। স্বামীকে এত ভয় পাচ্ছিল কেন ও? এর সবই কাগজে-কলমে লেখা–ওই চিঠিতে, ইচ্ছে করলেও এড়িয়ে যেতে পারো না তুমি!'

'কত কথাই তো বলে লোকজন! সব কি সত্যি হয়? কখনও শোনেননি দুষ্টু ছেলেদের কত বাজে হুমকি দিয়ে শাসায় মা-রা? তাই বলে সত্যি সত্যি কোন মা কি তাই করে?'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সাংবাদিক। 'উদাহরণটা ভালই দিয়েছ। যাক্‌গে, তর্ক করতে চাই না। কিন্তু যেজন্যে ঢাকায় এসেছ, সত্য উদ্ঘাটন করবে তুমি, আমার তো মনে হয় এটুকু তোমার কাছে পাওনা আছে সায়মা।'

'আমার কাছে কোন পাওনাই নেই ওর। কিচ্ছু না! বেঁচে থাকতে আমাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কেয়ার করেনি ও, আমিই বা ওর সম্পর্কে কেন কেয়ার করব এখন? উঁহুঁ, শওকত ভাই, এটা কোন কারণ হতে পারে না।'

মোক্ষম অস্ত্রটা এখনও বাকি রেখেছে শওকত হাসান। *এবার কাজ না হয়েই যায় না*, নিজেকেই বলল সে, *না হলে আশা ছেড়ে দেব।* 'আমার ধারণা আসলে তুমি নিজেই শঙ্কিত। কারণ তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ সায়মার আশঙ্কাই সত্যি এবং ওকে খুন করেছে ফাহিম ইমতিয়াজ। কথাটা যদি নাই বিশ্বাস করো, তাহলে আমার কথায় হাসা

উচিত তোমার এবং স্বেচ্ছায় জাবির মাহমুদের কথা শুনতে চাইতে। তাতে কোন অসুবিধে হবে না কারও।

'আসলে ভয় পেয়েছ তুমি, সায়রা। শুধু কি তাই? যে চিঠির সূত্র ধরে ঢাকায় এসেছ, সেই চিঠিটাও ফাহিম ইমতিয়াজকে দেখাওনি, কারণ তুমি ধরেই নিয়েছ কিংবা জানো যে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না সে!'

কাজ হবেই এতে, জানে সে। এমন যুক্তি শুনে সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটিও ক্ষণিকের জন্যে বাচ্চাদের মত নির্বোধ কিংবা বিমূঢ় হয়ে যেতে পারে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল সায়রা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চাহনিতে বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ ঝরে পড়ছে। মনের একটা অংশ আঁচ করতে পারছে শওকত হাসান আসলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য করতে চাইছে ওকে; কিন্তু আরেকটা অংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে–চাইছে শওকত হাসানের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে।

'ঠিক আছে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'যাব আপনার সঙ্গে। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী জাবির মাহমুদের সঙ্গে দেখা করব। দেখা যাক, কি বিষ আছে তার জিভে!'

পান্থপথের কাছাকাছি একটা বার-কাম-রেস্টুরেন্টে সায়রাকে নিয়ে এসেছে শওকত হাসান। রাসেল স্কোয়ার হয়ে পান্থপথে ঢুকে, গ্রীন রোডের আগেই একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। প্রায় অন্ধকার গলিতে ঢোকার পর দুটো বাড়ি পেরিয়ে চলে এসেছে চারতলা শপিং কমপ্লেক্সের সামনে। দোতলায় ছোট্ট একটা দরজার সামনে উপস্থিত হলো ওরা। তারপর আলো-আঁধারি পরিবেশে প্রবেশ করল। স্বচ্ছ নীল আলো জ্বলছে সারা হলরুমে। একপাশে বারের কাছে সারি করে বসেছে বেশ কিছু যুবক আর তরুণ। মাঝবয়সী কিংবা বয়স্ক লোকও আছে।

সায়রা স্পষ্ট বুঝতে পারছে এটা কোন ট্যুরিস্ট স্পট নয়। একনজর দেখেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। ভদ্রলোকের জায়গা হলেও হতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে কোন ভদ্রমহিলার জন্যে নয়। বেশিরভাগ লোক কোন না কোন পানীয় গলায় ঢালছে, এদের উৎসুক লোভী দৃষ্টি সেঁটে থাকল ওর ছিপছিপে দেহের ওপর। মাঝখানের আইল পেরিয়ে

ভেতরের দিকে যাওয়ার সময় পাশের টেবিল থেকে কিছু উড়ো মন্তব্য শুনতে পেল সায়রা। অজান্তে আরক্ত হয়ে গেল ওর মুখ। হাত বাড়িয়ে শওকত হাসানের বাহু চেপে ধরল। 'শওকত ভাই, কোথায় নিয়ে এলেন আমাকে?' বিড়বিড় করে অস্বস্তি প্রকাশ করল ও। 'মনে হচ্ছে এখানে না এলেই ভাল হত!'

সত্যি কথা। শওকত হাসানেরও তাই মনে হচ্ছে। জায়গাটা এরকম জানলে সায়রাকে নিয়ে আসত না। গতকাল দুপুরে জাবির মাহমুদের সঙ্গে একবার এসেছিল, তখন অবশ্য এতটা জঘন্য মনে হয়নি। স্বল্প আলোর মধ্যেও নোংরা টেবিল-ক্লথ, তেল চটচটে মেঝে এবং তারচেয়েও অস্বস্তিকর কিছু মানুষের উপস্থিতি গ্রাহ্য করার কোন বিষয় নয়, যদি না কোন ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকে; কিন্তু সায়রার উপস্থিতিতে রীতিমত বেখাপ্পা এবং জঘন্য লাগছে।

হাত বাড়িয়ে সায়রার একটা বাহু চেপে ধরল শওকত, আশ্বস্ত করতে চাইল ওকে; কিন্তু অনুভব করল নিজেও অস্বস্তি বোধ করছে। পাশের টেবিলে সরেস কয়েকটা মন্তব্য আদান-প্রদান করল তিন যুবক। না শোনার ভান করে ছড়ানো-ছিটানো টেবিলের মাঝখানের আইল ধরে এগোল ওরা।

একেবারে শেষ দিকে, কোণের একটা টেবিলে বসে আছে জাবির মাহমুদ। টেবিলের ওপর লাল রঙের পানীয়ের বোতল আর দুটো গ্লাস। ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে বসে আছে এক যুবতী। সুন্দরী, ভরাট শরীর। ওদেরকে দেখতে পেয়ে নিচু স্বরে মেয়েটাকে কি যেন বলল জাবির, তৎক্ষণাৎ টেবিল ছেড়ে চলে গেল যুবতী।

বিহ্বল দৃষ্টিতে জাবিরকে দেখছে সায়রা। এর আগে দু'বার দেখেছে তাকে, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিশ্বাসী একজন যুবক মনে হয়েছে; ফাহিম ইমতিয়াজের বাসার পার্টিতে দেখেছে পরিপাটি পোশাক আর চোস্ত আচরণে সবাইকে মুগ্ধ করেছে সে। কিন্তু শহরের "সবচেয়ে ধনী সুদর্শন এক যুবকের" নজরকাড়া বৈশিষ্ট্যের খুব কমই এখন তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। শেরাটনে থাকছে সে, অথচ প্রসিদ্ধ হোটেলটার তুলনায় এ জায়গা কত নোংরা এবং বিশ্রী; একইরকম অসঙ্গতিপূর্ণ জাবির মাহমুদের পাশে চৈতী চৌধুরীর বদলে সুন্দরী ওই যুবতীর উপস্থিতি!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাবির, ঠোঁটের কোণে আমুদে হাসি। চাহনি নিষ্প্রভ এবং ঘোলাটে। সায়রা খেয়াল করল ওর গলা আর

বুকের ওপর ঘুরে গেল তার দৃষ্টি, একটু বেশি সময়ই যেন স্থির থাকল। বিশ্বাসই করতে পারছে না দারুণ সুদর্শন সদা-পরিপাটি এই যুবক ফাহিম ইমতিয়াজের ভাই, হোক না সৎ-ভাই, অথচ দু'জনকে অবিকল ভেবেছিল ও! এ মুহূর্তে অবশ্য পরিপাটি দেখাচ্ছে না তাকে, এবং শেভও করেনি। চিবুকে ছোট ছোট দাড়ি। মাতাল হয়নি, কিন্তু ঠিক পুরোপুরি সুস্থিরও নেই, মাঝামাঝি অবস্থায় আছে।

ওয়েটার ডেকে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল সে। নিজের জন্যে জুস চেয়েছে সায়রা। ভুলেও জাবিরের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না, সচেতন তার অস্থির দৃষ্টির ব্যাপারে।

'আহ্, কল্পনাই করিনি সায়রাকে দেখতে পাব এখানে!' প্রসন্ন কণ্ঠে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল জাবির। 'এত ভড়কে যাওয়ার কি আছে, সুইটি? মাঝে মাঝে সবারই বেপরোয়া হতে ইচ্ছে করে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে!'

'কেউ কেউ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সায়রা।

হেসে উঠল সে, দারুণ আমোদ পেয়েছে ওর কথায়। 'তুমি আসলেই সায়মার মত–সাহসী, জেদী। ও-ও কিন্তু এখানে আসতে পরোয়া করত না। বনেদী ঘরের স্ত্রী হলে কি হবে, ফুর্তি করার জন্যে যে কোন জায়গায় চলে যেত, আমার ভাইকে বিন্দুমাত্র আমল দিত না।'

'তাই?'

'এখানকার সবাই চিনত ওকে। এমন সুন্দরী মেয়ে যে সচরাচর এখানে আসে না! বহুদিন পর ওর মত সুন্দরী কেউ এল। হয়তো ওর চেয়েও সুন্দরী–তোমার কথা বলছি, তুমি সত্যিই অপরূপা, সায়রা।' ঝুঁকে এল সে, ফলে সায়রার মুখ থেকে তার মুখটা মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকল। জাবিরের নিঃশ্বাসের সঙ্গে মদের তীব্র গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করল সায়রা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরিয়ে নিল ও, দেখল প্রায় মাতাল হলেও সেটা খেয়াল করেছে জাবির। মুহূর্তে কুৎসিত হয়ে গেল মুখ, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের পেশী।

মানুষটা সে মোটেই সুবিধের নয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছল সায়রা, সহজে তাকে ঠকাতে পারবে না কেউ। নাছোড়বান্দা শত্রু হতে পারে সে যে কারও। অজান্তে শিউরে উঠল ও, যেহেতু জানে ফাহিমের সঙ্গে তলে তলে শত্রুতা আছে জাবিরের। দু'ভাইয়ের আসলে হয়েছে কি? শওকত হাসানের ধারণাই কি ঠিক, সায়মার কারণেই দুই ভাইয়ে শত্রুতা?

শওকত হাসান যেন এসবের ব্যাপারে একেবারেই অসচেতন, কিংবা গ্রাহ্য করছে না। 'জাবির, সায়রাকে তোমার ভাই সম্পর্কে বলো।'

'আমার ভাই!' বিদ্রূপের স্বরে বলল সে। 'সবাই বলে বিখ্যাত ফাহিম ইমতিয়াজ, কিন্তু আমি বলি জারজ! ও মনে করে সত্যিই আকাশ-ছোঁয়া খ্যাতি ওর, ইচ্ছে করলে যে কোন কিছু কিনতে পারে। কিন্তু দেখো, আমাকে কিনতে পারবে না, কোন কালেই পারবে না। ওর ভেতরের খবর তো জানি আমি! এখানে এমন কিছু খবর আছে,' কপালে টোকা মেরে বোঝাল জাবির। 'যা প্রকাশ পেলে লোকজন থুথু মারবে ওর মুখে! ঠিক এজন্যেই ইচ্ছে করলে মুঠোর ভেতর ওকে ঢুকিয়ে রাখতে পারি আমি!'

'কি বলছেন এসব?' প্রায় বিতৃষ্ণার সঙ্গে প্রশ্নটা করল সায়রা। 'কিভাবে ফাহিম ইমতিয়াজকে মুঠোর ভেতর ঢোকাতে পারবেন?'

'নেভার মাইন্ড, হানি! তাড়াহুড়োর কি আছে, রয়ে-সয়ে বলব না হয়। ঝোলায় অনেক খবর আছে, সব যদি একবারে জানিয়ে দেই তাহলে মজাটা কোথায়?

'তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হঠাৎ ওর ওপর কেন খেপে গেছি। যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কয়েক বছর ধরে ওকে জমা-খরচ দিয়ে চলতে হচ্ছে আমার। কিন্তু কেন দেব? শুধু বড় ভাই বলেই কি আমার ওপর মাতব্বরি করবে? তারপরও মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছিলাম, শুধু ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

'বাবাকে রাজি করাতে অসুবিধে হয়নি আমার। ঢাকার ব্যবসা আমার হাতে চলে আসবে আর চট্টগ্রামে ফিরে যাবে ফাহিম। সবকিছু প্রায় ঠিকঠাক, কিন্তু হঠাৎ করে বাবার সঙ্গে দেখা করল ও। তাতেই আচমকা পাল্টে গেল সবকিছু! তারপর থেকে জাবির মাহমুদের কোন কথাই শুনতে পারে না বাবা। এটা কি অন্যায় নয়? পণ করেছি কোন একদিন আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নেব, এবং সেই দিনটার আর বেশি দেরিও নেই!'

'তোমার কি মনে হয়, সায়মাকে খুন করেছে ফাহিম?' সরাসরি জানতে চাইল শওকত হাসান, বুঝতে পারছে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে আউট হয়ে যাবে জাবির, অথচ এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আর প্রতিশোধের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত সে।

শ্রাগ করল সে। 'ওকে যমের মত ভয় পেত সায়মা, অন্তত শেষ দিকে। আমাকেও তাই বলেছে। লোকজনের সামনে আদর্শ স্বামীর মত আচরণ করলেও ওরা যখন একা হয়ে পড়ত, সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করত ফাহিম। ঈর্ষা আর ক্ষোভের আগুনে পুড়ত সে। প্রায়ই মারধর করত সায়মাকে।'

ঈর্ষাকাতর একজন স্বামী বা প্রেমিক হতে পারে ফাহিম, এটুকু পর্যন্ত বিশ্বাস করতে রাজি আছে সায়রা। কিন্তু কোন মহিলার গায়ে হাত তুলবে? ওর অন্তত বিশ্বাস হচ্ছে না। মানুষটা দারুণ অহঙ্কারী, অভিমানী এবং একরোখা। অন্যের কৃপা হয়ে থাকতে ঘৃণা করে এসব মানুষ এবং নিজের যা আছে তা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করতেও অপছন্দ করে। যে কোন লোক বা মহিলা, একবার ওর বিশ্বাস ভঙ্গ করলে দ্বিতীয় সুযোগ আর পাবে না। সায়মাও নিশ্চই পায়নি। কিন্তু তারপরও মানতে পারছে না শারীরিক ভাবে কোন মেয়েকে আঘাত করতে পারে সে। এসব আসলে জাবিরের কল্পনাপ্রসূত, রাগ আর বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ, ধরে নিল ও। হয়তো জাবির মাহমুদের ধারণায় শারীরিক আঘাতই কোন মহিলার জন্যে চরম অপমান, কিন্তু সায়রার ধারণা মানসিক আঘাত এরচেয়েও বেশি অপমানের, বেশি বেদনার।

সত্যিই কি জাবিরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সায়মার? এই প্রথম ধারণাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে ও, যাচাই করতে ইচ্ছে করছে। সত্যিই যদি এমন কিছু ঘটে থাকে, জানার পর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে ফাহিমের? নাকি শওকত হাসানের ধারণাই ঠিক, ফাহিম অন্য কোন ভাবে জেনে যাওয়ার আগে নিজ থেকেই তাকে জানানো সঠিক মনে করেছিল সায়মা?

সায়মা আধুনিকা, খোলামেলা মনের মেয়ে ছিল, ছোট থেকেই দেখেছে সায়রা। পুরোপুরি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন না করলেও একাধিক বন্ধু ছিল ওর এবং কলকাতায় থাকতে কয়েকটা অ্যাফেয়ার করেছে। ছোট বোনকে সবকিছু বলতে দ্বিধা ছিল না সায়মার, যদিও পরিবারের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও জানত না এসব। ওর মত স্বাধীনচেতা মেয়ের পক্ষে বাড়িতে ঘরকন্নার কাজ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া কিংবা একজন পুরুষের একান্ত বাধ্য হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া সত্যিই কঠিন ছিল, স্বামী হিসেবে যেই থাকুক। নিজে দারুণ সুন্দরী ছিল ও, চাইত পুরুষরা সবসময় ঘিরে থাকুক ওকে। পছন্দমত সঙ্গী বাছাই করত

সায়মা, ওর জন্যে উপভোগ্য ব্যাপার ছিল এই ক্ষমতা; এবং এই মানসিকতাই সর্বনাশ করেছে ওর, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে সায়মা। হয়তো নিজের অজান্তেই স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে, বিশ্বাস এবং ভালবাসা নষ্ট করেছে।

নিজের কথা ভাবল সায়রা। ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গে বিয়ে হলে কতটা খুশি হবে ও? পৃথিবীতে এরচেয়ে আনন্দের ব্যাপার বোধহয় নেই, অন্তত ওর জন্যে। অথচ সায়মা কখনোই ব্যাপারটাকে এভাবে দেখবে না। বিশ্বস্ত থাকতে রাজি সে, কিন্তু কখনোই ঘরের কোণে পড়ে থাকবে না। বোধহয় ভালবাসার গভীরতাই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়, আনমনে সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও।

'আপনি যদি মনে করেন সত্যিই সায়মাকে খুন করেছে ফাহিম ইমতিয়াজ, পুলিশকে সবকিছু খুলে বলছেন না কেন?' ধীরে ধীরে প্রশ্নটা করল সায়রা।

'আমাকে বিশ্বাস করবে কে? সবাই মনে করবে ঈর্ষাকাতর হয়ে অভিযোগ করছি, আমাদের সম্পর্কটাই তো সন্দেহ করার মত। সবাই জানে ব্যবসায় আমার চেয়ে ভাল করছে ফাহিম। উঁহুঁ, ওভাবে হবে না···এরচেয়ে সরেস পরিকল্পনা আছে আমার। শিগ্‌গিরই উচিত শিক্ষা দেব ওকে!'

ঈর্ষা আর বিদ্বেষের অনলে পুড়ছে মানুষটা, প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখছে–জাবির সম্পর্কে শওকত হাসানের মূল্যায়ন। সফল বা ব্যর্থ যাই হোক, তাতে কিছুই আসে-যায় না; ওর দরকার কিছু তথ্য। যে অবস্থায় আছে জাবির, আজ আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, ভাবল সাংবাদিক। কেটে পড়ার ধান্ধা করতে হয় এবার। জায়গাটাকে প্রায় নরকের মত জঘন্য মনে হচ্ছে।

'সিদ্ধান্ত নিয়েছি কাপ্তাই যাব,' চিন্তিত স্বরে বলল শওকত, ওর ধারণা দুর্ঘটনা যেহেতু কাপ্তাইয়ে ঘটেছে, সব রহস্যের মূল ওখানেই। 'দু'একদিন থাকব। দেখা যাক, কোন খবর বের করতে পারি কিনা। সায়রা, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ তো?'

'না,' তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল সায়রা, উঠে দাঁড়াল। 'শওকত ভাই, চলুন।'

'কিন্তু···' উৎসুক দৃষ্টিতে জাবিরের দিকে তাকাল শওকত, আশা করছে কাপ্তাই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবে সে, নিদেনপক্ষে দু'একটা

পরামর্শ দেবে। কিন্তু জাবিরের আধ-খোলা চোখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি, চাহনি ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। টেবিলের ওপর প্রায় নেতিয়ে পড়েছে সে; মন্তব্য করবে কি, আসলে কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ করার মত সচেতনতাই নেই।

'প্লীজ, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়!'

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল শওকত হাসান।

দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাল সায়রা। জাবির মাহমুদের আপাত বিধ্বস্ত কাঠামোর মধ্যেও যেন অশুভ একটা শক্তির অস্তিত্ব ঠিকরে বেরোচ্ছে। শিউরে উঠল ও। ঈর্ষা, বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসা কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষটাকে। ভাইকে স্রেফ বাউণ্ডুলে টাইপের যুবক মনে করে ফাহিম, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কি জানে যে আসলে ওরই ক্ষতি করার জন্যে কতটা অসন্তোষ আর বিদ্বেষ বয়ে বেড়ায় সে?

রাস্তায় বেরিয়ে আসতে শীতল বাতাস লাগল গায়ে, স্বস্তি আর প্রশান্তি বোধ করল সায়রা।

'জানতাম না এরকম অভিমানী হয়ে উঠবে তুমি!' কিছুটা অসন্তোষের সঙ্গে অভিযোগ করল শওকত হাসান।

'কেন করব না? আপনি কি বুঝতে পারছেন না স্রেফ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে ফাহিম ইমতিয়াজের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে সে? যদি ভেবে থাকেন, এ ব্যাপারে জাবির মাহমুদকে সাহায্য করব আমি, মিথ্যে আশা করেছেন! আমার-আপনার কাছে এটাই আশা করছে সে, কথাগুলো এজন্যেই বলেছে।

'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে আপনিও অসঙ্গতিটা ধরতে পারবেন, শওকত ভাই। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে ফাহিম ইমতিয়াজকে চরম ঘৃণা করে জাবির মাহমুদ, প্রথম দিন দেখেই টের পেয়েছি আমি। কিন্তু এছাড়াও, আরও কিছু আছে বোধহয়, স্রেফ ব্যবসার কর্তৃত্ব হারিয়ে খেপে যাওয়া অস্বাভাবিক। হয়তো সায়মার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এসবের, একেবারে ভিন্ন কিছু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আপনাকে ব্যবহার করছে সে, নিজের স্বার্থে এবং ফাহিম ইমতিয়াজের ক্ষতি করার জন্যে! কিন্তু আমাকে ব্যবহার করতে পারবে না!' থেমে শওকত হাসানের দিকে তাকাল ও। 'সায়মার মৃত্যুর রহস্য নতুন করে ঘোলাটে করে তুলতে চাইছে সে, সলতেটা আপনিই উস্কে দিয়েছেন। ফাহিম ইমতিয়াজ ভুগবে সেজন্যে, যদি ও নিরপরাধও হয়। আগুন ছাড়া ধোঁয়ার জন্ম হয় কখনও? যদি তাই হয়, তাহলে ঠিকই

ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে জাবির মাহমুদ।'

'সায়রা, আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো সত্যিই প্রেমে পড়েছ!' প্রায় অবিশ্বাস সাংবাদিকের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, সত্যি,' নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করল ও। 'জানি না এত কম সময়ের মধ্যে কি করে সম্ভব হলো সেটা, কিন্তু হয়েছে এবং সেজন্যে মোটেই অনুতপ্ত বা লজ্জিত নই আমি। ফাহিম ইমতিয়াজ সত্যিই দারুণ মানুষ, ওর ভাইয়ের চেয়ে হাজার গুণ ভাল মানুষ। জাবির মাহমুদের সঙ্গই বিষাক্ত মনে হয় আমার কাছে, নিজেকে নোংরা মনে হয় কাছে গেলে। আজকের অভিজ্ঞতা কিংবা যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল সে, আমার মনে হয় জীবনেও ভুলতে পারব না আমি!'

'এত নাটক করার দরকার নেই,' গম্ভীর, শীতল সুরে বলল শওকত। 'সত্য উদ্ঘাটন করা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি আমি। খোদার কসম, তাই করব আমি, সেজন্যে কাপ্তাই কেন, দুনিয়ার অন্য প্রান্তে যেতে হলেও তাই করব!'

আট

পরদিন সকালে কাপ্তাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিল শওকত হাসান। পরিচিত মানুষটা চলে যাওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো সায়রার। খানিকটা বিষণ্ন লাগলেও জানে সাংবাদিকের অভাব বোধ করবে না। ইতোমধ্যে গেস্ট হাউজে আসা এক দম্পতির সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে ওর। পাটনা থেকে এসেছে এরা, বাঙালী। তাছাড়া এবার নিজের ইচ্ছেমত ঘুরে-ফিরে দেখতে পারবে ভেবে কিছুটা সন্তুষ্ট বোধ করল ও।

খারাপ আবহাওয়াও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ওর আনন্দের মাঝে। শীত পড়ছে বেশ, বৃষ্টির পরপরই যেন খেপে গেছে প্রকৃতি। খবরে শুনেছে মেঘালয় আর আসামে তিনজন মানুষ মারা গেছে, বাংলাদেশে দিনাজপুরেও মারা গেছে একজন।

সন্ধেয় গেস্ট হাউজ থেকে ওকে তুলে নেওয়ার কথা ফাহিমের। কিন্তু সকালেই চৌধুরী লজে চলে এসেছে সায়রা। জানে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে বরং প্রভার সঙ্গই বেশি ভাল লাগবে ওর।

ফাহিম অফিসে আছে। সুযোগ হলে দুপুরে আসবে, জানিয়েছে হাম্না রহমানকে। সায়রা আসতে পারে ভেবে অনুরোধ করেছে বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখতে পারে ও, কিংবা স্টাডিতে বসে বইপত্র পড়তে পারে।

কি নির্দেশ দিয়েছে সে চাকরদের, কে জানে! কিন্তু এদের খাতিরের আতিশয্যে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছে সায়রা। স্বয়ং হাম্না রহমান পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলছেন ওর সঙ্গে, এমন নয় যে আগে ওর সঙ্গে রূঢ় বা নিস্পৃহ আচরণ করেছেন তিনি। আসলে কোথাও একটা নাড়া দিয়েছে ফাহিম ইমতিয়াজ, সম্ভবত মহিলাকে জানিয়েছে ওদের সম্পর্কের কথা। তাতেই বদলে গেছে সবকিছু। প্রভা সহ ওকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন পুরো বাড়ি। ফাহিমের নির্দেশ, আপত্তি করায় স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি। তবে প্রভাও আগ্রহী। "আন্নি"র সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে দারুণ উৎফুল্ল। দেখার পর থেকে সেই যে কোলে উঠেছে, আর নামছেই না।

বাড়িটা বিশাল। একতলায় দুটো লাউঞ্জ, বিশাল ডাইনিংরুম ছাড়াও দুটো গেস্টরুম রয়েছে। প্রভার নার্সারিটা একপাশে। পাশেই হাম্না রহমানের বেডরুম। দোতলায় ফাহিমের স্টাডি-কাম-লাইব্রেরি, পাশে বেডরুম। ঠিক উল্টোদিকে প্রভার ঘর। বাপ-মেয়ের ঘরের উল্টোদিকে একটাই, কিন্তু দীর্ঘ ব্যালকনি।

দেখার খুব একটা ইচ্ছে নেই ওর। যে কোন বেডরুমই আসলে মানুষের ব্যক্তিগত জায়গা, নিজস্ব একটা ভুবন। সেখানে উঁকি দেওয়া অনুচিত।

ফাহিমের বেডরুম দেখেই বোঝা যায় পুরুষের ঘর। মেঝেয় সাদা আর হালকা সবুজ রঙের মিশেল মোজাইক, আসবাবপত্র সবই আধুনিক, কিন্তু যতটা না হাল-ফ্যাশনের বরং তারচেয়ে কার্যকরী। ডাবল খাট থাকলেও মনে হয় না সায়মা কখনও ঘুমিয়েছে এখানে, কারণ পুরুষালি কোন কামরায় ঘুমানো দারুণ অপছন্দ করত ও, জানে সায়রা।

কামরাটা ফাহিম ইমতিয়াজের চরিত্রের ভিন্ন একটা দিক তুলে

ধরছে। অ্যান্টিক ফার্নিচার, সায়মা কিংবা প্রভার ছবি আশা করেছে ও, কিন্তু কোথাও তেমন কিছু নেই। একেবারে সাদামাঠা কামরা; নীরব, শান্তিপূর্ণ। ওপাশের জানালা দিয়ে পেছনের বাগান আর তারও পেছনে ব্যস্ত রাস্তা চোখে পড়ছে। দূরে লেকের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সায়রা। মানুষটা একেবারে সাদামাঠা, অন্তত তার বেডরুম দেখে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষটাকে সত্যিই চিনতে পেরেছে কিনা, আনমনে ভাবল ও। এই সেদিনের পরিচয়, ক'দিন হলো? অথচ একে কিনা নিজের হৃদয় উপহার দিয়ে বসেছে!

করিডরে বেরিয়ে আসতে ফোনের শব্দ শুনতে পেল ও। হলরুম থেকে ফোন রিসিভ করলেন হাস্না রহমান, কয়েকটা কথা বলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন রিসিভারটা। 'তোমার সঙ্গে কথা বলবে ও—ফাহিম,' হেসে জানালেন মহিলা।

'হ্যালো?'

কণ্ঠটা শুনেই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল ওর।

'বলুন।'

'দেব একটা গাট্টা!' ওপাশে ধমকে উঠল ফাহিম। 'এরইমধ্যে ভুলে গেছ সব? তোমাকে দেখছি নতুন করে শেখাতে হবে...'

'হাস্না খালা আছেন...'

'তাতে কি? অন্যদের সামনে বিব্রত হচ্ছ কেন? তার মানে...আসলে এখনও তোমার কাছে...'

সায়রা বুঝতে পারল আসলে কি বলতে চায় ফাহিম। 'না, প্লীজ!' দ্রুত বাধা দিল ও। 'বলো, শুনছি আমি।'

'কেমন আছ?'

'ভাল। তোমার কণ্ঠ শোনার পর আরও ভাল হয়ে গেছি!'

'সত্যি? আবার বলো!'

'কিভাবে জানলে এখানে আছি আমি?'

'জানতাম না, তবে আন্দাজ করেছি। দুঃখিত, সায়রা। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। ফাইলের স্তূপের মধ্যে নাক ডুবিয়ে রেখেছি।'

'সমস্যা?'

'হ্যাঁ, সে তো থাকবেই। নেভার মাইন্ড। দুপুর পর্যন্ত থাকছ?'

'উঁ...থাকব, যদি তুমি আসতে পারো।'

'কিন্তু আমি যে আসতে পারব না! বিকেলের দিকে ছাড়া পাব।

ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাব বোধহয়। প্লীজ, থাকো ততক্ষণ! প্রভা খুব খুশি হবে।'

'তুমি?'

'আমি? আমি তো স্বপ্ন দেখছি, সায়রা–দিবা-স্বপ্ন এবং ফাইলের মধ্যে নাক ডুবিয়ে! ...সত্যিই ব্যস্ত থাকব, হানি!'

'নিশ্চই, তোমার কাজ তো সারতে হবে।'

খুশি হলো ফাহিম। একজন পুরুষের কাজের প্রতি প্রিয় মানুষটির দৃষ্টিভঙ্গি যদি নেতিবাচক হয়, তাহলেই সমস্যা। সম্পর্কের শুরুতেই এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি চায় না ও। সায়রা অন্তত এ দিকটা উদার দৃষ্টিতে দেখছে, ভেবে সন্তুষ্টি বোধ করল।

'গেস্ট হাউজে যাব একবার,' সায়রা তখন বলছে ফোনে। 'কাপড় বদলাতে হবে। জিন্স আর শার্ট পরে এতক্ষণ থাকতে পারব না।'

'আমি জানি এই কাপড়েও দারুণ লাগছে তোমাকে! খুব বেশি ঝামেলা করতে যেয়ো না, স্রেফ খানিকক্ষণ ঘুরব আমরা।'

'শাড়ি পরব। চলবে না?'

'নিশ্চই। মেয়েদের শাড়ি পরা দেখতেই ভাল লাগে আমার।'

'মনে রাখার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে। সন্ধেয় দেখা হচ্ছে তাহলে? আই লাভ ইউ!'

'লাভ ইউ!' রুদ্ধ কণ্ঠে বলল সায়রা, নিচু ফিসফিস করে। কিন্তু জানে ওপাশে ফাহিম ঠিকই শুনতে পেয়েছে শব্দগুলো। সারা শরীরে সীমাহীন আনন্দ অনুভব করছে, তিনটি শব্দ মধুর প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে শরীরে। ওপাশে ফোন ছেড়ে দিয়েছে ফাহিম, কিন্তু এদিকে ধরেই রেখেছে সায়রা। ঘোর কাটেনি ওর। ক্লিক্ শব্দে লাইন কেটে গেল, ডায়াল টোনের টানা শব্দ শোনা গেল। শেষে, আড়চোখে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা হাস্না রহমানের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে আভা ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে।

'শেষপর্যন্ত বোধহয় চাকুরীটা হারাব আমি?' কৌতুক মহিলার কণ্ঠে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'কেন?'

'মনে হচ্ছে সিনডারেলা মা-র খোঁজ পেয়ে গেছে প্রভা। মা পেলে আমাকে আর দরকার হবে ওর?'

কি বলবে ভেবে পেল না সায়রা। দৃষ্টি নিচু হয়ে গেছে।

ওকে উদ্ধার করতে হাস্না রহমান নিজেই এগিয়ে এলেন। 'কফি খাবে? কিছু মনে কোরো না, খানিকটা মজা করেছি। কি জানো, এ বাড়িটা এতদিন শূন্য মনে হত আমার, কিন্তু এখন···রীতিমত উৎসবপূর্ণ মনে হচ্ছে!'

Suvom

দিনটার শুরু হয়েছিল আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। হলোও তাই। সায়রার মনে হলো ওর জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় একটা সন্ধে কাটাচ্ছে। ফাহিমের কথা মনে রেখে একটা নীল শাড়ি পরেছে। হালকা প্রসাধন করেছে। কিন্তু ফাহিম যখন ওর সামনে এসে দাঁড়াল, পুরুষটির চোখে ঘোর আর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখতে পেল।

এগিয়ে এসে ওকে বেষ্টন করল ফাহিম, আলতো চুমো খেল কপালে।

'পাঁচ মিনিট লাগবে। কাপড়টা বদলে বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

বাপের কণ্ঠ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে প্রভার। ওপরে এসে ওকে কোলে তুলে নিল সায়রা। এই ফাঁকে কাপড় বদলাতে নিজের বেডরুমে চলে গেল ফাহিম। ফিরে এসে দেখল সায়রার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রভা। হাস্না রহমান প্রভাকে শুইয়ে দিতে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় জানতে চাইল সায়রা।

'ইচ্ছেমত ঘুরব। বাইরের কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে তারপর ফিরব।'

'রাত হবে যে!'

'হলেই বা কি!'

রিকশায় উঠল ওরা। সংসদ ভবনের পেছনে চন্দ্রিমা উদ্যানে লেকের পাশে হাত ধরাধরি করে হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল সিঁড়িতে। লেকের ওপাশে বাগানটা ফ্লাড লাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কৃত্রিম লেকের পানিতে ঢেউ তুলেছে শীতল বাতাস, আর ঢেউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে পাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে পড়া আলো। শীত লাগছে সায়রার। পরনের শালটা গায়ে ভাল করে চাপিয়ে দিল ও। পাশ থেকে ওর কোমর চেপে ধরল ফাহিম, ঘনিষ্ঠ হয়ে এল আরও।

'বাদাম খাবে?'

'খাব।'

বাদামঅলাকে ডেকে পাঁচ টাকার বাদাম কিনল ফাহিম। একটাও

স্পর্শ করতে দিল না সায়রাকে। খোসা ছাড়িয়ে মুঠো ভর্তি বাদাম তুলে ধরল ওর মুখের সামনে। 'হাঁ করো!'

'আমি নিজেই তো খেতে পারি।'

'উঁহুঁ, হাঁ করো।'

হাঁ করল সায়রা। সবক'টা বাদাম ওর মুখে পুরে দিল ফাহিম। চিবাতে গিয়ে মুখ ভরে গেল সায়রার। 'এভাবে কখনও বাদাম খাইনি। অদ্ভুত! তবে একটা একটা করে ছিলে খেতেই মজা বেশি।'

'কোন জিনিসই আসলে চট করে নিতে নেই।'

'তুমি কি অন্য কিছু বোঝাতে চাইছ?'

'ভাবছি আসলে তুমি সায়মার চেয়ে কত আলাদা!'

বোনের প্রসঙ্গ ওঠায় আড়ষ্ট হয়ে গেল সায়রার দেহ। 'জানি না আমি। তবে ও যে আমার চেয়ে সুন্দরী ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'ঠিক এরকম কিছু মীন করিনি আমি, এবং কথাটা পুরোপুরি সত্যিও নয়। বাহ্যিক দিক থেকে হয়তো ওকেই বেশি সুন্দরী মনে হত, কিন্তু এর পুরোটাই মেকি। নিয়মিত প্রসাধন করত ও, চুলে রঙ দিত কিংবা নখও ম্যানিকিউর করত। তাছাড়া, ও জানত কিভাবে পুরুষদের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে হবে, মেয়েদের নিজস্ব কিছু সম্পদ আছে–সেগুলোই ব্যবহার করত।'

'মডেল হিসেবে নিজের আবেদন ধরে রাখবে ও, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'আগেও বলেছি, ওর পক্ষে সাফাই গাওয়ার দরকার নেই। ওকে তোমার চেয়েও ভাল করে চিনেছি আমি। কিন্তু তখন তো আর মডেল ছিল না সায়মা, আমার স্ত্রী ছিল। আর যাই হোক, প্রসাধন এবং আলগা সৌন্দর্যের মোড়কে আমার বউ একটা গিফ্‌টের প্যাকেটে রূপান্তরিত হোক কিংবা কোন পার্টিতে উপস্থিত হোক, তা চাইনি আমি।'

হয়তো পরিবেশের কারণে, চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বলেই, মন খুলে কথা বলছে ওরা; অন্য সময় হলে যা সম্ভব হত না। রাস্তা দিয়ে হুশ-হাশ করে চলে যাচ্ছে গাড়িগুলো, ফুটপাতে হাঁটছে লোকজন কিংবা সিঁড়িতে বসে গল্প করছে; ফেরি করছে ফেরিঅলারা। কোন কিছুই ওদের মনোযোগে চিড় ধরাতে পারছে না, পরস্পরের উপস্থিতি এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

'তারপরও ওকে ভালবেসেছ তুমি, তাই না?'

সিগারেট ধরাল ফাহিম। খানিকক্ষণ বোধহয় প্রশ্নটা নেড়ে-চেড়ে দেখল নিজের মনে। ম্লান আলো পড়েছে মুখে, প্রতিটি ভাঁজ আর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'হয়তো সত্যিই ভালবাসতাম,' নিচু স্বরে বলল ফাহিম। 'শুরুতে তো প্রায় বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম ওকে পাওয়ার জন্যে। আচমকা আমার জীবনে আসল ও, ঝড় যেমন আসে–সবকিছু নাড়া দিয়ে, চমকে দিয়ে। আমার ধারণা ছিল সামলাতে পারব ওকে, আমার জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। কিন্তু পারিনি, বরং নিজের সর্বনাশ নিজেই করলাম।

'তোমার হয়তো খারাপ লাগতে পারে, সায়রা, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, বরাবরই খুব স্বার্থপর ছিল সায়মা। ভালবাসা আসলে কি? একটা শরীর আর মনের সম্পূর্ণ অধিকার, কেবলই এই? নিশ্চই নয়। কেউ আমার ওপর নির্ভর করে, তার ভাল-মন্দ সবকিছুর অধিকার আমার, বিনিময়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি তারও থাকবে। এটাই তো দাম্পত্য জীবনের সমঝোতা, তাই না? আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সত্যিকার ভালবাসা দূরে থাক, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে সামান্য বোঝাপড়াও অবশিষ্ট থাকেনি। পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে পড়লাম আমরা। সম্পর্কটা জোড়া লাগল না আর। আসলে ওটা ভালবাসা ছিল না, এক ধরনের মোহ বোধহয়। এখন বুঝেছি ভালবাসা কি।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখন। তোমাকে দেখে বুঝেছি। ভালবাসা কি, বোধহয় আমার চেয়ে বেশি বুঝবে না কেউ, কারণ একবার ঠকেছি আমি। ধরতে শিখেছি কোন্‌টা ভান, কোন্‌টা সত্যিকার নিঃস্বার্থ আবেগ। চৈতীকে তাই কখনোই পাত্তা দেইনি, কিন্তু তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে এ মেয়েকে না পেলে চলবে না আমার···যেভাবেই হোক একে জয় করব আমি!'

'কখনও মনে হয়নি আবারও ঠকবে? আমি তো সায়মার বোন, ওর মত হওয়াই তো স্বাভাবিক!' সহাস্যে জানতে চাইল সায়রা, মনে মনে অবশ্য অন্য কথা ভাবছে–একই কথা বোধহয় জাবিরের ক্ষেত্রেও বলা যায়, উচ্ছৃঙ্খল জীবনই বেপরোয়া করে তুলেছে তাকে, ঠিক সায়মার মত।

'না,' পাশ ফিরে সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল ফাহিম। 'কারণ এখানে সত্যিকার ভালবাসা খুঁজে পেয়েছি আমি, বিশ্বাস দেখেছি। জানি ওগুলো ভান করতে জানে না।' মুহূর্তের বিরতির পর যোগ করল: 'তবে ওই চিঠিটা পাওয়ার পর ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম···

'কিছু বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে আমাদের। বাইরে থেকে যাই দেখাক, আমি আসলে একরোখা মানুষ, সায়রা। যাকে ভালবাসি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে চাই, তার বিশ্বাস চাই, নির্ভরতা চাই···তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে এ মেয়ে আমাকে বুঝতে পারবে, আমার সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে, আমাকে অনুপ্রেরণা দেবে···আমার সবকিছুই নিজের করে নেবে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল সায়রা।

'বাকি যা কিছু···সেজন্যে তোমাকে বদলে ফেলতে চাই না আমি, জোর করেও আমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাই না। কিন্তু জীবন সঙ্গিনীর কাছ থেকে একশো ভাগ বিশ্বস্ততা আশা করি।'

'সায়মা কি···'

প্রশ্নটা শেষ করল না সায়রা, তবে ফাহিম ঠিকই বুঝে নিল। ক্ষণিকের জন্যে ভাবল কি যেন। 'পারেনি,' মাত্র একটা শব্দে উত্তর দিল। 'অন্যদের কথা জানি না, আমি অন্তত অবিশ্বাসী কোন মেয়েকে ভালবাসতে রাজি নই।'

'সায়মার কারণেই এসব বলছ?'

'হ্যাঁ, দুঃখজনক হলেও সবই সত্যি।' ওর একটা হাত তুলে নিল সে। 'আমার দিকে তাকাও।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার চেয়ে আট বছরের বড়। ব্যবধানটা হয়তো একটু বেশি। চার বছর বয়সী একটা মেয়ে আছে আমার···'

'ওকে আমি ভালবাসি!' দ্রুত হয়ে উঠেছে সায়রার হৃৎস্পন্দন।

'জানি, সায়রা। স্ত্রী হিসেবে তোমাকে চাই আমি। কিন্তু তুমি কি···'

'মনে হয় না আমার জন্যে এরচেয়ে ভাল কিছু হতে পারে।'

'তুমি কি নিশ্চিত? এর মানে হচ্ছে নিজের পরিবার, বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকতে হবে তোমার···হয়তো মাঝে মধ্যে কলকাতায় যেতে পারব আমরা···'

'আগেই কেন নেতিবাচক দিকগুলো চিন্তা করছ?' ফিসফিস করে

বলল ও। 'বুঝতে পারছ না, তুমি যেখানে থাকবে সেখানে থাকতেই ভাল লাগবে আমার?'

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, বলতে গেলে আমাকে চেনোই না তুমি। এই সেদিন পরিচয় হলো আমাদের...পরিচয়ের সাত দিনের মাথায় তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি, নিশ্চই মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার! তুমিও দেখছি কম যাও না—এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছ!'

'তুমি কি প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিচ্ছ?' দ্রুত বলল সায়রা, মেকি বিদ্রূপ প্রকাশ পেল কণ্ঠে: 'প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নেওয়ার সাহসও কোরো না! কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, আবার পরক্ষণে মত পাল্টে ফেলবে, এ কেমন কথা?'

'মত বদলাইনি। তোমাকে চাই আমি...কিন্তু আমাকে ঠিকমত চেনোও না তুমি, সায়রা। আমার বদমেজাজ সম্পর্কে জানো না, জানো না একটুতেই অধৈর্য হয়ে উঠি, একগুঁয়ে এবং জেদী...'

'সবসময় কি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকতে পারে সবাই? আমিও তেমন নই, সত্যি বলছি। পছন্দমত জিনিস না পেলে বা না ঘটলে আমিও বোকার মত একগুঁয়ে হয়ে পড়ি, অভিমান করি...'

'অভিমানীদের কিভাবে সামলাতে হয়, জানা আছে আমার,' কিছুটা হালকা সুরে বলল ফাহিম। মুখ নামিয়ে কানে কানে বলল কি যেন, কিন্তু শোনার আগেই কানে দু'হাত চাপা দিল সায়রা। লজ্জায় মুখ, এমনকি কান দুটো পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে ওর; মনে হচ্ছে মুখে গরম রক্ত বইছে। কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না নিদারুণ ভাল-লাগার অনুভূতি সারাক্ষণ ছেয়ে আছে ওকে।

'ভাবতেই অদ্ভুত লাগছে! কি উদ্দেশ্যে এসেছি, অথচ জড়িয়ে গেলাম প্রভার সঙ্গে...বাঁধনটা ছিঁড়তে পারব না আমি!'

'শুধুই প্রভার সঙ্গে?' ফাহিমের স্বরে কৌতুক।

'নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরের একজন মানুষ, ফাহিম...আমি বোধহয় সত্যিই আধুনিক সিনডারেলা, নইলে কিভাবে এমন স্বপ্ন দেখছি? তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয়?'

ধাঁই করে চাঁটি মারল ফাহিম। আঁতকে সরে গেল সায়রা, কিন্তু ওকে কাছে টেনে নিল সে। 'আমার যা কিছু আছে, সবকিছুর বিনিময়ে তোমার হৃদয় কিনেছি...ওই কোমল হৃদয়টা শুধুই আমার! মাত্র একটা

হৃদয়, কিন্তু দেখো ওটা কিনতে নিঃস্ব হয়ে গেছি! এত মূল্যবান যার হৃদয়, তার কি নিজেকে ছোট ভাবা উচিত?'

স্মিত হাসল সায়রা, পুলকিত। 'আমাকে কি গ্রহণ করবে তোমার বাবা-মা?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। সায়মাকে কিন্তু খুবই পছন্দ করতেন ওঁরা, প্রভাকেও করেন। সায়মার বোন বলে বাড়তি সুবিধে আছে তোমার···আর, আবার বিয়ে করব শুনলেই খুশি হবেন ওঁরা। যার জন্যে রাজি হলাম, তাকে কেন মেনে নেবেন না?'

'ভিনদেশের একটা মেয়ে···'

'ভিনদেশী একটা মেয়েকে আগেও মেনে নিয়েছেন ওঁরা।'

'আবার নেবেন? সায়মার সঙ্গে তোমার সুখের সংসার হয়নি···'

'হাজারবার নেবে!' অধৈর্য স্বরে বলল ফাহিম।

'বাব্বা! তারমানে হাজারটা বিয়ে করতে চাও তুমি?'

হেসে উঠল ফাহিম, উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। 'চলো, খিদে পেয়েছে।'

উঠল ওরা। একটা ক্যাব পেয়ে গেল। ধানমন্ডির দিকে এগোল গাড়ি। সাতাশ নম্বরের শুরুতেই প্রসিদ্ধ "ব্লু লেগুন"। রেস্তোরাঁর গেটে নামল ওরা, ভেতরে ঢুকে ছোট্ট লন ধরে এগোল।

চারপাশে রঙিন বাতির আলোকসজ্জা, তারই আলোয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল দু'জনেই। দ্রুত ওদের পাশ কাটিয়ে গেল সে, সাদা একটা করোনায় উঠল। গতকালের চেয়ে অনেক বেশি ভদ্র মনে হচ্ছে জাবির মাহমুদকে, জামা-কাপড় পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। বাদামী রঙের সুটে দারুণ মানিয়েছে তাকে। ক্লিন-শেভড্।

আড়ষ্ট হয়ে গেছে ফাহিমও। সায়রার হাত চেপে ধরেছিল সে, অজান্তে আঙুলগুলো দৃঢ় হয়ে গেল। তবে মুহূর্তের জন্যেই, তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। 'জাবির, ইদানীং তোমাকে দেখছি না যে?' হালকা সুরে জানতে চাইল। 'ঢাকার বাইরে গিয়েছিলে নাকি?' স্রেফ কৌতূহল প্রকাশ পেলেও সায়রার মনে হলো চাপা উত্তেজনাও রয়েছে কণ্ঠে।

গাড়ির দরজা মেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জাবির। তারপর কাচ নামিয়ে তাকাল ওদের দিকে, নিস্পৃহ দৃষ্টি। 'না, ঢাকাতেই আছি।' সায়রার দিকে তাকাল সে, উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল মুখে। 'সায়রা, মাই

ডিয়ার, মনে হয় না শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কালকের সন্ধেটা দারুণ কেটেছে, তাই না?' আড়চোখে ফাহিমের দিকে তাকাল সে, তারপর চাবি ঘোরাতে গর্জে উঠল এঞ্জিন। ক্ষণিকের জন্যে হলেও, সুদর্শন মুখটায় চাপা উল্লাস দেখতে পেল সায়রা।

এরচেয়ে বেশি বলার দরকার ছিল না। স্রেফ দুটো কথায় সায়রার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে, নিঃশ্বাস আটকে গেছে ওর, অনুভব করছে আবারও ওর হাতে ফাহিমের আঙুলগুলো চেপে বসেছে।

'কিসের কথা বলল ও?' প্রায় কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ফাহিম।

সায়রার মনে পড়ল ফাহিমকে বলেছিল জাবিরের সাথে দেখা হয়েছে, কিন্তু কিছু ব্যাখ্যা করেনি। সেটাই রাগিয়ে তুলেছে তাকে। জাবিরের সূক্ষ্ম বিদ্রূপ তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

ফাহিমের কণ্ঠের রূঢ়তা অস্বস্তি ধরিয়ে দিয়েছে ওর মনে। চোখ তুলে তাকানোর সাহস হলো না। 'জানি না আমি,' বিড়বিড় করল ও। 'আমাকে ব্যথা দিচ্ছ, ফাহিম!' হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ও, বাঁধন কিছুটা শিথিল হলো।

দ্রুত হাঁটছে ফাহিম। নির্বিকার হয়ে গেছে মুখ, দৃঢ় পেশী জানান দিচ্ছে উত্তরটা পছন্দ হয়নি। অজানা একটা আশঙ্কা প্রায় অস্থির করে তুলল সায়রাকে, উপলব্ধি করছে ওর ধারণার চেয়েও বেশি বিদ্বেষ বোধ করছে দুই ভাই। ফাহিমের হঠাৎ খেপে ওঠার কারণ আর কিছু হতে পারে না। স্রেফ পারিবারিক দ্বন্দ্ব নয়, এরচেয়েও বেশি কিছু আছে দু'জনের মধ্যে। হয়তো ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপার।

দোতলায় একটা টেবিলে এসে বসল ওরা। বিব্রত বোধ করছে সায়রা, ভাবতেই পারেনি সামান্য একটা কথায় এভাবে খেপে যাবে ফাহিম। চোখ তুলে দেখল এখনও গম্ভীর সে, চোখে জেদ আর অসন্তোষ ফুটে উঠেছে।

'সত্যটা বলবে না আমাকে?' ওর দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল ফাহিম।

'খেপে যাওয়ার মত এমন কিছু তো ঘটেনি! না শুনে বা না জেনেই রাগ করছ কেন?' পাল্টা অভিযোগ করল সায়রা, কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষ।

এবার সরাসরি ওর দিকে তাকাল ফাহিম। টেবিলের ওপর সায়রার হাতে মৃদু চাপ দিল। 'দুঃখিত, সায়রা, সত্যিই দুঃখিত। ঠিকই বলেছ তুমি, না শুনেই খেপে গেছি।'

'গতকাল সন্ধেয় জাবির ভাইয়ের সঙ্গে একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করেছি আমরা–আমি আর শওকত ভাই। পান্থপথের ওদিকে কোথাও জায়গাটা, ঠিক জানি না আমি, তবে অদ্ভুত এবং নোংরা জায়গা। সত্যিটা যদি জানতে চাও, তাহলে বলতে পারি, তোমার ভাই সম্পর্কে খুব একটা কেয়ার করি না আমি।'

'আমিও করি না,' শুকনো স্বরে বলল ফাহিম। 'কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে ওর, এতটাই যে সেটা অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে।'

'সেটা আমার জানার কথা নয়, তবে গতকাল তার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি।'

সহজ সুরে বললেও সায়রা টের পেল কথাটা শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে ফাহিম। দৃষ্টি নামিয়ে মেন্যুর দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে চোখ সরাল না লেমিনেটেড কাগজের ওপর থেকে, এমনকি সায়রা কি খাবে তা-ও জানতে চাইল না। একটু পর ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল, সায়রাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ফাহিম, নিজের পছন্দমত ফরমাশ দিয়েছে।

মাঝখানে একটা টেবিল, কিন্তু যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল! দু'হাত দূরত্বই এ মুহূর্তে দূরতিক্রম্য মনে হচ্ছে। ক্রমে আরও দৃঢ় হচ্ছে সায়রার ধারণা–দুই ভাই আসলে চরম ঘৃণা করে পরস্পরকে! কারণটা যদি জানতে পারত! তীক্ষ্ণ কাঁটার মত মনে খচখচ করতে থাকল সন্দেহটা–জাবির মাহমুদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা কি নেহাত কাকতালীয়? মনে হয় না, আনমনে মাথা নাড়ল ও, জাবির হয়তো আগেই এখানে এসে অপেক্ষায় ছিল, ওদেরকে ঢুকতে দেখে বেরিয়ে এসেছে। যদি তা না-ও হয়, সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে সে–ইচ্ছে করেই সন্দিহান করে তুলেছে ফাহিমকে।

ভাইয়ের ওপর কতটা বিতৃষ্ণা জমে আছে ফাহিমের মনে যে সামান্য একটা কথায় কিংবা জাবিরের উপস্থিতিতে খেপে গেছে এমন? আর কেউ না হোক, সায়রা অন্তত পরিবর্তনটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আনন্দময় একটা সন্ধে আর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করছিল ওরা, হঠাৎ করেই সেটা তিক্ত অভিসারে পরিণত হয়েছে!

'নিজের সম্পর্কে ঠিকই বলেছ তুমি,' কাঁটা-চামচ আর ছুরি নাড়াচাড়া করাই সার হলো শুধু, খেতে ইচ্ছে করছে না সায়রার। খিদে

মরে গেছে, অসহ্য মনে হচ্ছে নীরবতাকে। 'গোঁয়ার, মূর্খ তুমি, অল্পতেই খেপে যাও!'

টেবিল থেকে চোখ তুলে তাকাল ফাহিম। 'ঠিক। অন্তত একটা লাভ হয়েছে তাতে, বুঝতে পারছ কিসের সঙ্গে থাকতে হবে তোমার। আমার আরও দু'একটা বদ-অভ্যাস জানিয়ে দেই: বিদ্বেষ বা ঈর্ষাও বেশি আমার। জেদী বাচ্চার মত নিজের জিনিস আগলে রাখি, কাউকে ভাগ দিতে চাই না। সেই উদারতা নেই আমার!' হঠাৎ করেই হেসে উঠল সে, ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'বুঝতে পারছ, আবেগে কেমন অন্ধ হয়ে যাই? কেউ আমাকে ঠকাচ্ছে বুঝতে পারলে কখনও ক্ষমা করি না। মনেপ্রাণে চরমপন্থী আমি, যা চাইব পুরোটা চাইব। আধাআধি বলে কিছু নেই আমার অভিধানে, না নিলে কিছুই নেব না, কিন্তু নিলে পুরোটা!'

'মানে?' বিভ্রান্ত স্বরে জানতে চাইল সায়রা। খানিকটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে ফাহিমকে হাসতে দেখে।

'আগে ক্ষমা চেয়ে নিই! আমি সত্যিই দুঃখিত, সায়রা। বোকার মত দুর্ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে–হয়তো ঈর্ষার কারণে!' গভীর দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, সায়রা অনুভব করল দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালটা মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ফাহিম। 'আমার ভালবাসা মাপতে পারবে, সায়রা? যদি দেখাতে পারতাম! অন্য কোন পুরুষ তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে, এটাও সহ্য হবে না আমার!

'তবে আরও একটা ব্যাপার আছে, পরে ব্যাখ্যা করব। একটা কথা জেনে রাখো, ভুলেও জাবিরকে বেশি পাত্তা দিয়ো না। আর যে-ই হোক, ওকে সহ্য করতে পারি না আমি। কারণটা জানতে চেয়ো না, কিন্তু ওকে একটা চলন্ত বিষফোঁড়া মনে হয় আমার!'

'আমারও পছন্দ নয় ওকে। শওকত হাসানের জোরাজুরিতে গিয়েছিলাম ওখানে, ভাবতেই পারিনি এমন জায়গায় যেতে পারে তোমার ভাই।'

ক্ষীণ হাসল ফাহিম। 'ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'বিশ মিনিট ছিলাম ওখানে। অসহ্য মনে হচ্ছিল আমার, অর্ধ-মাতাল কোন লোকের সঙ্গে এমন পরিবেশে কথা বলা যায়? শওকত ভাইও বোধহয় পছন্দ করতে পারেনি, বলতেই একবাক্যে উঠে পড়েছিল।'

সায়রা মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে ফাহিম যেন আর কোন প্রশ্ন না করে। কেন গিয়েছিল, কি বলেছে জাবির–প্রত্যেকটা প্রশ্ন ওর অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দেবে। কিভাবে বলবে ভালবাসার মানুষটার বিরুদ্ধে খুনের সন্দেহ নিরসন করার জন্যে গিয়েছিল?

'তোমাদের পরিবার সম্পর্কে বলো আমাকে,' অনুরোধ করল ফাহিম।

মানুষটাকে আগের মত আন্তরিক, সহজ মনে হলো সায়রার। হালকা কথাবার্তায় সময় কখন পেরিয়ে গেছে, টেরই পেল না কেউ। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল ও। দশটা বেজে গেছে!

বেরিয়ে এসে একটা ক্যাবে চড়ল ওরা। গেস্ট হাউজে এসে ওর সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ফাহিম। রিসেপ্শনে দেখা হয়ে গেল আলমের সঙ্গে। সায়রাকে দেখেই উজ্জ্বল হলো ছেলেটার মুখ। কৌতূহলী, সমীহের দৃষ্টিতে দেখছে ফাহিমকে।

'হাসান সাহেব ফোন করেছিলেন, দিদি,' বলল সে। 'বলেছেন সকালে আবার ফোন করবেন।'

'ঠিক আছে।'

'চা খাবেন, দিদি?'

'আমার অতিথিকে জিজ্ঞেস করো।'

'খাব,' জানাল ফাহিম।

সায়রার কামরায় এসে বসল ওরা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে পুরো কামরায় চোখ বুলাচ্ছে ফাহিম, ঠোঁটের কোণে লেপ্টে আছে স্মিত হাসি। এরচেয়ে আরামদায়ক, দামী আসবাবপত্রে ভরা পরিবেশ দেখতে অভ্যস্ত বলে কামরাটাকে নেহাত ছোট এবং অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে ওর কাছে। সায়রাকে কোন বিলাসবহুল হোটেলে নিয়ে যেতে ভাল লাগবে, খুশি হয়েই বিল মেটাবে ও; অবশ্য এরচেয়েও বেশি খুশি হবে নিজের বাড়িতে সায়রাকে তুলতে পারলে। বোনের বাড়িতে উঠতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, অন্তত চোখ ঠারবে না কেউ। তাছাড়া আছে কে দেখার যে সায়রা কোথায় উঠল?

কিন্তু মোহময়ীর মিষ্টি মুখটা দেখে আইডিয়াটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ফাহিম, দেখল আরক্ত হয়ে আছে সায়রার মুখ–ওর সঙ্গ এবং চুমো–দুটোরই প্রভাব। উঁহুঁ, মেয়েটির আত্মসম্মানবোধে আঘাত করা হবে ওরকম প্রস্তাবে, এবং খুব ভদ্র ভাবে প্রস্তাবটা নাকচ করে দেবে সায়রা।

'সাংবাদিক সাহেব নেই?' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও।

'ক'দিনের জন্যে কোথায় যেন গেছে।'

'কোথায়?'

'আমি···জানি না,' দ্রুত বলল সায়রা। মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয় ও, তাছাড়া একদিনে ক'টা মিথ্যে বলা যায়? এ মুহূর্তে যেভাবে ফাহিমের চোখ এড়িয়ে যেতে চাইছে, কিংবা ওর বিব্রত চাহনি দেখে অনায়াসে মিথ্যেটা ধরে ফেলবে সে। এমন গুরুত্বহীন একটা ব্যাপারে মিথ্যে বলার দরকার কি বুঝতে পারল না সায়রা, কিংবা ফাহিমও বুঝতে পারবে না। ওর ভয় হলো সত্য জানার জন্যে চাপ দেবে ফাহিম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দিল সে। হয়তো ভেবেছে একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে, জাবিরের উপস্থিতিতে যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে দু'জনের মধ্যে।

'কাল দুপুরে আসবে বাসায়? একসঙ্গে লাঞ্চ করব আমরা?' যাওয়ার সময় অনুরোধ করল ফাহিম। 'দুপুরের পর অফিসে যাব না আর। মনে হয় ম্যানেজ করতে পারব, যদি না জরুরী কোন কাজ পড়ে যায়। বাইরে কোথাও যেতে পারি আমরা, প্রভাকে নিয়ে যাব সঙ্গে।'

'যাব।'

কপালে আলতো চুমো খেল ফাহিম। 'ফোন কোরো।'

সামান্য দুটো বিষয়ে মিথ্যে বলেছে, ব্যাপারটা সারাক্ষণ ত্যক্ত করে তুলল সায়রাকে। কিন্তু ঘুমের অসুবিধে হলো না ওর। নিজের ভালবাসার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ও, সন্তুষ্ট। ওর স্থির বিশ্বাস কাপ্তাই থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে শওকত হাসান, সায়মার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাহিমের হাত আছে এমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারবে না। নেহাতই দুর্ঘটনা সেটা, এবং শওকত হাসানের সন্দেহ একেবারেই অমূলক। কিছুদিনের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবে সবাই, শওকত হাসানও। এ ব্যাপারে ফাহিমকে কিছু বলার প্রয়োজন পড়বে না, কিংবা চিঠির ব্যাপারেও বলার দরকার হবে না।

কিন্তু চিঠিটার গুরুত্ব কিছুটা হলেও আছে, অন্তত শওকত হাসানকে যা বলেছে তারচেয়েও বেশি–অনুভব করছে সায়রা। আসলে কি কারণে ভয় পাচ্ছিল সায়মা? ফাহিম ইমতিয়াজ যে সত্যিই রগচটা আর সামান্য কারণে মেজাজ খারাপ করতে পারে, দু'বার তার নমুনা দেখেছে; ঈর্ষাকাতর এবং একরোখাও সে। ফাহিম সম্পর্কে সায়মার

অন্তত এই অভিযোগগুলো মিথ্যে নয়।

সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে, চোখ বুজে নিজেকে প্রবোধ দিল সায়রা।

নয়

সকালে নাস্তা খাচ্ছে, এমন সময়ে ফোন করল শওকত হাসান। সাগ্রহে রিসিভার তুলে নিল সায়রা। 'হ্যালো, শওকত ভাই! কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'কাপ্তাই থেকে। একটা হোটেলে উঠেছি। রাস্তাটা সম্পর্কে ঠিকই বলেছ তুমি, সায়রা—সত্যিই ভয়ঙ্কর!'

'আসলে কি করছেন, বলুন তো?'

'এদিক-ওদিক ঢুঁ মারছি, কিছু প্রশ্ন করছি লোকজনকে।'

'আর?'

'কাউকেই খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না। হয়তো তোমার কথাই সত্যি, সায়রা, সায়মার মৃত্যু বোধহয় স্রেফ দুর্ঘটনা। কিন্তু তারপরও কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এফআইডিসি-র একটা বাংলো আছে এখানে, বেড়াতে এলে এখানেই উঠত ফাহিম ইমতিয়াজ, সায়মা যখন বেঁচে ছিল। বাংলোর কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে মেইড হিসেবে কাজ করত, এমন এক মহিলা আর ওর স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছি।

'ওদের কাছে শুনেছি, শেষবার যখন সায়মা আর ফাহিম এসেছিল এখানে, কি কারণে যেন দারুণ খেপে ছিল সায়মা। দ্বিতীয় রাতে তুমুল ঝগড়া করেছে দু'জনে, প্রচুর জিনিসপত্র ভেঙেছে তোমার বোন। এক সপ্তাহ কাটানোর প্ল্যান বাতিল করে পরদিনই চলে যায় ওরা। হয়তো ঝগড়ার কারণেই।'

'ওহ্!' সায়রা জানে সায়মার স্বভাব সম্পর্কে। বাড়িতেও এমন

করত ও, খেপে গেলে বাসন-কোসন ছোঁড়াছুঁড়ি করত প্রায়ই।

'এছাড়া তেমন কিছু জানতে পারিনি,' বলে গেল শওকত। 'দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, কেউই স্পষ্ট বলতে পারছে না। রাস্তাটা সত্যিই খারাপ, কিন্তু ব্রেক-ফেল করলে গাড়িটা রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যাবে কেন? অথচ তাই ভাবছে সবাই!'

'তাহলে ফিরে আসছেন আপনি? এবং সবকিছু ভুলে যাবেন?'

'মনে হয়,' কিছুটা হতাশার সঙ্গে স্বীকার করল সে। 'ভাবছি আজকের দিনটা ঘুরে-ফিরে কাটাব। সকালে রওনা দেব। তাহলে দেখা হচ্ছে কাল, তাই তো?'

স্বস্তি অনুভব করছে সায়রা, বুকের ওপর থেকে বিশাল ভারী একটা বোঝা নেমে গেছে যেন। আশঙ্কা করছিল শওকত হাসান হয়তো খুব বেশি নাড়াচাড়া করছে ব্যাপারটা নিয়ে, তাতে যদি অযথাই বিপদে পড়ে ফাহিম! কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না যে সায়মার মৃত্যুর পেছনে হাত আছে তার। এই দুঃসাহস করতে পারছে না। আসলে মানুষটার চরিত্রের সাথে খাপ খায় না ব্যাপারটা, অন্তত সায়রার দৃষ্টিভঙ্গিতে। রাগী হতে পারে সে, হয়তো ঈর্ষাকাতর, গোঁয়ার কিংবা বাচ্চাছেলের মত জেদী, কিন্তু খুনী নয়।

সকাল দশটার মধ্যে সাভার পৌঁছে গেল ওরা, ও আর প্রভা। স্মৃতিসৌধ এবং আশুলিয়া ঘুরে দেখেছে। বেরোনোর আগে ফোন করেছিল ফাহিমকে, জানিয়েছে কোথায় যাচ্ছে। কিছুটা শঙ্কা নিয়ে প্রভাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ও, কিন্তু যুগপৎ বিস্মিত এবং পুলকিত হয়েছে ফাহিমের জবাব শুনে:

'যেদিন আমার বাড়িতে পা রেখেছ, সেদিন থেকেই তোমার মেয়ে ও, সায়রা,' সন্তুষ্ট স্বরে বলেছে ফাহিম। 'কেন নেবে না ওকে? আমি যা বলতে চাই...আমার সবকিছুই তোমার, আধাআধি। আমার বন্ধু তোমার বন্ধু, শত্রু তোমার শত্রু!'

ফাহিম এমন ভাবে কথাটা বলেছে যে শিহরিত হয়েছিল সায়রার পুরো দেহ। মিনিট কয়েক স্থির দাঁড়িয়ে ছিল, কি এক আবেশ আর ভাল-লাগায় ছেয়ে গিয়েছিল সারা সত্তা। *আমার সবকিছুই তোমার–আধাআধি! আমার বন্ধু তোমার বন্ধু, শত্রু তোমার শত্রু!* আসলে এভাবেই ওকে স্বীকৃতি দিয়েছে ফাহিম এবং সম্ভবত সতর্কও করে দিয়েছে!

সময়টা দারুণ কাটছে। প্রভার উপস্থিতি আনন্দ দিচ্ছে ওকে। দারুণ স্বতঃস্ফূর্ত মেয়েটা, সারাক্ষণ এটা-ওটা জানতে চাইছে। ওর কৌতূহল মেটাতে ক্লান্তি দেখা গেল না সায়রার মধ্যে। এক পর্যায়ে নানার বাড়ি সম্পর্কে জানতে চাইল প্রভা। অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে সায়রা জানল নানা-নানী ব্যাপারটাই অজানা মেয়েটির, সম্ভবত কখনও কেউ ওকে বলেনি কিছু। হয়তো উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই।

'নানী মানে কি?' নিখাদ বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল প্রভা।

'আমি তোমার কি?'

'আন্নি।'

'নানী হচ্ছে আন্নির মা। তোমার মা-র মা।'

'দু'জন মা?'

ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন একটা স্ন্যাক্স-বারে লাঞ্চ করছে ওরা। মিনিট কয়েক আগে ফাহিমের সঙ্গে কথা বলেছে সায়রা। মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছে সে। প্রভাকে বলে দিয়েছে আন্টিকে নিয়ে যেন সরাসরি বাসায় চলে যায়।

প্রভাকে বোঝাতে ঝামেলা হলো না অবশ্য। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, চট করে ধরে ফেলতে পেরেছে ব্যাপারটা।

'আব্বু যদি আবার বিয়ে করে···তাহলে কি আরেকটা নানী পাব আমি?'

'নিশ্চই!' কোন কিছু না ভেবেই জবাব দিল সায়রা।

'তারমানে দুটো নানী হবে আমার?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু দুটো তো চাই না! একটাই যথেষ্ট। তুমি আমার মা হলে তো একটাই নানী থাকবে আমার, তাই না?'

মুখ টিপে হেসে উঠল সায়রা। 'কিন্তু আমি তো তোমার মা নই!'

'সত্যি। কিন্তু তোমাকে মা ডাকতে অসুবিধে কি?'

'যদি···' থেমে গেল সায়রা, মুখ আরক্ত হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গিয়ে। 'জুস নেবে?'

মাথা ঝাঁকাল প্রভা।

নিজের জন্যে কোকের ফরমাশ দিল ও।

স্ন্যাক্স থেকে বেরিয়ে ফ্যান্টাসি কিংডমে ঢুকল ওরা। বিকেল তিনটের দিকে ফিরতি পথে ক্যাবে চড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিল।

সরাসরি ধানমন্ডি চলে এল।

দরজা খুললেন হাস্না রহমান।

'কেমন ঘুরলে, প্রভা সোনা?'

'ওহ্, দারুণ!' উচ্ছল কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'আব্বু কোথায়?'

স্টাডিতে আছে।'

ছুটতে শুরু করতে প্রভার হাত চেপে ধরলেন হাস্না রহমান, কোলে তুলে নিলেন। সায়রা ভেতরে ঢুকতে দরজা আটকে দিলেন। 'ফোনে কথা বলছে কারও সঙ্গে। বোসো, সায়রা। ওকে জানাচ্ছি যে ফিরেছ তোমরা।'

'আমিই যাচ্ছি,' মহিলাকে নিরস্ত করল সায়রা।

স্টাডিতে এসে দেখল এখনও কাপড় ছাড়েনি ফাহিম। বোধহয় অফিস থেকে ফিরেই স্টাডিতে ঢুকেছে। পরনে সুট। একটা চেয়ারের হাতলে বসে আছে, কানে রিসিভার। চড়া স্বরে বলছে কি যেন, কিন্তু রাগেনি। ওকে ঢুকতে দেখে নিঃশব্দে হাসল। সায়রা পাশে এসে দাঁড়াতে এক হাতে ওর কোমর বেষ্টন করল, তারপর পাশে সোফায় বসিয়ে দিল। সায়রার দিকে সরে এল ফাহিম, আলতো চুমো খেল কপালে। টেলিফোন ছাড়েনি এখনও, ও-প্রান্তের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

'মিনিট খানেকের বেশি লাগবে না,' উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগোনোর সময় বলল সায়রাকে। 'কেউ একজন আমার অতীত খুঁড়ে বের করতে চাইছে, কি জানতে চাইছে খোদা মালুম! কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়ব না আমি। ...কফি-পটে কফি আছে, মাত্র দিয়ে গেছেন হাস্না খালা। নিয়ে নাও।' এবার ফোনের দিকে মনোযোগ দিল সে। 'হ্যালো? শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, বলুন।'

কাপে কফি ঢালল সায়রা। 'দয়া করে মাথা গরম কোরো না।'

'তা করছি না আমি...হ্যাঁ, মুজাহিদ সাহেব। আসলে কি হচ্ছে ওখানে, বলুন তো!' দীর্ঘক্ষণের নীরবতা, ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল ফাহিমের মুখের হাসি, ভুরু কুঁচকে গেছে। পলকের জন্যে সায়রার দিকে তাকাল, এমন ভাবে দেখল যেন অচেনা কাউকে দেখছে। 'উঁহুঁ,' শেষে গম্ভীর স্বরে বলল। 'এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমার। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাকে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ...না, নিজ থেকে কিছু করতে যাবেন না। আমি নিজেই দেখব ব্যাপারটা। ধন্যবাদ, মুজাহিদ

সাহেব। দেখা হবে তাহলে?' ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে রিসিভারটা ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখল সে, এমন ভাবে যেন ওটা ভঙ্গুর কোন জিনিস। নিশ্চল একই জায়গায় বসে থাকল অনেকক্ষণ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফোনের দিকে, যেন জীবনে এর আগে জিনিসটা দেখেনি।

তারপর চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল। একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে মুখটা–বিদ্রূপ, অসন্তোষ, ক্ষোভ কিংবা গভীর ভালবাসা; কোনটাই নেই চাহনিতে। স্রেফ শূন্য দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে সায়রার মনে হলো নির্বিকার দৃষ্টির আড়ালে বেদনা দেখতে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না।

একটা সিগারেট ধরাল ফাহিম। হাতটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন সে, সামলে নিল কিছুক্ষণের মধ্যে। সিগারেটে জোরাল টান দিল, যেন ওর জীবনটাই নির্ভর করছে এর ওপর।

'কি বলেছ তুমি, শওকত হাসান যেন কোথায় গেছে?' ওর দিকে না ফিরেই জানতে চাইল ফাহিম, শান্ত স্বর, কিন্তু প্রশ্নটা শীতল অনুভূতি এনে দিল সায়রার সারা দেহে।

'ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরতে গেছে।'

'কাপ্তাই গেছে সে,' এবার ফিরে তাকাল ফাহিম, চোখ সরু হয়ে গেছে, সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ দেখতে পেল সায়রা। 'কিন্তু জানতে তুমি, জানতে না?' মিনিট খানেক অপেক্ষা করল সে, জবাব না পেয়ে খেই ধরল, কর্কশ হয়ে গেছে কণ্ঠ। 'খোদার দোহাই, অস্বীকার করো!'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

'কিন্তু আমাকে বলোনি! কেন বলোনি, কারণটা জানতে চাইব না। মুজাহিদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি। নামটা চেনা চেনা লাগছে না? কাপ্তাইয়ে এফআইডিসি-র বাংলোর কেয়ারটেকার। বিদেশী এক সাংবাদিক কি সব প্রশ্ন করছে লোকজনকে, ব্যাপারটা ভাল লাগেনি বলে আমাকে রিপোর্ট করার জন্যেই ফোন করেছেন মুজাহিদ সাহেব। জানতে চাইলেন বিদেশী লোকটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি কিনা।

'দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে লোকটা। মুজাহিদ সাহেবের সন্দেহ ওটা যে দুর্ঘটনা নয়, প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সে।'

চোখ তুলে তাকাল সায়রা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। মনে হাজারো আশঙ্কা। একটা দুঃস্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছে যেন, অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওর। দুঃস্বপ্নে যেমন মানুষ স্থির ভাবে চিন্তা করতে পারে না, তাই হচ্ছে এখন।

'শওকত হাসানই তো লোকটা, তাই না?' ফের জানতে চাইল ফাহিম, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'আসলে কি জানতে চাইছে সে?'

'আমি...জানি না, হয়তো মুজাহিদ সাহেবের সন্দেহই ঠিক।'

'কিন্তু তোমার মনে কি চলছে, সেটা তো বলতে পারবে? সায়মা কিভাবে মারা গেছে, শওকত হাসানকে নিশ্চই বলেছ তুমি? সেজন্যেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে কাপ্তাই পর্যন্ত ঢলে গেছে সে। এখন বুঝতে পারছি সেদিন কেন দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে জানতে চাইছিল। আজও ফোন করেছে আমাকে...দুর্ঘটনার সময় আর জায়গাটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছিল। ঠিক আছে, ওর কথা থাকুক...তোমার ব্যাপারে কি বলবে, সায়রা? কি এমন ঘটল যে আমাকে খুনী সন্দেহ করতে শুরু করেছ তুমি?'

'তেমন কিছুই ভাবিনি আমি!' ফিসফিস করে বলল ও। 'কখনোই ভাবিনি, এমনকি তোমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়নি, তখনও নয়। বিশ্বাস করো, ফাহিম!'

'তাহলে তুমি জানো না, কি জন্যে কাপ্তাই গেছে শওকত হাসান? ঝেড়ে কাশো, সায়রা! গতকাল জন্মাইনি আমি। খোদা, সত্যিই আমাকে বোকা বানিয়েছ তুমি! কি ভেবেছ তোমরা, কেউ আজেবাজে প্রশ্ন করে বেড়াবে আর তা সহ্য করব আমি?

'শওকত হাসানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাকে বিন্দুমাত্র ধারণা দাওনি তুমি, অথচ তাই করা উচিত ছিল। বরং জানতে চাওয়ায় মিথ্যে বলেছ। নিশ্চই ওকে বাধাও দাওনি, তাই না? তুমি যদি সত্যিই ভেবে থাকো সায়মাকে খুন করেছি, তাহলে এভাবে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ, কারণ এ পর্যন্ত কম সময় একসঙ্গে কাটাইনি আমরা! কে বলতে পারে, কোন একদিন হয়তো তোমাকেই খুন করে বসব!'

'প্লীজ, ফাহিম!' অনুনয় ঝরে পড়ল সায়রার কণ্ঠে, উঠে দাঁড়াল ও। 'আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। তুমি যা ধারণা করেছ, তার কোনটাই সত্যি নয়। তোমাকে কখনোই এরকম ভাবিনি আমি,

একবারের জন্যেও নয়!'

'চুপ করো,' শীতল স্বরে বলল ফাহিম। 'কোন অজুহাত শুনতে চাই না আমি। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, ঠিকই করেছ তুমি, শওকত হাসানকে বলেছ দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে। এতে অন্তত দোষের কিছু দেখছি না।

'বিশ্বাস করবে আমার কথা? সায়মার মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য আছে কিনা জানা নেই আমার, কিন্তু এটা জানি থাকলেও আমার অন্তত কোন ভূমিকা নেই। স্বীকার করছি, বহুবার ওর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হয়েছে, কিংবা ঘাড় ভেঙে দিতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম; কিন্তু শেষে মনে হয়েছে মেরে ফেললেই মুক্তি পেয়ে যাবে ও! হয়তো অবচেতন মন থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, নোংরা কাজটা আমাকে করতে হবে না, ওর নিয়তিই ওকে খুন করবে।'

'প্লীজ, ফাহিম, বলতে দাও আমাকে...'

'তোমার কোন ব্যাখ্যাই শুনতে চাই না!' রাগ নয়, বরং উদ্বেগ আর বেদনা প্রকাশ পেল ফাহিমের কণ্ঠে, সায়রা স্পষ্ট আঁচ করতে পারল কতটা আহত হয়েছে মানুষটা। 'তুমি যদি কথা বলতে শুরু করো, হয়তো সবই ভুলে যাব। কিন্তু আমি চাই না কেউ আমাকে সত্য ভুলিয়ে দিক। নিশ্চই মনে আছে, একবার ঠিক এমনই ঘটেছে? আর ঘটবে না তেমন কিছু!' উঠে দাঁড়াল সে, দরজার দিকে এগোল। কবাট মেলে ধরে মেইডকে ডাকল চড়া কণ্ঠে।

ছুটে এলেন হাস্না রহমান।

'খালা, দরজাটা দেখিয়ে দিন ওকে!' নিরুত্তাপ স্বরে নির্দেশ দিল ফাহিম, তারপর বেরিয়ে গেল, হলরুম হয়ে সরাসরি নিজের বেডরুমে চলে গেল। যাওয়ার সময় সশব্দে দরজাটা আটকে দিল পেছনে।

শূন্য দৃষ্টিতে ফাহিমের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল সায়রা। অসহায় বোধ করছে, ভয় হলো কেঁদে ফেলবে। হাস্না রহমান না থাকলে বোধহয় সত্যিই কেঁদে ফেলত, কিংবা ছুটে ফাহিমের পিছু নিত।

কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন হাস্না রহমান। 'সবই ঠিক হয়ে যাবে, মা, চিন্তা কোরো না।'

বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পড়ল সায়রা, কিন্তু পরোয়া করল না। লন পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল। চোখ কুঁচকে দু'দিকেই তাকাল। কোন

ক্যাব বা বেবিটেক্সী চোখে পড়ছে না, একটা রিকশাও নেই। বৃষ্টি হলে যেন এদেরকেও আলসেমিতে পেয়ে বসে।

বৃষ্টি অন্তত একটা স্বস্তি বয়ে এনেছে ওর জন্যে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না নিঃশব্দে কাঁদছে সায়রা। মোড়ে এসে ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল, নিজের বোকামির জন্যে দুঃখ হচ্ছে এখন। শওকত হাসানকে কেন নিজের সংশয়ের কথা বলেছে ও?

জেদী বাচ্চার মত তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করল সায়রা। ও নিজেই যেখানে সত্য আবিষ্কারে অনিচ্ছুক, সেখানে কেন শওকত হাসানকে প্ররোচিত করেছে? পরিণতিতে নিজের মধুর স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ হারানোর শঙ্কায় পুড়তে হচ্ছে এখন!

ফাহিমের প্রতিক্রিয়ার জন্যে তাকে দোষারোপ করছে না সায়রা, জানে ফাহিমের জায়গায় থাকলে ওর নিজেরও এমন প্রতিক্রিয়া হত। সায়রা নিজে তাকে অভিযুক্ত করেনি, স্রেফ ঘটনাচক্রে ঘটে গেছে এসব; এবং ওর ব্যাখ্যা শুনতে রাজি না হওয়ার জন্যেও দোষী ভাবতে পারছে না ফাহিমকে। *ভালবাসা কি এরকমই? প্রিয় মানুষের দোষগুলো এড়িয়ে যেতে চায় মানুষ? তাহলে আমার ওপর এভাবে খেপে গেল কেন ফাহিম? অন্তত কথা বলার সুযোগ তো দিতে পারত! সায়মার লেখা চিঠিটা যদি দেখত…*

চিঠিটা আরও আগেই দেখানো উচিত ছিল, তিক্ত মনে উপলব্ধি করল সায়রা, চিঠি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারত–কেন ফাহিমকে ভয় পাচ্ছিল সায়মা। কিন্তু ভুল যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর শোধরানোর উপায় নেই।

কারণটা জানে সায়রা। সবকিছু এত সহজে ঘটে না, বাস্তব আর কল্পনার ব্যবধান অনেক। প্রিয় মানুষটাকে অস্বস্তিতে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি ওর, ভুলে যাওয়া তিক্ত একটা অধ্যায় মনে করিয়ে দিতে চায়নি বলেই দেখায়নি।

ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে; অনুনয় বা মিনতি করেও কাজ হবে না। আসলে কিছুই করার নেই…স্রেফ কলকাতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া।

বৃষ্টির পানি, নাকি চোখের জলে ভিজে গেছে ওর মুখ? নাকি দুটোতেই, জানে না সায়রা। আচমকা মাঝ রাস্তায় থমকে দাঁড়াল। দেখল একটা ক্যাব এগিয়ে আসছে মোড় থেকে। হাত তুলল ও।

*

জানালার কাছে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম ইমতিয়াজ। জানালা দিয়ে লন আর সামনের রাস্তার পুরোটাই চোখে পড়ছে। সায়রার ছিপছিপে শরীর দেখতে পাচ্ছে, হাঁটার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে জেদ তাতিয়ে তুলেছে ওকে। দিক বদলে রাস্তার দিকে এগোল মেয়েটা, ক্লান্ত পরাজিত মনে হচ্ছে ওকে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ফিরে আসবে মেয়েটি, হয়তো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। তখনই মনে পড়ল ব্যাখ্যাটা শুনতে চায়নি ও। উৎসুক দৃষ্টিতে দেখল মোড় ঘুরে হাঁটছে মেয়েটি, মাথা নিচু, এমনকি চোখ তুলে সামনেও তাকাচ্ছে না।

ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যায়, নিয়ে আসে সায়রাকে। কিন্তু নড়ল না ও। সামান্য বৃষ্টি এমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না সায়রার।

শওকত হাসানের কাণ্ডাই ভ্রমণের উদ্দেশ্য জানতে পারার পর প্রথমে রীতিমত অবাক হয়েছে ও। পরের প্রতিক্রিয়া মিশ্র—এবং তীব্র। এতটাই তীব্র যে এখনও বিপর্যস্ত বোধ করছে। রাগ, ক্ষোভ, তিক্ততা, বেদনা—সবকিছুই একসঙ্গে ভিড় করেছে মনে।

আসলে কি চাইছে শওকত হাসান আর সায়রা? অতীত খুঁড়ে কি বের করতে চাইছে? তিন বছর আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছে সায়মা, নেহাত একটা দুর্ঘটনার মধ্যে কি রহস্য দেখতে পেয়েছে ওরা? অন্তত ফাহিমের চোখে কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। তিন বছর আগে এ নিয়ে কম তোলপাড় হয়নি, ওর ঘুম হারাম করে দিয়েছিল উৎসুক রিপোর্টাররা। সায়মার মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর অসুখী দাম্পত্য জীবনের তিক্ত অনেক ঘটনা আবিষ্কার করে বসে তারা, সেগুলোই ঢালাও ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

হয়তো সায়রার কাছে কোন একটা ব্যাখ্যা আছে। থাকলেও, সেটা জানার ইচ্ছে নেই ওর।

কারণ? কারণটা খুব সহজ। সায়রা ওর হৃদয়ে এতটাই জুড়ে বসেছে যে নিরপেক্ষ ভাবে কোন কিছুই বিচার করতে পারবে না। জানে সায়রা যদি মিথ্যেও বলে, সেটাই বিশ্বাস করবে: কিংবা নিজেই ভেবে নেবে, গুছিয়ে নেবে—সান্ত্বনা দেবে নিজেকে, যাতে মোহময়ী, স্নিগ্ধ, চটপটে মেয়েটিকে নিজের বাহুবন্ধনে পেতে পারে। এখানে, এই বাড়িতে। কিন্তু এভাবে সত্য চাপা থাকবে না কিংবা তিক্ততারও শেষ

হবে না। দু'জনের মাঝখানে একটা দেয়াল ঠিকই রয়ে যাবে, ভবিষ্যতে কখনও দেয়ালটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? অবিশ্বাস আর সন্দেহ খুব দ্রুত ছড়ায়, পাপের চেয়েও খারাপ জিনিসগুলো। সায়মার ক্ষেত্রে অন্তত এই অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর।

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল ফাহিম। কুঁচকে গেছে ভুরু জোড়া। ব্যাপারটা আসলে কি? ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো ওর কাছে। বাস্তবসম্মত একটা সমাধান মাথায় খেলে যাচ্ছে, এবার সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। মানুষটাই সে তেমন, প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে–দ্বিধা বা সংশয় ছাড়াই।

মোবাইলে মুজাহিদ সাহেবকে কল্ করল ও। দ্রুত কয়েক মিনিট কথা বলল, তারপর কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল। ইন্টারকমে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল পোর্চে গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে।

বেরোনোর আগে প্রভার কামরায় গেল ও। মেয়েকে আদর করল। হাস্না রহমানকে জানিয়েছে ফিরতে দু'একদিন দেরি হতে পারে, তবে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

বৃষ্টি হচ্ছে এখনও। নিজেই ড্রাইভ করছে ফাহিম। চট্টগ্রাম রোডে আসতে আরও বেড়ে গেল বৃষ্টি। দূরে বিদ্যুৎ চমক দেখা যাচ্ছে আকাশে, কোথাও বাজ পড়ল বোধহয়। রাস্তায় তেমন গাড়ি নেই, নিশ্চিন্তে স্পীড তুলল ফাহিম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওর থাকার ব্যবস্থা করে রাখবে মুজাহিদ সাহেব। শওকত হাসানও কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।

মুজাহিদ সাহেব খোঁজ নিয়ে জেনেছেন কাপ্তাই ছেড়ে যায়নি শওকত হাসান, অন্তত আজকের দিনটা থাকছে সে। হয়তো আশপাশে ঘুরে-ফিরে কাটাবে। উঁহুঁ, সাংবাদিক-নাক গলাবে জায়গায় জায়গায়, ফাহিমের অন্তত তাই ধারণা, কে কি মনে করল বা না-করল তাতে কিছুই যাবে-আসবে না তার, কিংবা নোংরা জিনিস নাড়তে গেলে যে দুর্গন্ধ ছড়ায়–তাতেও আমল দেবে না।

সুতরাং তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। কিন্তু মনটা অস্থির হয়ে আছে ওর, দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছে। সায়রার সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে, কাজটা মোটেও ঠিক হয়নি, স্পষ্ট বুঝতে পারছে এখন। তবে সেসব নিয়ে ভাবছে না ও, সময় হলে শুধরে নেবে, নিশ্চিত জানে

কোমলমতী মেয়েটি ঠিকই ক্ষমা করবে ওকে; আগে মূর্তিমান আপদ দূর করা দরকার।

সাধারণত একটা করোনা ব্যবহার করে ও। থ্রী-পীস সুট, ক্যাজুয়াল জুতোর মত গাড়িটাও ওর ব্যস্ত, ব্যবসায়ী জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই স্পোর্টস-কারটা ওর অন্য জীবনের ইঙ্গিত দেয়–চাপা পড়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরীর ব্যক্তি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেখানে সকাল ন'টা থেকে সন্ধে পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা নেই; কন্ট্রাক্ট, ফাইল বা কাগজের স্তূপের সঙ্গে সংস্পর্শহীন, শ্রমিকদের সমস্যা বা বিল্ডিং-সাইট ঘুরে দেখার ক্লান্তিকর কাজটা করতে হয় না, সীমাহীন একঘেয়েমি নেই এই জীবনে। গাড়িটা ওর জীবনের অপেক্ষাকৃত সুখী দিকটার কথা বলে দেয়–নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুদ্বিগ্ন, বল্গাহীন জীবন; যেখানে প্রিয় মানুষকে সময় ও সঙ্গ দেয়া যায়, উপভোগ করা যায় জীবনকে। সায়রা ওর এই জীবনের সঙ্গে খাপ খায়, মিশতে চাইবে এবং উপভোগও করবে, জানে ফাহিম। গোল্লায় যাক সব! এখন কেন এসব নিয়ে ভাবছে?

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের শুরুতে একটা পিকনিক স্পটে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। কফি আর স্ন্যাক্সের ফরমাশ দিয়ে বসল একটা টেবিলে। বৃষ্টির তোড় কমেনি এতটুকু। পাশের টেবিলে জোড়া কপোত-কপোতী নিজেদের নিয়ে দারুণ ব্যস্ত, দুনিয়ার অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই।

সায়রার কথা মনে পড়ল ওর। ও সঙ্গে থাকলে যাত্রাটা এত একঘেয়ে বা উদ্বেগপূর্ণ হত না। এখানে কফির পর্বটাও চমৎকার হত। কাচের দেয়াল পেরিয়ে চলে গেল ওর দৃষ্টি, দূরে আবছা ভাবে লালমাই পাহাড় চোখে পড়ছে।

কত মেয়েকেই দেখল এ জীবনে। কিন্তু ক'জন নাড়া দিয়েছে ওকে, সায়রার মত? স্রেফ ক্ষণিকের সম্পর্ক হিসেবে দেখলে এতকিছু করতে হত না। দু'দিন পরই যার যার জায়গায় ফিরে যেত ওরা। কিন্তু প্রথম থেকেই সায়রাকে অন্য চোখে দেখেছে ফাহিম, শুধু প্রেমিকা হিসেবে চায়নি। বরং ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে চেয়েছে। চেয়েছে আজীবন পাশে থাকবে ওই মেয়ে, ওর সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে। আজীবন!

বাস্তব কত তিক্ত! সায়মা ওর জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক এবং লজ্জাকর অধ্যায়। ঘুণাক্ষরেও কি ভাবতে পেরেছিল ওরই ছোট বোনের

প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে ফাহিম? স্বপ্নেও নয়। অথচ বাস্তবে তাই ঘটেছে। সায়রাকে দেখার পর থেকেই ওর সারা পৃথিবী টলে উঠেছে–তৎক্ষণাৎ জেনে গেছে ওর ভুবনে আসলে অন্য কারও জায়গা নেই। যুগ যুগ ধরে এই মেয়ের অপেক্ষায় ছিল–দেখতে খানিকটা একরকম বলেই বোধহয়, সায়মা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ওর জীবনে ঢোকার!

অথচ মনে হচ্ছে আবারও ঠকতে যাচ্ছে! *গোল্লায় যাক সব! যেভাবেই হোক ওই মেয়েকে চাই আমার!* কোন কিছুই পরোয়া করতে ইচ্ছে করছে না। সকালে চট্টগ্রামে ফোন করেছিল ও, বাবা-মার সঙ্গে কথাও হয়েছে। সায়রার কথা জানিয়েছে তাঁদের, আভাসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও বলেছে। অমত করেননি কেউ।

গত কয়েক ঘণ্টায় পঞ্চাশবারের মত একই তিক্ত উপলব্ধি হলো ওর: চলবে না, সায়রাকে ছাড়া চলবে না! শূন্য জীবনটা পূর্ণ হবে ওর উপস্থিতিতে, প্রভা মা-র ভালবাসা পাবে···

কিন্তু অতীত? যেটাকে খুঁড়ে বের করতে চাইছে ওরা?

অতীত অতীতের জায়গায় থাকবে, থাকতে যাতে বাধ্য হয়, তাই করবে ও! সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে সন্তুষ্টি বোধ করল ফাহিম।

দশ

বৃষ্টির মধ্যে আনন্দ বা সৌন্দর্যের কি আছে? বিরক্তির সঙ্গে ভাবছে শওকত হাসান। লাগাতার বৃষ্টি মানুষকে অলস বানিয়ে ফেলে। বৃষ্টি আসলে নিষ্কর্মা লোকের জন্যে।

গতকাল পুরো দিনটাই হোটেলের চার দেয়ালের মধ্যে কেটেছে ওর, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে প্রায়। কাজের কাজ কিছু হয়নি, উল্টো বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। অযথাই। কাপ্তাই ভ্রমণ প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, সায়মা চৌধুরীর দুর্ঘটনার ব্যাপারে তেমন

কিছু জানতে পারেনি। দু'একটা প্রশ্নের উত্তর মিলেছে কেবল, কিন্তু শুরুতে যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে এখনও।

বোধহয় নিজেকেই বোকা বানিয়েছে ও, অসম্ভবের পেছনে ছুটেছে ক'টা দিন! সায়রার কাছে ব্যর্থতা স্বীকার করতে হবে, ভাবতেই বিতৃষ্ণা বোধ করছে শওকত হাসান।

কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম, তারপর ঢাকা। আট ঘণ্টায় অন্তত সাড়ে তিনশো মাইল পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই বিরক্তি আর অসন্তোষ জন্ম নিচ্ছে ওর মনে। কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

সকালে নাস্তা শেষে বেরিয়ে পড়ল ও। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। রাতে বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

ব্যাগপত্র গুছিয়ে, বিল মিটিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ও। আকাশে গুমোট ভাব, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ফুটপাত ধরে হেঁটে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে এগোল শওকত হাসান।

মন্থর গতিতে রাস্তার পাশে এসে থামল একটা স্পোর্টস-কার। 'উঠে পড়ুন,' জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওকে বলল ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী।

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল শওকত, তারপর চাবি দেওয়া পুতুলের মত প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল।

'গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে তোয়ালে আছে,' জানাল ফাহিম।

তোয়ালে বের করে মাথা মুছল শওকত। 'এখানে কি করছেন আপনি?' শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেল সে।

'আপনার জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম।'

'কিভাবে জানলেন এই হোটেল থেকেই বেরোব আমি?'

'এখানে কিছু কন্ট্যাক্ট আছে আমার।' ড্যাশবোর্ডের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল ফাহিম। নিজেও একটা ধরাল।

ধীরে ধীরে ড্রাইভ করছে ফাহিম। উইন্ডস্ক্রীনে আছড়ে পড়ছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির ফোঁটা আর মাতাল বাতাস। সারাক্ষণ কাজ করছে ওয়াইপারগুলো। নীরবে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, শওকত হাসানের কৌতূহল আর বিরক্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে। আরামে ঢাকায় ফিরতে

পারছে ঠিকই, তারপরও পরিস্থিতিটা পছন্দ করতে পারছে না।

মিনিট বিশেক এভাবেই কেটে গেল। বৃষ্টি ধরে আসায় ড্রাইভিং থেকে মনোযোগ সরানোর সুযোগ হলো ফাহিমের। 'তো, শওকত সাহেব, নিশ্চই আবিষ্কার করেছেন স্ত্রীকে খুন করিনি আমি?' শান্ত, আলাপী সুরে জানতে চাইল ও।

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল শওকত, কি বলবে বুঝতে পারল না প্রথমে, কয়েকটা উত্তর উঁকি দিল মাথায়। 'কিভাবে জানলেন এসব?' শেষে বিড়বিড় করে পাল্টা প্রশ্ন করল সাংবাদিক।

'বলেছি না, কিছু কিছু জায়গায় কন্টাক্ট আছে আমার? অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে অযথাই ঘোরাঘুরি করেছেন, শওকত। আমার সম্পর্কে লোকজনকে অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন, জানতে পেরে রিপোর্ট করেছে আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'হ্যাঁ...আমি একজন সাংবাদিক। এরকম রহস্যময় একটা ঘটনা জানার পর কিভাবে উপেক্ষা করি, অন্তত কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ির সুযোগ যখন আছে আমার? যাক্‌গে, কারও তো তাতে ক্ষতি হয়নি।'

'ক্ষতি হয়নি? খোদার কসম, ক্ষতির দীর্ঘ একটা তালিকা দিতে পারব আপনাকে! কিন্তু সবার আগে আমি জানতে চাই, আসলে কি ভাবছেন আপনারা?'

'আমরা?'

'আপনি আর সায়রা।'

'উঁহুঁ, এ ব্যাপারে কিছু জানে না ও। একসময় যদি ভেবেও থাকে, এখন আর ভাবছে না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সবই ভুলে গেছে ও। বরং আমিই আইডিয়াটা ওর মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। আপনি কি এ ব্যাপারে কথা বলেছেন ওর সঙ্গে?'

'বলব হয়তো,' নিঃশব্দে হাসল ফাহিম—সন্তুষ্টি এবং স্বস্তির হাসি।

'দয়া করে ওকে দোষারোপ করবেন না, কাপ্তাই আসতে আমাকে বাধা দিয়েছিল ও। হয়তো আমাকে চিঠিটা দেখিয়েছে বলে রীতিমত আফসোস করছে এখন। স্বীকার করছি, সায়মার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কম করিনি, কিন্তু ওই যে বললাম, একটা রহস্যময় ব্যাপার আছে এতে। সেজন্যে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না! কিংবা সায়রাকেও দিতে পারবেন না। সায়মার চিঠিটা পড়লে যে কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠবে। বিষয়টাই রহস্যময় এবং জটিল। তেমন কোন

প্রমাণ বা নিরেট তথ্য পাইনি, কিন্তু নিশ্চিত জানি কোথাও একটা কিন্তু আছে...'

'এক মিনিট,' বাধা দিল ফাহিম। 'কিসের চিঠি?'

'সায়মার চিঠি, সায়রাকে লিখেছিল।'

'কোন চিঠির ব্যাপারেই কিছু জানি না আমি!'

'সায়রা কি চিঠিটা দেখায়নি আপনাকে, ব্যাখ্যা করেনি?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল ফাহিম, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল: 'আসলে ওকে কোন সুযোগই দেইনি আমি। শওকত, দয়া করে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবেন?'

পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে, দ্রুত এবং সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সাংবাদিক। সায়রার সঙ্গে পরিচয় দিয়ে শুরু করল সে। নীরবে শুনল ফাহিম, একটা প্রশ্নও করল না। হাইওয়ে থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি। পাশ দিয়ে গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে আন্তঃজেলা বাসগুলো।

শওকত হাসানের কথা শেষ হতে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। 'হ্যাঁ, এবার কিছুটা পরিষ্কার হলো,' গম্ভীর স্বরে স্বীকার করল সে। 'ঠিকই করেছেন, কৌতূহলী হয়ে ওঠার জন্যে দোষ দেয়া যায় না আপনাকে। কিন্তু এবার আমার কথা শুনুন, এসব ঘটনার কোনটাই ছাপানোর জন্যে নয়, কথাটা মনে রাখবেন। ওই চিঠি কি কারণে লিখেছে সায়মা, আমার কাছ থেকে শুনুন...'

ছোট্ট একটা রিসর্টে কফি আর হালকা নাস্তা করেছে ওরা। এখনও বসে আছে সেখানেই। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে শেষপর্যন্ত, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সূর্য, ঝলমলে আকাশে ঝিলিক মারছে সোনা-রোদ।

খোলাখুলি আলাপে অন্তত দুটো লাভ হয়েছে–দু'জনেরই। সন্দেহ বা অবিশ্বাস যা ছিল, সবই দূর হয়ে গেছে; এবং পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কাপ্তাই থেকে রওনা দেয়ার সময় সীমাহীন বিরক্তি আর অসন্তোষ বোধ করছিল শওকত হাসান, কিন্তু এখন ফাহিম ইমতিয়াজের সঙ্গ উপভোগ্যই মনে হচ্ছে। নিজের অতীত, সাফল্য-ব্যর্থতার অনেক গল্প করেছে সে। জানিয়েছে পরিবার আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। মানুষটাকে বোঝা সহজ হয়ে গেছে শওকতের জন্যে।

'সায়রাকে বিয়ে করবেন আপনি?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল সাংবাদিক।

'যদি চায় ও। গতকাল ওর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছি, মনে হয় না এখন আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

'আরে নাহ্, সবই ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েরা এসব চটজলদি সামলে নিতে পারে।'

'নিশ্চই অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন না?' হেসে জানতে চাইল ফাহিম। 'আপনি বিয়ে করছেন না কেন?'

'উঁহুঁ, ওই কাজটা আমার দ্বারা হবে না, আপাতত। আমার যে পেশা, আমাকে মেনে নেওয়ার আগে কোন মেয়েকে পেশাটাকে মেনে নিতে হবে। যাক্‌গে, সত্যিই কি সায়রার ব্যাপারে সিরিয়াস আপনি? পরে আফসোস করবেন না তো? একবার তো এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার। সায়রা সুন্দরী, হাসি-খুশি মেয়ে, কিন্তু তিক্ত হলেও সত্যি আপনার আভিজাত্য বা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ঠিক মেলে না। চৈতী চৌধুরীর মত উঁচু বংশের বা বিখ্যাত কেউ...'

'কিন্তু সায়মার সঙ্গে চৈতীর কোন পার্থক্য দেখি না আমি। বিয়ে মানুষের একবারই করা উচিত। এও ঠিক, সায়মার মত মেয়েদের সঙ্গে একবারই ঘর করা যায়, অভিজ্ঞতাটা নিঃসন্দেহে সুখকর নয়। চৈতী বা সায়মার মত মেয়েদের কাছ থেকে আসলে সবারই দূরে থাকা উচিত।'

'জানতাম এটাই বলবেন, এবং ঠিক এ কথাটাই বলেছি আমি সায়রাকে।'

উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল ফাহিমের মুখে।

ঢাকায় পৌঁছে সরাসরি গেস্ট হাউজের সামনে গাড়ি থামাল ফাহিম। 'দেরি হওয়ার আগেই দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।'

'সম্ভবত হাঁটু গেড়ে মিনতি করতে হবে,' সকৌতুকে বলল সাংবাদিক। 'কাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে অনুনয় করতে দেখলে যতটা খুশি হয় মেয়েরা, আমার ধারণা অন্য কিছুতে ততটা খুশি হয় না।'

'শাট আপ্!' গাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দাবড়ানি দিল ফাহিম। 'এখানেই থাকুন। তেমন কিছু যদি করতেও হয়, কোন সাক্ষী চাই না আমি!'

আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকল ফাহিম। আলমকে পেল রিসেপ্‌শনে। ওর প্রশ্নের উত্তরে জানাল সায়রা বাইরে আছে।

ঘড়ি দেখল ও। তিনটা বাজে। 'দুপুরে খেতে আসেনি?'

'জ্বী-না। সাধারণত দুপুরে বাইরে খেয়ে নেন দিদি। সকালে বেরোনোর সময় বলেছিলেন আজ লাঞ্চ করবেন এখানে। কিন্তু এখনও ফেরেননি দিদি, ফোনও করেননি।' কী-বোর্ডে ঝুলন্ত চাবিটা দেখাল সে।

ভুরু কুঁচকে গেছে ফাহিমের, কিছুটা হলেও বিহ্বল বোধ করছে, এবং উদ্বেগও লাগছে। 'কোথায় যাবে, বলেছে কিছু তোমাকে?'

'জ্বী-না।'

শওকত হাসান এখনও গাড়িতে বসে আছে। 'সম্ভবত আপনার বাসায় গেছে,' সব শুনে তৎক্ষণাৎ বাতলে দিল সে। 'সায়মার চিঠিটা দেখাতে চেয়েছে আপনাকে, সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্যে আরেকটা সুযোগ চাইছিল। আপনাকে না পেয়ে হয়তো ঠিক করেছে প্রভার সঙ্গে সময়টা কাটিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

কিন্তু সন্দেহ আছে ফাহিমের। গতকাল যে দুর্ব্যবহার করেছে, তারপর নিজ থেকে ওর বাসায় যাবে সায়রা, ভাবতেই বাধছে। না হয় গেলই, ওকে বাসায় না পেয়ে ফোন করেনি কেন? হাস্না খালাও জানাতে পারতেন!

Suvom

হিসেব মিলছে না, আনমনে মাথা নাড়ল ফাহিম, কোথাও একটা গড়বড় আছে। অন্য কোথায় যাবে মেয়েটা? মাথায় আসছে না কিছু। 'হতে পারে,' শেষে একমত হলো ও। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

চৌধুরী লজে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। কার-পার্কে গাড়ি থামতেই মূল দরজার কাছে ছুটে এলেন হাস্না রহমান। তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এল ড্রাইভার মজনু আর দুই মেইড। উদ্বেগ আর অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্লান হয়ে হয়ে গেছে সবার মুখ।

'কি হয়েছে?' দ্রুত জানতে চাইল ফাহিম।

'সকালে জাবির এসেছিল। বলল জরুরী কাজ আছে। তোমার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। ফোনে নাকি কথাও হয়েছে। প্রায় জোর করেই ঘণ্টা তিনেকের ছুটি দিল আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল ফাহিম, কিন্তু চোখে বিস্ময়। জাবিরের সঙ্গে ফোনে কোন কথাই হয়নি ওর।

'ফিরে এসে দেখি কেউ নেই। ...কোয়ার্টারে ছিল মজনু, এগারোটার দিকে জাবিরের গাড়ির আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছিল

ও। এখানে এসে দেখে জাবির বা প্রভা কেউই নেই। নিচতলায় ছিল মেইডরা, ওদের ওপর নির্দেশ ছিল ভুলেও যাতে ওপরে না যায়।'

'ঘুরতে বেরিয়েছে?'

'সেরকম একটা নোটই লিখেছে,' একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন মহিলা। 'কিন্তু এতক্ষণে তো ফিরে আসার কথা ওদের!'

'কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?' সম্ভাবনা বাতলে দিল সাংবাদিক। 'জাবির সাহেব যা জোরে গাড়ি চালান!'

পকেট থেকে মোবাইল বের করে রিং করল ফাহিম। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে গেছে কপাল। সেটা আরও বেড়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। 'জাবিরের মোবাইল বন্ধ!' শেষে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল সে। 'হয়তো নেটওয়ার্কের বাইরে আছে। ...কিন্তু প্রভাকে নিয়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি না।'

'এই রুমালটা পেয়েছি সোফার ওপর,' নীল একটা রুমাল এগিয়ে দিলেন হাম্না রহমান।

ফাহিম এবং শওকত হাসান, দু'জনেই চিনল। সায়রার রুমাল। 'তারমানে সায়রা এসেছিল এখানে...তাহলে সায়রাও আছে জাবিরের সঙ্গে,' অদৃশ্য কেউ যেন আঘাত করেছে ফাহিমকে, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে মুখ। 'রুমালটা বোধহয় ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে ও। খালা, খুঁজে দেখুন, আরও কিছু ফেলে যেতে পারে। জাবির কোথায় গেছে, কোন সূত্র ছাড়া জানা যাবে না।'

'পুলিশকে খবর দিচ্ছেন না কেন?'

'উঁহুঁ, এখন নয়! যা সন্দেহ করছি, আগে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। হয়তো সত্যিই ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা, কোথাও আটকে গেছে; যদিও আমার ধারণা সেই সম্ভাবনা কম। জাবির সম্পর্কে কি বলেছিলাম, মনে আছে? ও যদি মনে করে ওকে খুঁজব, এমন জায়গায় লুকাবে যে ওকে খুঁজে বের করাই যাবে না। ...আগে বরং বাড়িটা সার্চ করে দেখি।'

এবারও হাম্না রহমানই সূত্রটা খুঁজে পেলেন। প্রভার নার্সারির বাথরুমের আয়নায় তিনটে অক্ষর লেখা, লিপস্টিক ব্যবহার করেছে সায়রা। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল বোধহয়, পুরোটা লেখার সুযোগ পায়নি।

'HAL! এর মানে কি?' বিভ্রান্ত স্বরে জানতে চাইল শওকত

হাসান।

'জানি না। কিন্তু মানে তো অবশ্যই আছে একটা।'

'কোন সংকেত, বা ইনিশিয়াল?'

'আমার জানা কিছুর নয়।'

'কোন জায়গার নাম হতে পারে না?'

'হালছড়ি!' উৎফুল্ল স্বরে চেঁচাল ফাহিম। 'আমি একটা গাধা! আগেই বোঝা উচিত ছিল। হালছড়ি না হয়েই যায় না!' দরজার দিকে এগোল ও। 'চলুন, শওকত। হাস্না খালা, সবসময় ফোনের কাছে থাকবেন, আপনাকে হয়তো দরকার হতে পারে। মজনুও যেন গাড়ি নিয়ে তৈরি থাকে।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত!'

'আপনার কোন দোষ নেই, খালা। দোষটা আমারই, জাবির সম্পর্কে আপনাকে আগেই সতর্ক করা উচিত ছিল। কিন্তু ভাবতেই পারিনি এরকম কিছু করবে ও...' ক্ষীণ হাসল সে, কিন্তু চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'ওদের যদি কিছু হয়, দায়টা আমারই থাকবে।'

ঝড়ের বেগে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। শহর থেকে বেরিয়ে, এয়ারপোর্ট রোডে এসে গতি আরও বাড়িয়ে দিল ফাহিম। শঙ্কিত দৃষ্টিতে ফাহিমের দিকে তাকাল শওকত হাসান। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল দুটো, আড়ষ্ট শরীরে বসে আছে সে, চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। রাস্তা থেকে চোখ সরাচ্ছে না। বনানী রেল ক্রসিং পেরিয়ে অ্যাক্সিলেটরের ওপর আরও চাপ বাড়াল ফাহিম, দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সাংবাদিক। সাধারণত গতি নিয়ে খুব একটা উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তায় ভোগে না সে, কিন্তু কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছে এখন। ফাহিম ইমতিয়াজের চোখের দৃষ্টিও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে—রোখ চেপে গেছে মানুষটার, এবার এসপার-ওসপার করে ছাড়বে। স্বতঃস্ফূর্ত, হাসি-খুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে।

'হালছড়ি জায়গাটা কেমন?' অস্বস্তি কাটাতে জানতে চাইল শওকত হাসান।

'আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওখানে, প্রজেক্টটা অবশ্য ফেল মেরেছে। থাকার জন্যে বাংলো আছে। বিয়ের পর সায়মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কয়েকবার। আমাকে না জানিয়ে প্রায়ই ওখানে যেত সায়মা...প্রেমিকদের সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটাত।'

'জাবির মাহমুদও সেই প্রেমিকদের একজন?'

'বিশেষ করে জাবিরকেই নিয়ে যেত ও সেখানে।'

'কি মনে হয় আপনার, কি করতে পারে জাবির মাহমুদ?'

'কিভাবে বলব আমি?' প্রায় অধৈর্য স্বরে বলল ফাহিম। 'কিন্তু ওদের ন্যূনতম কোন ক্ষতিও যদি করে সে, তাহলে ওর...'

'নিশ্চই করবে না সে, তাই না? সকালে যা বললেন...'

'আপনি যদি মনে করে থাকেন সেজন্যে প্রভাকে জাবিরের ভালবাসা উচিত, তাহলে বিরাট ভুল করেছেন। কাউকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, সেটাই জানা নেই আমার ভাইয়ের। ওর কাছে প্রভার গুরুত্ব আসলে আমাকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখার একটা কৌশল মাত্র। ও জানে এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার, যে কোন দিন বোমাটা ফাটিয়ে দেবে জাবির–প্রভাকে জানিয়ে দেবে ওর বাবা নই আমি।

'একসময় হয়তো সবই প্রকাশ পাবে। আমার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্মানের কথা নাই বা বললাম, শুধু প্রভার কথাই চিন্তা করুন। মাত্র চার বছর ওর বয়েস। সবকিছু বোঝার মত বড় হয়নি, এখন যদি সত্যটা জানতে পারে, ওর পৃথিবীটাই পাল্টে যাবে।

'শুধু এজন্যেই গত কয়েক বছর জাবিরের অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। এক ধরনের ব্ল্যাকমেল বলতে পারেন এটাকে, এক অর্থে সাধারণ ব্ল্যাকমেলের চেয়েও জঘন্য। প্রভার কারণে আমার ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারছে ও, এমনও হুমকি দিয়েছে কোন একদিন নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে–প্রভাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে! কাকের বাসায় কোকিলের বাচ্চা বড় হওয়ার মত, উড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাকে নিয়ে যায় কোকিল-মা।' থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফাহিম, তিক্ত হাসল। 'সত্যিই যদি প্রভাকে ভালবাসত ও, না হয় একটা কথা ছিল। স্রেফ আমাকে আঘাত দেয়ার জন্যেই প্রভাকে কেড়ে নিতে চাইবে ও। সফল হোক বা না-হোক, ওর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ঠিকই পূরণ হয়ে যাবে তাতে–নোংরা ব্যাপারগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু সায়রা ওর সঙ্গে গেল কেন?'

মাথা নাড়ল ফাহিম, দীর্ঘ রাস্তা থেকে এবারও দৃষ্টি সরাল না। টঙ্গী ব্রীজে উঠছে ওরা। বাজারের শুরুতে সরু হয়ে গেছে রাস্তা, ফুটপাত ছাড়িয়েও রাস্তার দখল নিয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। কিন্তু গতি কমানোর ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো না ফাহিমকে, টানা হর্ন বাজাচ্ছে। 'জানি না কি কারণে ওর সঙ্গে গেছে সায়রা, হয়তো ওকে বাধ্য করেছে

জাবির···কিংবা স্বেচ্ছায়ই গেছে।'

'মনে হয় না স্বেচ্ছায় গেছে,' আত্মবিশ্বাসী সুরে বলল শওকত হাসান। 'যদি না প্রভার কথা চিন্তা করে সঙ্গে গিয়ে থাকে ও। জাবিরকে ঘৃণা করে ও, আমি নিজে দেখেছি। বাজি ধরে বলতে পারি স্বেচ্ছায় জাবিরের সঙ্গে কোথাও যাবে না সায়রা!'

সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সায়রা। আগের দিনের তিক্ততা, অসন্তোষ বা ক্ষোভ, কোনটাই নেই। অভিমান করে চলে আসার পর আর যোগাযোগ করেনি ফাহিমের সঙ্গে। কয়েকবার ইচ্ছে হয়েছিল ফোন করবে, কিন্তু কি এক কারণে সাহস করতে পারেনি। রাতটা কেটেছে প্রায় নির্ঘুম, বিছানায় আশপাশ করেছে বহুক্ষণ। বারবার ফাহিমের রুক্ষ স্বর, কর্কশ অভিযোগ আর অধৈর্য আচরণ মনে পড়ছিল। সত্যিই কি কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকারও নেই ওর? ফাহিমের রাগের কারণ যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু ওরও তো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কেন সে শুনতে চাইছে না? এতটা অধৈর্য হওয়ার মত তো কিছু ঘটেনি!

কারণটা···হয়তো মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস। ভালবাসা। আবেগ। নির্ভরতা। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি সন্দেহ করছে–এই ধারণাই খেপিয়ে তুলেছে তাকে। প্রিয় মানুষ কষ্ট দিলে সেটা বোধহয় অনেক বেশি লাগে, অন্তত নিজের ক্ষেত্রে তাই দেখেছে সায়রা, তিক্ততার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারছে। ফাহিমের অবহেলা ক্ষমা করতে পারছে না। অভিমান, জেদ আর ক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, ফাহিম যদি সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করে, সায়রা অন্তর থেকে জানে, সব ভুলে নিজেকে সঁপে দেবে তার হাতে; সমস্ত তিক্ততা, অভিমান কোথায় হারিয়ে যাবে!

সকালে ওঠার পর থেকেই অনুভব করছে আগের দিনের মত খারাপ লাগছে না। ভালবাসার মানুষটির জন্যে ত্যাগ করতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ। ফাহিম হয়তো কিছুটা অহঙ্কার প্রকাশ করেছে, কিন্তু মানুষটার সবকিছুই ভাল লাগে ওর, অহঙ্কারটা তো আলাদা কিছু নয়!

আরেকবার অন্তত চেষ্টা করবে, সিদ্ধান্ত নিল সায়রা। চিঠিটা দেখাতে হবে ফাহিমকে, ওটা দেখলে ওর ব্যাখ্যা শুনতে রাজি হবে সে। কালকের মত নিশ্চই খেপে নেই এখন? সবচেয়ে বড় কথা,

অভিমান করে থাকলে নিজের সুখ বিসর্জন দিতে হবে ওকে এবং তাতে ফাহিমেরও লাভ হবে না।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। নাস্তা খাওয়ার পর নিজের কামরায় চলে এল সায়রা, বৃষ্টি থামার কিংবা কমার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ওর ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগটা ছাড়ছে না বেরসিক বৃষ্টি। বন্ধ তো হয়ইনি, বরং বেড়েছে আরও।

প্রায় অধৈর্য বোধ করছে ও। বৃষ্টি থামছে না কেন? সায়রা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে আজ আর ওকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না ফাহিম। যেভাবেই হোক তাকে বোঝাবে। বেরসিক বৃষ্টি ওর সুযোগ সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, দেরি করিয়ে দিচ্ছে মধুর সমঝোতার মুহূর্তগুলো। দরকার হলে আবারও দেখা করবে, চিঠি লিখবে, ফোন করবে…বারবার চেষ্টা করবে। তবু ফাহিমের অভিমান ভাঙাতে হবে। ভালবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর একদিন বুঝিয়ে দেবে প্রিয় মানুষ অবহেলা করলে কেমন লাগে…বুকের কত গভীরে সর্বগ্রাসী ক্ষত তৈরি হয়…মমতা বা সহানুভূতিতে সেই ক্ষত সারে না, দরকার শুধুই গভীর ভালবাসার…

সামান্য ভুল বোঝাবুঝির পরিণতিতে ওর জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে হারানোর ইচ্ছে নেই সায়রার।

ফোন করে একটা ক্যাব আনাল আলম। দশটার দিকে কমে এল বৃষ্টি। ক্যাবে চড়ে মিনিট বিশের মধ্যে ফাহিমের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল সায়রা। ডোর-বেল বাজাল ও। এতক্ষণ কিংবা সকাল থেকেই, সাহসী সব ধারণা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল–কিভাবে ফাহিমকে নরম হতে বাধ্য করবে; কিন্তু এখন যেন সেই সাহস কোথায় হারিয়ে গেছে। বুক ধুকপুক করছে ওর, অজানা একটা আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে। আবারও যদি ওকে অবহেলা করে সে? স্রেফ দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়?

বিস্ময়কর হলেও দরজা খুলল জাবির মাহমুদ। আট ইঞ্চি ফাঁক হলো কবাট দুটো, তারই ফাঁক গলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল সে। কি কারণে যেন উদ্বিগ্ন ছিল, ওকে চিনতে পেরে উজ্জ্বল হলো মুখ। প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। শেষবার "ব্লু লেগুন" রেস্তোরাঁর সামনে দেখেছিল তাকে, ঘটনাটা মনে পড়তে অজান্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল সায়রার দেহ।

'ওহ্, তুমি!' বিড়বিড় করে বিস্ময় প্রকাশ করল জাবির।

'ফাহিমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'কিন্তু ও তো নেই।'

ফাহিম থাকবে না, ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি সায়রা। বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুক্ষণের জন্যে ভাষা হারিয়ে ফেলল। 'বোধহয় অফিসে গেছে ও। ও ফিরে আসা পর্যন্ত না হয় অপেক্ষা করব আমি।'

'মনে হয় না বিকেলের আগে ফিরবে ও। তাছাড়া অফিসেও যায়নি। গতকাল বিকেলে কোথাও গেছে। হাস্না খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। সবকিছুই বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

'হাস্না খালার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কিন্তু উনিও তো নেই।'

মৃদু স্বরে কথা বলছে জাবির। কিন্তু চাপা উত্তেজনা তার মধ্যে লক্ষ্য করছে সায়রা। উত্তরগুলো ওকে যতটা হতাশ করছে, কি এক অদ্ভুত কারণে যেন সেগুলো বলতে গিয়েই বেশি অস্বস্তি বোধ করছে জাবির। উঁহুঁ, অস্বস্তি নয়, ভাবল সায়রা, রীতিমত উদ্বেগে ভুগছে সে। অজান্তে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, খানিকটা বিহ্বল বোধ করছে, বুঝতে পারছে কোন একটা অসঙ্গতি আছে কোথাও, কিন্তু ধরতে পারছে না। এখনও দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে জাবির, পাল্লাও পুরোপুরি মেলে ধরেনি। তাকে ছাড়িয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল সায়রা, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

'প্রভা আছে নিশ্চই?'

মাথা ঝাঁকাল সে।

'ওর দেখাশোনা করছে কে?'

'আপাতত আমিই দেখছি।'

'ওর সঙ্গে দেখা করতে পারব?'

সূক্ষ্ম রাগ আর বিরক্তির ছাপ পড়ল জাবিরের চোখে, মুখটা দৃঢ় হয়ে গেছে। সায়রার ভয় হলো হয়তো এবারও রাজি হবে না সে। বদলে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল সে। 'ভেতরে এসো,' বলল নিচু স্বরে। সায়রা ভেতরে ঢুকতেই সশব্দে দরজা বন্ধ করল। প্রায় চমকে উঠল ও। পাশ ফিরে তাকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে, তারপর হলরুমে দৃষ্টি চালাল।

সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে···হলরুমের টেবিলে ছোট্ট একটা সুটকেস, কয়েকটা প্যাকেট পড়ে আছে পাশে। বোধহয় কোথাও যাবে

কেউ। সুটকেসের ওপর প্রভার একটা খেলনা, চিনতে পারল সায়রা। শূন্য দৃষ্টিতে সুটকেসটা দেখল ও, তারপর জাবির মাহমুদের দিকে ফিরল। দৃঢ় চোয়াল দুটো আরও চেপে বসেছে তার, চোখ-মুখ কঠিন দেখাচ্ছে।

'ওগুলো এখানে কেন, প্রভা কোথাও যাবে নাকি?'

'কি মনে হচ্ছে তোমার?' পাল্টা জানতে চাইল সে।

আচমকা শীতল ভয় গ্রাস করল সায়রাকে। জানে না ভয়ের কারণ, কিন্তু বুঝতে পারছে জাবির মাহমুদও ওর এই ভয়টা ধরে ফেলেছে। ফাহিমের সঙ্গে দেখা করতে প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল—প্রভার নার্সারির দিকে যাচ্ছিল জাবির, পেছন থেকে তাকে দেখছিল ফাহিম, শীতল বিদ্বেষ আর রাগ নিয়ে···বিদ্বেষ আর রাগ ছাড়াও, আরও কিছু যেন ছিল···শঙ্কা, নাকি ঘৃণা?

'প্রভা কোথায়?' ফাহিমের শঙ্কা যেন এবার ওর ওপর ভর করেছে, অজান্তে কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'কোথায় ও?'

'এত অস্থির হওয়ার কি আছে, হানি?' ক্ষীণ হাসল জাবির, হঠাৎ করেই স্বাভাবিক হয়ে গেল মুখটা। 'তোমার কি ধারণা, ওর কোন ক্ষতি করেছি আমি?'

বলতে বলতে নার্সারির দরজায় ঠেলা দিল সে। কবাট সরে যেতে ভেতরে রকিং ঘোড়ায় প্রভাকে দেখতে পেল সায়রা। নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল, ছুটে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে কোলে তুলে নিল মেয়েটাকে।

'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ, আন্নি?' জানতে চাইল প্রভা।

'কোথায় যাব?'

'জাবির আঙ্কেলের সঙ্গে। সুটকেসটা আমি নিজেই গুছিয়েছি। অনেক দূরে ঘুরতে যাব আমরা, তাই না, আঙ্কেল?'

'ঠিক বলেছ, প্রভামণি, অনেক দূরে যাব আমরা,' সন্তুষ্টির সঙ্গে সায় দিল জাবির, মুহূর্তের জন্যেও সায়রার মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি।

'কোথায় যাবেন?' প্রভাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে জাবিরের দিকে ফিরল সায়রা। 'ফাহিম কোথায়? কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি···'

'শাট আপ!' খপ্ করে ওর বাহু চেপে ধরল জাবির, তারপর প্রায় টেনে কামরা থেকে বের করল। পেছনে দরজা আটকে দিল। ঠেলা দিয়ে ওকে দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিল, মুখোমুখি হলো এরপর।

তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা যাচ্ছে জাবিরের মুখে, প্রায় কুৎসিত সেটা। চোখে শূন্য দৃষ্টি, সায়রার মনে হলো যেন কোন পাগল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল ওর শরীরের রক্ত।

'দশ মিনিটের মধ্যে রওনা দেব আমরা, সায়রা ডার্লিং। প্রভা যাচ্ছে আমার সঙ্গে। এই হচ্ছে কাহিনী। ফাহিম কোথায়, জানা নেই আমার। হাসনা খালাকে বলেছে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা সময় পাচ্ছি হাতে। সত্যি কথা বলতে কি, হারামজাদার সঙ্গে জীবনে আর দেখা না হলেও দুঃখ থাকবে না আমার!

'বুঝেছ তো, বড় ভাইকে পছন্দ নয় আমার, সায়রা, মাই সুইট! ও হচ্ছে একটা জারজ, ফিটফাট ভদ্রলোক কিন্তু ভেতরে ভেতরে আস্ত শয়তান! ওর ধারণা আমার জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার যেন কেবলই ওর! কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করব! প্রভা আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, হানি!'

'মাথা খারাপ! আপনার সঙ্গে যাব কেন আমি?'

'যাবে, নিশ্চই যাবে!'

'চেষ্টা করেই দেখুন, আমাকে নিতে পারেন কিনা।'

'চেষ্টা তো করতেই পারি। কিন্তু তাতে যে প্রভা ভয় পেয়ে যাবে! এই মুহূর্তে হাসি-খুশি আছে ও। ঠিক এজন্যেই আমার সঙ্গে যাবে তুমি, যাতে সারাক্ষণ এরকম হাসি-খুশি থাকে ও। তাছাড়া ওর যত্নও নিতে পারবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাজেও আসবে তুমি। তোমার সঙ্গ হেলায় ছেড়ে দেব এমন বোকা নই আমি। তুমি একটা মেয়ে বটে, সায়রা, টসটসে একটা কমলার মত! তোমার চাহনিই এত নিষ্পাপ! বহুদিন কোন মেয়ের মধ্যে এত সারল্য চোখে পড়েনি।' বলতে বলতে ঝুঁকে এল সে, এক হাতে সায়রার কাঁধ চেপে ধরল। জাবিরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিস্ফারিত হয়ে গেল সায়রার চোখ। দ্রুত সরে গেল ও।

'পাগল হয়ে গেছেন আপনি!' চিৎকার করল ও। 'আসলে এসবের মানে কি, বলবেন আমাকে? আপনি কি প্রভাকে কিডন্যাপ করতে চাইছেন, বিনিময়ে ফাহিমের কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন?'

সায়রা সরে যাওয়ায় খেপে যায়নি জাবির, বরং এক ধরনের বুনো আমোদ পাচ্ছে। যথেষ্ট সময় আছে হাতে। রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করা যাবে ব্যাপারটা। সায়রা নিজেই মত পাল্টে ফেলবে, কিংবা মত পাল্টাতে বাধ্য করবে ওকে। 'উঁহুঁ, ওর নোংরা টাকার কানাকড়িও চাই

না,' ক্রূর হেসে বলল জাবির। 'আমি চাই হাত জোড় করে আমার কাছে অনুনয় করুক ও, মিনতি করুক প্রভার জন্যে। খোদা, তোমার জন্যেও মিনতি করবে ও! ও যখন তোমাকে ফিরে পাবে, কথা দিচ্ছি নিষ্পাপ অবস্থায় পাবে না। কিন্তু তাতে কি যায়-আসে? আমি যেমন ওর প্রিয় জিনিস কেড়ে নিতে অভ্যস্ত, তেমনি আমার ছুঁড়ে ফেলা জিনিসও সাদরে গ্রহণ করেছে ও! এবারও না হয় করবে! উঁহুঁ, সায়রা, প্রভাকে কিডন্যাপ করছি না আমি। নিজের মেয়েকে কি কিডন্যাপ করার দরকার হয় কারও?'

সায়রা এবার নিশ্চিত হয়ে গেল আসলেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে জাবির মাহমুদের। কিন্তু চাইলেও উড়িয়ে দিতে পারছে না কথাগুলো। এও কি সম্ভব? জাবির নিশ্চই পাগলের প্রলাপ বকছে?

'বিশ্বাস হয়নি, তাই না?' বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে জাবিরের ঠোঁটের কোণে। 'বিশ্বাস করছ না যে প্রভা আসলেই আমার মেয়ে? তোমার ধারণা একবার ফাহিমের ওপর যে মেয়ের চোখ পড়েছে, ভুলেও অন্য কারও দিকে তাকাবে না সেই মেয়ে?' কুৎসিত স্বরে বলে যাচ্ছে সে। 'আফসোস! নিজের বোনকেও চিনতে পারোনি তুমি, সায়রা। স্রেফ একটা বেশ্যা ছিল ও। হাই-ক্লাস প্রস্টিটিউট। আজীবন একজন পুরুষের ঘর করার ইচ্ছে ছিল না ওর।

'সময়টা দারুণ কেটেছে আমাদের—ফাহিম যখন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকত আর ঢাকায় থাকতাম আমি! একবার তো সুযোগ পেয়ে চট্টগ্রামেই চলে গিয়েছিল সায়মা। সত্যি বলছি, অসাধারণ মেয়ে ও। ওর মত মেয়ে সত্যিই বিরল!'

নিজেকে অসুস্থ মনে হচ্ছে সায়রার। মুখ চেপে ধরেছে এক হাতে, যেন বমি করে ফেলবে। যত নোংরাই হোক, ওর অবচেতন মন বলছে আসলে ঠিকই বলছে জাবির, অন্তত সত্যের কাছাকাছি।

'কিভাবে নিশ্চিত জানেন যে প্রভা আপনারই মেয়ে?' কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ওর সমস্ত শঙ্কা, ভয় বা অস্বস্তি। 'ফাহিমের সঙ্গে আপনার চেহারায় অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। প্রভা দেখতে আপনার মত হয়েছে, কথাটা ধোপে টিকবে না।'

'নিশ্চিত জানি, একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট! ফাহিমের অহঙ্কার বা আত্মসম্মান বোধ অনেক বেশি, মাই লাভ। ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক আছে জানার পরও সেই স্ত্রীর সঙ্গে মিশবে সে? উঁহুঁ, দুনিয়ার অন্য কোন পুরুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু ফাহিম সেটা করবে না।

মরে গেলেও না। সায়মা আর ওর আলাদা আলাদা বেডরুম ছিল। প্রভার জন্মের অন্তত এক বছর আগে থেকেই ওদের মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্কটুকুও ছিল না। অন্যদের সামনে সুখী দম্পতির মত আচরণ করত, কিন্তু বিশ্বাস করো, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল না ওদের। একে অন্যকে রীতিমত ঘৃণা করত!'

'কিন্তু...' বলতে শুরু করল সায়রা, কিন্তু ওকে বাধা দিল জাবির। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল সে।

'যথেষ্ট। আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সবকিছু খুলে বলতে অবশ্য আপত্তি নেই আমার, তবে পরে। রওনা দিয়ে নিই, যাওয়ার পথে সবকিছু খুলে বলব না হয়। ফাহিম হয়তো সময়ের আগেই ফিরে আসতে পারে, সুযোগটা আমি কোন ভাবেই হারাতে চাই না।'

সায়রা ভেবেছিল কোন ছুতোয় দেরি করিয়ে দেবে, ততক্ষণে হয়তো এসে পড়বে ফাহিম। কিন্তু জাবিরের তাড়ায় ভেস্তে গেল ওর পরিকল্পনা। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?' ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল ও, নিশ্চিত ধরে নিয়েছে প্রশ্নটা উপেক্ষা করবে সে।

কিন্তু খোশমেজাজে আছে জাবির। নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত, জানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে পরিস্থিতি। 'প্রথমে হালছড়ি যাব আমরা,' প্রসন্ন কণ্ঠে বলল সে। 'ফাহিমের একটা বাংলো আছে ওখানে, বহুদিন ধরে ওটা ব্যবহার করছে না কেউ। কয়েকদিন থাকব সেখানে। প্রভাকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশকে জানাবে ফাহিম, ক'দিন হয়তো আমাদের খুঁজে বেড়াবে ঠোলার বাচ্চারা। ওদের উৎসাহ কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঢাকার এত কাছে থাকব আমরা, চিন্তাই করতে পারবে না কেউ।'

'তারপর?'

'তারপর চট্টগ্রামে চলে যাব। বেশ কিছু বন্ধু আছে আমার, আমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে এরা। কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় দেবে আমাদের। হয়েছে, আর কোন প্রশ্ন নয়। প্রভাকে নিয়ে তৈরি হও। আগেই বলে রাখছি, বাইরে যখন বেরোব, এমন কিছু কোরো না যাতে অন্যরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তেমন কিছু করলে সত্যিই ভুল করবে, সায়রা, পরিণতিতে তোমাকে যাতে আজীবন দুঃখ করতে হয়, সেটা নিশ্চিত করব আমি। পরিষ্কার? একটা কথা মনে রেখো, প্রভা আমার মেয়ে হলেও ওর প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই

আমার। ও মরে গেলেও কিছু যায়-আসে না আমার! বুঝেছ?'

'আপনি সত্যিই নিষ্ঠুর মানুষ! যান, ওকে নিয়ে আসছি আমি।'

ছোট্ট রেনকোট গায়ে চাপাল প্রভা, সায়রাই সাহায্য করল ওকে। জুতো পরিয়ে উলের টুপি চাপিয়ে দিল মাথায়। বৃষ্টিতে মাথা ভিজবে না আর, ঠাণ্ডাও লাগবে না। সহজ ভাবে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু জানে কাজটা মোটেও সহজ নয়। শঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রভাকে দেখল—নাহ্, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি ওর মানসিকতায়। মেয়েটির প্রতি ওর আন্তরিকতা আগের মতই আছে, এমনকি যখন জানা হয়ে গেছে যে আসলে ফাহিমের মেয়ে নয় ও, বরং জাবির মাহমুদের মত জঘন্য এক লোক ওর বাবা। ফাহিম নিজেও জানে বোধহয়, যদি জাবিরের কথাগুলো সত্যি হয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও প্রভাকে ভালবাসে সে।

কি যেন বলেছিল ফাহিম? প্রতিটা শব্দ মনে পড়ল সায়রার: *যেদিন আমার বাড়িতে পা রেখেছ, সেদিন থেকেই তোমার মেয়ে ও, সায়রা। আমার সবকিছুই তোমার, আধাআধি। আমার বন্ধু তোমার বন্ধু, শত্রু তোমার শত্রু!*

অজান্তে শিউরে উঠল ও। জাবিরের আসল উদ্দেশ্য কি? কি চায় সে? যাই চাক, ঠেকাতে হবে। প্রভার কোন ক্ষতি করতে দেয়া যাবে না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জাবির। প্রভার হাত ধরে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সায়রা। 'এক মিনিট সময় দেবেন?' নির্দোষ কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'প্রভা বোধহয় বাথরুমে যাবে।'

সন্দিহান দৃষ্টিতে ওকে দেখল জাবির, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু দেরি কোরো না আবার। আর হ্যাঁ, দরজা লক্ করার দরকার নেই, ভিড়িয়ে দিলেই চলবে।'

নার্সারির বাথরুমে ঢুকে দ্রুত কাজ শুরু করল সায়রা। এদিকে সমানে প্রতিবাদ করছে প্রভা, বাথরুম করার দরকার নেই ওর, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই সায়রার। কাঁপা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করল, দ্রুত হাতে হালছড়ি কথাটা লিখল আয়নায়।

'কি লিখছ, আন্নি?' উৎসাহী স্বরে জানতে চাইল প্রভা।

'শ্‌শ্‌শ্!' ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করল সায়রা। 'মজার একটা খেলা খেলছি আমরা, প্রভা। কাউকে কিছু বলা যাবে না।'

গোলাপী রঙের লেখাগুলো দূর থেকে চোখে পড়বে অনায়াসে,

আশা করছে ও...জাবিরও দেখতে পাবে। যদি দেখে ফেলে সে? চিন্তাটা প্রায় অস্থির করে তুলল ওকে। বোকা নয় সে। আবারও লিখতে শুরু করল সায়রা, দ্রুত হাতে লিখছে; তবে এবার আগের চেয়ে ছোট করে। ওঅশ বেসিনের পেছনে একেবারে নিচুতে লিখেছে লেখাটা। মাত্র তিনটা অক্ষর লিখেছে, ঠিক এসময়ে পেছনে দরজা খুলে গেল।

'জলদি এসো!' জরুরী কণ্ঠে তাগাদা দিল জাবির, মুখ কঠিন হয়ে গেছে আবারও।

পেছনে দরজা খোলার শব্দে তৎক্ষণাৎ বেসিনের কাছ থেকে সরে গেছে সায়রা, ঘুরে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু লিপস্টিকটা রয়ে গেছে হাতে। চোখে-মুখে নিখাদ শঙ্কা, জানে ধরা পড়ে গেছে। সরাসরি আয়নায় গিয়ে পড়ল জাবিরের সন্দিহান দৃষ্টি, লাল জ্বলজ্বলে লেখাগুলো চোখে পড়তে মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল মুখ, কুৎসিত রাগে ফেটে পড়বে যেন। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। সমীহ ভরা দৃষ্টিতে দেখল সায়রাকে, যেন ওর সাহস এবং চেষ্টার তারিফ করছে মনে মনে।

'মুছে ফেলো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও, টয়লেট পেপার তুলে নিয়ে নামটা মুছে ফেলল আয়না থেকে। তারপর তিক্ত মনে প্রভার হাত ধরে দরজার দিকে এগোল, জাবিরকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। আচমকা পেছন থেকে ওর বাহু খামচে ধরল জাবির, চমকে তাকাল সায়রা, সন্ত্রস্ত। পাঁচটা আঙুল চেপে বসেছে ওর বাহুতে, রীতিমত ব্যথা অনুভব করছে।

'ভুলেও অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না, হানি। একবার চেষ্টা করেছ, সেটাই যথেষ্ট, আমিও ভুলে যাব ব্যাপারটা। ফের যদি বেতাল কিছু করো, তোমার বাপ-মার নাম ভুলিয়ে ছাড়ব আমি!'

নিচে নেমে এল ওরা। কার-পার্কে একটা নীল রঙের হোন্ডা সিভিক অপেক্ষায় ছিল। পেছনের সীটের দরজা মেলে ধরল জাবির। নিতান্ত হতাশার সঙ্গে উঠে বসল সায়রা, ওর কোলে বসেছে প্রভা। আশা ছেড়ে দিয়েছে ও। বেসিনের একেবারে নিচের দিকে ছোট্ট তিনটে অক্ষর দেখতে পাবে ফাহিম? বুঝতে পারবে ঠিক কোথায় যাচ্ছে ওরা?

ফাহিমের কথা চিন্তা করতে চোখ ভিজে উঠল ওর। কোথায় সে? বাসায় ফিরে এসে যখন দেখবে প্রভা নেই, কি ভাববে? কতটা কষ্ট পাবে সে? আর অভিমান কত ভুল বোঝাবুঝি গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে এখন! ফাহিম যদি ধরেই নেয় যে সত্যিই তাকে সায়মার খুনী মনে

করে ও, তাতে কি আসলে কিছু আসে-যায়, যেখানে প্রভা আর ও দারুণ বিপজ্জনক এক লোকের হাতে পড়েছে? কোন সন্দেহ নেই, জাবির মাহমুদ সত্যিই বিপজ্জনক।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে জাবিরের দিকে তাকাল সায়রা। নির্লিপ্ত মুখে ড্রাইভ করছে সে, কিন্তু মাঝে মধ্যে আড়চোখে দেখে নিচ্ছে ওদের। যেন মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করছে না। অথচ চাইলেও কিছু করার নেই ওদের, গাড়ির দরজা অটো-লক্, এবং দরজাগুলো লক্ করে দিয়েছে জাবির।

মাঝে মধ্যে আনমনে হাসছে সে, ঠোঁটের কোণ বেঁকে যাচ্ছে। দারুণ তৃপ্তিকর কিছু কল্পনা করছে বোধহয়, কিংবা সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা। স্টিয়ারিঙের ওপর পড়ে আছে শিথিল হাত, আয়েশ করে বসেছে সীটে।

শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। ধরা পড়ার আশঙ্কা কমে গেছে, জানে বলেই সন্তুষ্ট বোধ করছে জাবির। একবার প্রায় শব্দ করে হেসে উঠল। এদিকে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে সায়রা, নতুন আশঙ্কার জন্ম হচ্ছে বুকে। সত্যিই কি ফাহিমকে করজোরে মিনতি করতে বাধ্য করবে জাবির, কিংবা আসলেই কি প্রভার জন্যে নিজেকে এতটা ছোট করবে ফাহিম? ওর জন্যে করবে?

টঙ্গী রোড ধরে এগোচ্ছে এখন ওরা। হালকা গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে জাবির, কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে না। নিশ্চিন্তে আছে সে। আড়চোখে দেখে নিয়েছে হতাশায় বিপর্যস্ত সায়রাকে, আচমকা সাহসী হয়ে ওঠার আশা বাদ দিয়েছে ইতোমধ্যে। বরং প্রভাকে নিয়ে ব্যস্ত ও এখন, মেয়েটিকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। শুরুতে আনন্দ পেলেও প্রভাও যেন এখন বুঝতে পারছে বিপদটা—স্রেফ ঘুরতে যাচ্ছে না ওরা!

পেছনে তাকাল সায়রা। কিন্তু অসংখ্য গাড়ি ছাড়া কিছু চোখে পড়ছে না, ঢাকাকে কি আলাদা ভাবে চেনা সম্ভব? ঘোলাটে দেখাচ্ছে পুরো শহরের অবয়ব।

'পেছনে তাকিয়ে দেখছ সাহায্য আসছে কিনা, সায়রা? লাভ হবে না, সাহায্য করতে আসবে না কেউ! এমন কোন বীরের জন্ম হয়নি যে তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে। তোমার প্রিয় ফাহিম ইমতিয়াজ এখন বহু দূরে আছে, এবং এখানে আসার চিন্তা মাথায় আসবে না ওর। নরকের মত জায়গাটা ঘৃণা করে ও, এখানে এসে সায়মা আর আমাকে

একসঙ্গে আবিষ্কার করার পর থেকে আর এ-মুখো হয়নি।' হেসে উঠল জাবির, হুইলের সঙ্গে চেপে বসল হাত দুটো। 'এই ব্যাপারটার সুরাহা করে নিতে হবে এবার, কিছু শোধ-বোধ বাকি রয়ে গেছে। জানো কি করেছিল হারামজাদা? আদি যুগের স্বামীর মত আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল…' আচমকা চড়া হয়ে গেল জাবিরের কণ্ঠ, প্রায় চিৎকার করছে এখন।

হাত দিয়ে প্রভার কান চেপে ধরল সায়রা, নোংরা কথাগুলো মেয়েটির কানে যাতে না যায়। সৌভাগ্যের বিষয় ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা, সায়রা প্রার্থনা করল শিগ্‌গিরই যাতে ওর ঘুম না ভাঙে।

'টেনে হিঁচড়ে আমাকে বাংলো থেকে বের করল ও, তারপর সমানে কিল-ঘুসি মারতে থাকল!' নিখাদ বিদ্বেষের সঙ্গে খেই ধরল সে। 'সায়মার সামনেই পেটাল আমাকে! সবচেয়ে মজার বিষয়, ফাহিম আমাকে পেটাচ্ছে আর অর্ধ-নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সেটা উপভোগ করল সায়মা। কারণটা শুনবে? পুরুষরা ওর দখল নিয়ে মারামারি করছে, এটাই ওর আনন্দের কারণ। কিন্তু এভাবেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে ও, জোর করে সেদিন ওকে বাসায় নিয়ে গেলেও এরপর থেকে সায়মার ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি ফাহিম।'

'প্রভার জন্মের আগেই কি এই ঘটনা ঘটেছে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সায়রা, আশা করছে প্রশ্নটা হয়তো শান্ত করে তুলবে জাবিরকে।

'ঠিক ধরেছ। হালছড়ির ওই ঘটনার পর সায়মা বা আমি, কেউই কিন্তু নিরস্ত হইনি। বরং আমাদের যোগাযোগ আরও বেড়ে গেল। সুযোগ পেলেই মেলামেশা করেছি। ফাহিমের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছি, এই আনন্দ বেশিদিন থাকেনি আমার। কিন্তু হঠাৎ করেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল সায়মা। ফাহিমও দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাল। জেনে গেল আমার কারণেই প্রভার জন্ম। সেই থেকে আমার ওপর ছড়ি ঘোরানো শুরু করল, ওকে জমা-খরচ দিয়ে চলতে হচ্ছে।'

'কিন্তু প্রভাকে নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করেছে ও।'

'ঠিক। কারণ ফাহিম বরাবরই নরম মনের মানুষ। অন্যের বাচ্চা মানুষ করা কতটা মহত্ত্বের ব্যাপার, জানা নেই আমার। আমি হলে তা করতাম না।'

'তারপরও…আপনার সঙ্গে ফাহিমের সত্যিকার মিল বোধহয় কমই, তাই না?'

'আসলে কোন মিলই নেই, এবং সেজন্যে আমাদের কারও দুঃখ নেই! আমি কখনোই বুঝতে পারিনি কেন মেয়েটাকে নিজের বলে স্বীকার করে নিয়েছে ও, অথচ আমার সঙ্গে স্বার্থপরের মত আচরণ করছে! হালছড়ির ওই ঘটনার পর ভেবেছিলাম সায়মাকে ডিভোর্স দেবে, তা তো দেয়ইনি, বরং অবৈধ একটা বাচ্চাকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করছে! চিন্তা করতে পারো? আমি অন্তত এর কোন অর্থ খুঁজে পাইনি।'

প্রভার দিকে চলে গেল সায়রার শঙ্কিত দৃষ্টি। খোদার কৃপা! এখনও ঘুমাচ্ছে মেয়েটা।

সায়রা আন্দাজ করল জয়দেবপুর চৌরাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে বাইরের কোন কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবুও বোর্ডবাজার নামে একটা জায়গার পাশে গাজীপুরের নাম দেখে বুঝে নিয়েছে গাজীপুরের কাছাকাছি আছে।

হঠাৎ করেই সায়মার চিঠিটার কথা মনে পড়ল ওর। কেউ যদি বলতে পারে তাহলে জাবিরই বলতে পারবে ঠিকমত। 'শওকত ভাই কি আপনাকে বলেছে যে আমার কাছে অদ্ভুত একটা চিঠি লিখেছিল সায়মা?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ও। 'ফাহিমকে কি যেন বলতে চাইছিল ও, কিন্তু সেটা জানার পর ফাহিমের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা ভেবে বলতে সাহস করতে পারছিল না?'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল জাবির। 'হ্যাঁ, বলেছে। বেচারার জন্যে করুণাই হয় আমার। সাংবাদিক মানুষ সবসময় চালাক হয় জানতাম, কিন্তু এই ব্যাটা যে এত বোকা, ভাবতেই পারিনি! ও ধরে নিয়েছে ফাহিমই খুন করেছে সায়মাকে। চিন্তাটাই হাস্যকর। সবারই সামর্থ্যের সীমা আছে, তাই না? ফাহিম ইমতিয়াজেরও আছে। কাউকে খুন করবে ও, তাও মেয়েমানুষকে? অসম্ভব!'

'কিন্তু আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছেন যে ফাহিমই খুন করেছে সায়মাকে!'

'নিশ্চই। কেন নয়? আনন্দটা কোথায় বুঝতে পারছ, সায়রা? সবাই ওকে নিপাট ভদ্রলোক ভাবে, কোন অন্যায় বা কুকর্ম যেন ওর দ্বারা সম্ভব নয়! আমার দু'একটা কথায় বা ইঙ্গিতে যদি ওর সম্পর্কে কারও ধারণা পাল্টে যায়, তাহলে মজা পাব না আমি? ব্যাপারটা এরকম দেখাবে, আগে থেকেই জানতাম আমি। সম্পূর্ণ আয়োজনটাই ছিল এমন যাতে দুর্ঘটনা মনে হয়, আর কেউ যদি সন্দেহপ্রবণ হয়ে

ওঠে, তাহলে ফাহিমকেই সন্দেহ করবে।'

'মানে? কি বলছেন আপনি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

কিন্তু হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল জাবির। যেন বুঝতে পেরেছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই বলে ফেলেছে। বাকি সময়ে আর একটা কথাও বলল না, নীরবে ড্রাইভ করল পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। রাস্তাটাও খারাপ। শফিপুর পেরিয়ে আসার পর ডানে মোড় নিয়ে কোনাবাড়ীর রাস্তায় ঢুকে পড়ল গাড়ি।

সাদা দেয়াল ঘেরা একটা প্লটের সামনে থামল গাড়ি। গেটে বড়সড় তালা ঝুলছে। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গেট খুলল জাবির। সায়রা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল চাবি আছে তার কাছে। ফিরে এসে গেট দিয়ে ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। খোলা মাঠের কোণে সাদা বাংলো। কাঁঠাল, আম, দেবদারু আর বিভিন্ন গাছ রয়েছে পাশে। লনে রয়েছে হরেকরকম ফুল গাছ, কিন্তু বহুদিন যত্ন নেওয়া হয়নি বোধহয়, আগাছা জন্মেছে বাগানে। মাঠের ঘাসগুলো বড়সড় হয়ে গেছে।

উৎসুক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল সায়রা। দূরে রাস্তার পাশে কয়েকটা ঝুপড়ির মত দোকান চোখে পড়ছে। আর কিছুই নেই, বিরান মাঠের ওপাশে গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

সপাটে গাড়ির দরজা আটকাল জাবির। 'নেমে এসো!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল সে।

প্রভাকে কোলে নিয়ে নেমে এল সায়রা। এখনও ঘুমাচ্ছে মেয়েটি। দেখল বাংলোর মূল দরজার তালা খুলছে জাবির।

'কোন্ সময় যে কোন্ চাবি কাজে লেগে যায়!' হাস্যোজ্জ্বল মুখে ওর দিকে ফিরে তাকাল সে, ক্লিক্ করে খুলে গেল তালা। 'সবসময় সঙ্গে চাবি রাখি আমি।'

'কোথায় এসেছি আমরা?' প্রভার কণ্ঠে সংবিৎ ফিরল ওদের, নড়েচড়ে বসেছে সায়রার কোলে। 'আব্বু কোথায়?'

কোমল কণ্ঠে প্রভার উদ্বেগ দূর করতে তৎপর হয়ে উঠল সায়রা। জানাল যে বাড়িটা ওর বাবার, এবং শিগ্‌গিরই চলে আসবে সে। মুহূর্তের জন্যে সন্তুষ্ট মনে হলো প্রভাকে।

ফিরে গিয়ে গেটের তালা আটকে দিল জাবির। তারপর বাংলোর ভেতরে ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল সায়রা। প্রভা নেমে গেছে কোল থেকে, ফুল গাছ নিয়ে ব্যস্ত। 'আন্নি, দেখো, কি সুন্দর ফুল!'

ওর দিকে এগিয়ে গেল সায়রা।

'ঘর-দোর পরিষ্কার করতে হবে দেখছি!' কিছুটা অসন্তোষের সঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করল জাবির। 'আপাতত বাইরের কামরাটাই ব্যবহার করব আমরা। এ.সি আছে। ফাহিমের কাজে আসলে খুঁত থাকে না, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা ঠিকই রেখেছে। যাক্‌গে, আপাতত তোমাদের কাউকে লাগবে না আমার...'

মিনিট ত্রিশ পর ডাক পড়ল ওদের। ভেতরে ঢুকল সায়রা। বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি বলে স্যাঁতস্যাঁতে লাগছে কামরাটা, ভেতরে ভাপসা গন্ধ। দরজা-জানালা খুলে দিলে অবশ্য চলে যাবে গন্ধটা। ঘরের অন্য কোণে সোফায় বসে আছে জাবির। মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে সে। টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করেছে, এ.সি ছেড়ে দিয়েছে।

'ক'দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত,' স্বস্তির সুরে স্বগতোক্তি করল সে। 'ভুলেও এখানে আমাদের খুঁজতে আসবে না কেউ।'

'উঁহুঁ, এখানে আটকে রাখতে পারবেন না আমাদের!' প্রতিবাদ করল সায়রা। 'ওরা নিশ্চই খোঁজ করবে। ফাহিমও ভাবতে পারে এখানে আসতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চই খোঁজ করবে, কিন্তু এখানে করবে না।'

'দেখুন, জাবির ভাই। প্রভা আর আমাকে যেতে দিন। শপথ করছি, কাউকে কিছু বলব না আমি।'

ক্রূর হাসি দেখা গেল জাবিরের মুখে। 'তার পরোয়া করছে কে? তুমি কি মনে করো আমি কোথায় থাকি কিংবা কি করি, তার পরোয়া করে ফাহিম? মোটেই না, যতক্ষণ ওর বা প্রভার ধারে-কাছে না থাকছি, আমার ব্যাপারে কিছুই যায়-আসে না ওর।

'পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখো। তুমি এবং প্রভা, দু'জনেই এখন আমার হাতের মুঠোয়। না, মাই সুইট, এখানে কয়েকটা দিন থাকছ তুমি, তারপর চট্টগ্রাম যাব আমরা। দুশ্চিন্তায় যখন পাগল হওয়ার দশা হবে ফাহিমের, তখন না হয় প্রভার চুলের কয়েক গাছি বা ওরকম কিছু পাঠিয়ে দেব!'

জ্বলছে জাবিরের চোখ দুটো। বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। অজান্তে শিউরে উঠল সায়রা, সীমাহীন আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছে–নিজের জন্যে এবং প্রভার জন্যে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রভার দিকে তাকাল ও, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। ধুলোয় ভরা জানালার কাচকে ইজেল বানিয়ে এক আঙুলে কাল্পনিক ছবি আঁকছে, এ মুহূর্তে ওদের কথা প্রায় ভুলেই গেছে।

'আপনি যা চাইবেন, আমার তো মনে হয় ফাহিম তাই দিতে রাজি হবে...'

'আগেও বলেছি তোমাকে, টাকা চাই না আমার! জিনিসটা ওর এত আছে যে ওর কাছ থেকে যদি বিশ-পঞ্চাশ লাখও আদায় করি, তাতে কিছুই যাবে-আসবে না ওর। আমি চাই এজন্যে ভুগুক সে।

'ওর বউকে একসময় নিজের করে নিয়েছিলাম। আমার জন্যে মধুর প্রতিশোধ হলেও তাতে যথেষ্ট ভোগেনি ফাহিম, স্রেফ ওর অহঙ্কারে কিছুটা আঘাত লেগেছিল; কারণ এর অনেক আগে থেকেই ওদের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছিল, সায়মার কি হলো বা না-হলো তাতে কেয়ার করত না ফাহিম। সায়মার মৃত্যুর পর...ভেবেছিলাম দোষটা ওর ঘাড়ে পড়বে। কিন্তু কিভাবে যেন বেঁচে গেল, বড় পিছলা লোক!'

'কি বলছেন আপনি!?'

'কি মনে হয় তোমার? তুমি কি জানো না, হানি? সেদিন কাণ্ডাইয়ে আমিও ছিলাম। সকালে রীতিমত হাতাহাতি করেছে ফাহিম আর সায়মা। দারুণ খেপে গিয়েছিল তোমার বোন, কারণ আবারও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল ও, কিন্তু ফাহিমকে বলার সাহস হচ্ছিল না। একবার বেপরোয়া হয়ে প্রভার জন্ম, দ্বিতীয়বার নিশ্চই মেনে নেবে না ফাহিম? আর ঠিক এ কারণেই মরতে হয়েছে ওকে।

'ওর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পেছনে আমি দায়ী ছিলাম না। নিশ্চিত বলতে পারি, ফাহিমেরও কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু ফাহিমকে বলা ছাড়া উপায় ছিল না সায়মার। ভেবেছিল সব শুনে ওকে ডিভোর্স দেবে ফাহিম, চিন্তাটাই অস্থির করে তুলছিল ওকে। অথচ ফাহিমের টাকা আর প্রতিপত্তি ছাড়া যে চলবে না, সেটাও বুঝতে পেরেছিল। এও জানত ওর প্রতি কোন অনুরাগ না থাকলেও স্রেফ নিজের সম্মানের জন্যে হলেও সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে চাইবে ফাহিম।

'নিরুপায় হয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইল ও, প্রস্তাব দিল বেড়ালের ঘণ্টা যেন আমিই গলায় ঝুলাই; 'তাহলে ওর পাপের বোঝা হালকা হবে, আমার ওপর দিয়েই যাবে যত ঝামেলা। কিন্তু আমি কেন আরেকজনের পাপের দায় নেব? রাজি হলাম না দেখে খেপে গেল তোমার বোন, হুমকি দিল ফাহিমকে জানিয়ে দেবে এবারও ওর বাচ্চার বাবা আমি। কিভাবে সেটা ঘটতে দেই? সবে তখন ফাহিমের সুনজরে পড়েছি আমি, কিছু কিছু ব্যাপারে আমাকে ছাড় দিচ্ছিল ও। তারপরই সুযোগটা পেয়ে গেলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মারার মওকা এসে

গেল!'

সায়রার মনে হচ্ছে কাল্পনিক কোন গল্প শুনছে, কিন্তু অদ্ভুত এবং শুনতে অস্বস্তিকর হলেও সবই সত্যি, জানে ও, অন্তর থেকে অনুভব করতে পারছে। ভাইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা এতদিন দমিয়ে রেখেছিল সে কিভাবে কে জানে, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের আগুনে পুড়েছে নিজে, কিন্তু আচমকাই শওকত হাসানের দু'একটা খোঁচায় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে হিংস্র মানুষটা।

আচমকা দারুণ দুর্বল বোধ করল সায়রা, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। ধপ্ করে একটা সোফায় বসে পড়ল।

'তারমানে···সায়মাকে আপনিই খুন করেছেন!'

'নিশ্চই! এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বেঈমানী করে পার পায়নি কেউ। সিদ্ধান্ত নিলাম দু'জনকেই শেষ করে দেব। সায়মাকে তখন হুমকি মনে হচ্ছিল, তাছাড়া ওর প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফাহিমকেও সরিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে আর আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না কেউ।

'দু'জনেরই মারা যাওয়া উচিত ছিল। শয়তানের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ফাহিম, একটা টোকাও লাগেনি ওর গায়ে। গাড়িটা পুরানো হওয়ায় কেউ ভাবতেও পারেনি হাইড্রলিক সিস্টেমের তার কেটে ফেলেছি আমি।' হাসল সে, মধুর এবং ভদ্র হাসি, কিন্তু সায়রার সারা দেহে শীতল আতঙ্ক ধরিয়ে দিল হাসিটা। 'খুনের ব্যাপারে লোকজন কি বলে জানো তো, হানি? প্রথম খুনটাই কঠিন। তারপর কিন্তু সহজ এবং গা-সওয়া হয়ে যায়।

'কোন কিছুই হারানোর নেই আমার। তোমাকে খুন করতেও এতটুকু বাধবে না। তোমার সুন্দর ওই গলা দু'হাতে চেপে ধরে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে ভালই লাগবে আমার···বাতাসের অভাবে ছটফট করবে তুমি···আহ্, দেখতে কি দারুণ লাগবে! কয়েকটা দিন দারুণ আনন্দে কাটবে আমাদের, তারপর তোমাকে খুন করতে হয়তো একটু খারাপই লাগবে, তবে সময়মত কাজটা ঠিকই সেরে ফেলব!'

অজান্তে গলায় চলে গেল সায়রার হাত, যেন সবল হাতে গলা চেপে ধরেছে জাবির। দেখল ওর কাছে চলে এসেছে প্রভা, ছবি আঁকার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। 'চলো না, বাইরে যাই, আন্নি?' ওর গলা জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। 'এখানে কেমন যেন গন্ধ!'

দু'হাতে বুকের সঙ্গে মেয়েটাকে চেপে ধরল সায়রা।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে হেসে উঠল জাবির, এর মধ্যেও মজার কি যেন খুঁজে পেয়েছে।

'আব্বুর কাছে যাব। আমাকে একটা গিফট কিনে দেওয়ার কথা আজ! আব্বু কোথায়, কখন আসবে?'

'অফিসের কাজ শেষ হলেই চলে আসবে,' সান্ত্বনা দিল সায়রা, চেষ্টাকৃত হাসি ধরে রেখেছে মুখে। 'ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের।'

'ঠিক বলেছ!' একমত হলো জাবির। 'ধৈর্য ধরো!'

বিকেল পর্যন্ত, বাকি সময়টা ক্রমে যেন দুঃস্বপ্নে রূপ নিতে শুরু করল, অন্তত সায়রার জন্যে। সারাক্ষণ চেষ্টা করছে যাতে মন খারাপ না হয় প্রভার। কয়েকটা দিন এখানে থাকতে হবে চিন্তাটাই বিপর্যস্ত করে তুলছে ওকে–খাবার নেই, মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই! মাঝে মাঝে ওর এতটাই খারাপ লাগছে যে হতাশায় কাঁদতে ইচ্ছে করছে। মনে বিরাট আশা নিয়ে মেসেজটা লিখে এসেছে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কেউ সেটা খেয়াল করেনি কিংবা করলেও ওটার অর্থ বুঝতে পারেনি।

পালানোর চেষ্টা করা উচিত, চিন্তাটা কয়েকবারই এসেছে মনে। ফাহিম বা অন্য কেউ এসে উদ্ধার করবে, এই প্রত্যাশা আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করেছে। সুতরাং নিজের চেষ্টায় পালাতে হবে ওদের। জাবির মাহমুদও মানুষ, ঘুমাবেই সে। সারাক্ষণ ওদেরকে চোখে চোখে রাখতে পারবে না। সুযোগ পেলে জাবিরের মাথায় কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে হলেও পালাতে চাইছে ও, সেই সাহস আছে ওর, প্রভা আর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সাহস করতেই হবে। হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, এমন জিনিসের অভাব হবে না। টেবিলে কয়েকটা ভারী ফুলদানি আছে, দুটো আবার পেতলের, বুক শেল্‌ফে ভারী বই আছে; এছাড়াও বাথরুমে বেসিনের ওপরে আয়নার সঙ্গে লাগানো ধাতব হ্যাঙার আছে, অনায়াসে ওগুলোর যে কোন একটা খুলে নেওয়া যাবে। ব্যবহার করতে, কিংবা লুকিয়ে রাখতেও অসুবিধে হবে না। তবে জিনিসটা সরিয়ে নিলে জাবিরের চোখে পড়তে পারে। এর যে কোন একটা কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করলে অজ্ঞান হয়ে যাবে যে কোন লোক।

বিকেল থেকে জাবিরের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা বোধ করতে শুরু করল

সায়রা। প্রভা প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। পিকনিকের আমেজ উধাও হয়ে গেছে ওর মধ্যে থেকে, অনেক চেষ্টার পরও ওকে সুস্থির করতে পারছে না সায়রা। বয়সটা কম হলে কি হবে, সহজাত প্রবৃত্তি বশেই মেয়েটা টের পেয়ে গেছে যে অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটছে এখানে। প্রথমেই সায়রার কাছে জানতে চাইল, কোন উত্তর না পেয়ে শেষে চাচার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া শুরু করল।

'চাচ্চু, বাড়ি যাব না আমরা? চলো না! আব্বু নিশ্চই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে!' করুণ স্বরে মিনতি করল ও।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মেয়েকে দেখল জাবির। কি কারণে যেন খেপে আছে সে। হাজারটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছে সামনে, অথচ এর কোনটাই আগে ভাবেনি। ঠেলে প্রভাকে সরিয়ে দিল সে, প্রভার আহত দৃষ্টি দেখেও বিন্দুমাত্র গলল না মন। 'কোথাও যাচ্ছ না তুমি, পুঁচকে মেয়ে! সরে যাও আমার সামনে থেকে!'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল প্রভা, ভয় পেয়েছে জাবিরের কঠিন রাগ দেখে। ছুটে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরল সায়রা, কোলে তুলে নিল। 'আপনি সত্যিই নিষ্ঠুর! কিভাবে এমন কাজ করলেন?' চিৎকার করে অসন্তোষ প্রকাশ করল।

'চুপ করো! ওকে সরিয়ে নাও আমার সামনে থেকে। ওখানে, দূরে গিয়ে বসো, যাতে তোমাদের ওপর চোখ রাখতে পারি আমি।'

'সারাক্ষণ এভাবে আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবেন না আপনি,' শুরু করেও থেমে গেল সায়রা, হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে জাবিরকে আসলে সতর্ক করে দিচ্ছে। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে, আফসোস করে লাভ নেই।

নতুন এক বিপদ যেন দেখতে পাচ্ছে জাবির, সরু চোখে দেখছে সায়রাকে। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়াল, ভয়ে পিছিয়ে গেল সায়রা। কিন্তু কাছে এসে খপ করে ওর বাহু চেপে ধরল জাবির। 'এসো আমার সঙ্গে!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে।

'কোথায়?'

'প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছি তোমাকে। আসতে বলছি, আসবে!'

এগারো

সায়রা প্রায়ই ভাবছে কেন অক্ষরে অক্ষরে জাবিরের প্রত্যেকটা নির্দেশ মেনে চলছে ও। এমন নয় যে সঙ্গে পিস্তল আছে তার, ওটা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে কিংবা সত্যিকার কোন হুমকি দিয়েছে। একা হলে অনেক আগেই পালানোর চেষ্টা করত, কিন্তু সঙ্গে প্রভা আছে বলেই যত সমস্যা। ইচ্ছে করলেও মরিয়া হয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া এখনও খেপা জানোয়ারের মত সতর্ক, সন্দিহান হয়ে আছে জাবির, সারাক্ষণ নজর রাখছে ওদের ওপর, মুহূর্তের জন্যেও ঢিলেমি দেয়নি। সহজে ফাঁকি দেয়া যাবে না তাকে, তিক্ত মনে অনুভব করছে ও। সুতরাং যতটা সম্ভব সহযোগিতা করতে হবে তাকে, অন্তত প্রভার খাতিরে। এমনিতেই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে মেয়েটি, যে কোন মুহূর্তে হয়তো কেঁদে ফেলবে। তাছাড়া, সায়রার ধারণা প্রভার গায়ে হাত তুলতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না জাবির মাহমুদ।

ঠেলে ওদেরকে বের করে নিয়ে এল জাবির। পেছনে দরজা আটকে দিল, তারপর বারান্দা হয়ে লনে চলে এল। মাঠের ওপাশে ছোট্ট একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, টিনশেড বিল্ডিং। ওটার দিকে এগোনোর সময় আড়চোখে মূল গেটের দিকে তাকাল সায়রা। মানুষ আসা-যাওয়া করার জন্যে ছোট্ট একটা গেট রয়েছে, তালা নেই ওটায়। স্রেফ হুড়কো দিয়ে আটকানো। কোন ভাবে একবার ছাড়া পেলে অনায়াসে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারবে ও, এমনকি প্রভার পক্ষেও ওটা খুলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

'এখানেই দাঁড়াও!' রুক্ষ কণ্ঠে নির্দেশ দিল জাবির, পকেট হাতড়াচ্ছে চাবির খোঁজে। 'একটুও নড়বে না কেউ!'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে তালা খুলে ফেলল সে। ঠেলে স্লাইডিং দরজা সরিয়ে দিল। ভেতরে বিভিন্ন মালামাল, লোহালক্কড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। গুমোট পরিবেশ, গরম আর শুকনো বাতাস দোলা

দিল ওদের।

'ভেতরে ঢোকো!'

ঢুকল সায়রা, ওর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাও।

'বসো ওখানে!' ধুলোমাখা একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বলল জাবির।

ফুঁ দিয়ে ধুলো সরিয়ে বসল সায়রা। দেখল ওদের বাঁধার জন্যে কি যেন খুঁজছে জাবির। মুহূর্তের মধ্যে সচেতন হয়ে উঠল ও, একবার বেঁধে ফেললে কিছুই করার থাকবে না আর; কোন ভাবেই পালাতে পারবে না এখান থেকে।

সুতরাং এখনই কিছু একটা করতে হবে···

কোন কিছু চিন্তা করল না সায়রা, কিংবা পরিণতিও ভাবল না। ছুটে গিয়ে জাবিরকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল। 'প্রভা! দৌড়াও! গেটের হুড়কো খুলে বেরিয়ে যেতে পারবে!' চিৎকার করে মেয়েটিকে বলল ও।

শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জাবির। সবল হাতে চেপে ধরেছে ওকে। প্রভা সুযোগটা নিয়েছে কিনা বুঝতে পারল না সায়রা। জাবিরের একটা হাত ঝলসে উঠল বাতাসে, মুহূর্তে চিবুকে হাতুড়ির আঘাত অনুভব করল ও। তারপর হাজারটা আতসবাজি চোখে পড়ল, অন্ধকার নেমে এল ওর চেতনায়···

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে নোংরা মেঝেয় আবিষ্কার করল সায়রা। পড়ে আছে লোহালক্কড়ের পাশে। নড়ে উঠল ও, কিন্তু আড়ষ্ট মনে হচ্ছে শরীর, কব্জি আর গোড়ালিতে ব্যথা অনুভব করছে। তৎক্ষণাৎ কারণটা ধরে ফেলল, ওর কব্জি আর গোড়ালি বেঁধে রেখেছে জাবির। গায়ের জোরেই বেঁধেছে।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ও, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করল। ভাগ্য ভাল পেছনে হাত নিয়ে বাঁধেনি জাবির, এবং আঙুলগুলো মুক্তই আছে। আঙুল চালিয়ে গোড়ালির বাঁধন খোলার চেষ্টা করল ও, কিন্তু চেষ্টা করাই সার হলো শুধু। বাঁধন তো খুললই না, বরং নরম মাংসের ওপর চেপে বসল আরও। ইলেকট্রিক ক্যাবল দিয়ে বেঁধেছে। ক্লান্তি বোধ করছে ও, ছেঁচড়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঠেস দিয়ে বসল।

চোখ জ্বালা করছে ওর, কান্না আসছে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় দমিয়ে রাখল সায়রা। অসহায়, নিদারুণ অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে।

কি এক শঙ্কা আর আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু প্রভার কথা মনে পড়তে সমস্ত ব্যথা আর তিক্ত অনুভূতিগুলো মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল।

দরজাটা বন্ধ। ছোট্ট ফোঁকর দিয়ে যেটুকু আলো ভেতরে আসছে, তাতে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সবকিছু। চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল সায়রা। অন্তত দশ ফুট উঁচুতে, স্রেফ আলোর জন্যে রাখা হয়েছে; এবং লোহার গ্রিল দেওয়া।

প্রভা নেই, হয়তো পালিয়ে যেতে পেরেছে···

'প্রভা?' আতঙ্ক মিশ্রিত কণ্ঠে ডাকল সায়রা। প্রথমে নিচু স্বরে, তারপর ক্রমশ চড়া হলো ওর কণ্ঠ।

কিন্তু সাড়া দিল না কেউ।

বমি পাচ্ছে ওর। ঢোক গিলে ঠেকানোর চেষ্টা করল। কব্জি আর গোড়ালির বাঁধন ক্রমশ চেপে বসছে আরও। নড়েচড়ে আরামদায়ক একটা অবস্থান খোঁজার চেষ্টা করল ও। প্রায় আচ্ছন্নের মত প্রভার নাম ধরে ডাকছে। তারই ফাঁকে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে, যাতে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে মেয়েটা।

সত্যিকার বিপদ কখন আসবে? শঙ্কিত মনে ভাবছে সায়রা। এমন নয় যে খুব একটা স্বস্তিতে আছে এখন। একই অবস্থানে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর উপায় নেই, পারছে না সায়রা। পা দুটো ক্রস করে বেঁধেছে জাবির। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেছে ও মেঝেয়, লাভের মধ্যে ব্যথা পেয়েছে কোমরে। অসহায়ত্বে সায়রা নিজেও জানে না কখন কাঁদতে শুরু করেছে, নিঃশব্দ কান্নার জল গড়াচ্ছে গাল বেয়ে।

এবং নিজেকে অপরাধী ভাবছে ও এখন। সবই ওর দোষ। ওর ভুলের কারণেই এমন হয়েছে। এখানে আসার আগেই কিছু একটা করা উচিত ছিল, আসার পথে কিছুই করেনি ও। চিৎকার করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা তো করতে পারত। দিনে-দুপুরে, রাস্তায় হাজার লোকের সামনে নিশ্চই ওকে কিছু করার সাহস হত না জাবিরের?

প্রভা কি সত্যিই পালাতে পেরেছে, না ধরা পড়ে গেছে? জাবির যে প্রচণ্ড খেপে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, প্রভাকে ধরতে পারলে গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করবে না। মেয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া দেখাবে না সে, আরেকটা খুন করতেও দ্বিধা করবে না। সত্যিই কি এতটা বেপরোয়া হবে সে? ওকে নিয়েই বা কি করবে?

'খোদা, সাহায্য করো ওকে!' বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল সায়রা, নোনা জলে গাল ভিজে গেছে। 'সাহায্য করো নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে! সে যেন ওর কোন ক্ষতি করতে না পারে...'

শূন্য নীরবতা ভেঙে গেল হঠাৎ। কাছাকাছি প্রচণ্ড শব্দে ভাঙল কি যেন, চমকে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল সায়রা। ভয়ে-আতঙ্কে ঘুরে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। ওর ধারণা জাবির বোধহয় ফিরে এসেছে, এবার চরম শাস্তি দেবে ওর অবাধ্যতার।

ঘড়ঘড় করে সরে গেল দরজাটা। দেয়ালের দিকে নিজেকে গুটিয়ে নিল সায়রা, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে উদ্গত কান্না দমানোর আশায়। নিখাদ বিস্ময় নিয়ে অন্য একজনকে দেখতে পেল, অবিশ্বাস্য মনে হলো সামনে দাঁড়ানো ফাহিম ইমতিয়াজের উপস্থিতি। তারপর অসহ্য ভাল-লাগা আর স্বস্তিতে শিথিল হয়ে গেল দেহ। নিজেও জানে না বিপদ মুক্তির আনন্দে ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করেছে।

দ্রুত হাতে ওর বাঁধন খুলছে ফাহিম, প্রবল মমতার সঙ্গে কাজটা করছে। মিনিট দুয়েক পর, কাছে টেনে নিল ওকে। আলতো চুমো খেল সায়রার কপালে, মুখে স্বস্তি আর আনন্দ।

নিজেকে সামলে নিয়েছে সায়রা। ফাহিমের দৃঢ় বাঁধনে নিদারুণ স্বস্তি আর নির্ভরতা অনুভব করছে, কিন্তু তারপরও দুটো আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। 'ফাহিম...প্রভা পালিয়ে গেছে,' সন্ত্রস্ত স্বরে চিৎকার করল ও। 'আমি জানি না কোথায় আছে ও...!'

'চিন্তা কোরো না, ভাল আছে ও। শওকত হাসানের কাছে রেখে এসেছি ওকে।'

সত্যিকার স্বস্তি এবং প্রশান্তি বোধ করছে ও এবার। হঠাৎ করেই রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করল, সকাল থেকে টানা উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়েছে। সমস্ত উদ্বেগের অবসান হলেও ধকলটা অনুভব করছে এখন, অবসাদ লাগছে। প্রবল নির্ভরতায় ফাহিমের কাঁধে মাথা রাখল ও, দু'হাত তুলে গলা জড়িয়ে ধরল। কোমর চেপে ধরে ওকে বুকে টেনে নিল ফাহিম। এতটা দৃঢ় ভাবে চেপে ধরল যেন হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় অস্থির কিংবা বুঝতে পেরেছে ওকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার কতটা কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

বেঞ্চিতে ওকে বসাল ফাহিম। তারপর হাত দুটো তুলে নিল। তার চেপে বসায় কেটে গেছে কয়েক জায়গায়, রক্ত বেরোচ্ছে, লাল হয়ে

গেছে কব্জির কাছে দুটো হাত। রাগে কঠিন হয়ে গেল ফাহিমের মুখ। 'যদি জানতাম তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে ও, তাহলে খুন করতাম ওকে!' বিড়বিড় করে বলল সে, মুখ নামিয়ে আবার আলতো চুমো খেল সায়রার কপালে।

ফাহিমের দিকে তাকাল ও। দামী কাপড় নোংরা দেখাচ্ছে, কাদা আর বৃষ্টির পানিতে সয়লাব। নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ফাহিম।

'ভয় হচ্ছিল তোমাদের দু'জনকেই হারিয়ে ফেলেছি!' অস্ফুট স্বরে বলল সে। 'ওহ্, সায়রা···তোমার লেখা মেসেজটা না পেলে হয়তো সত্যিই তাই হত!' সমীহের পাশাপাশি চাহনিতে গভীর ভালবাসা আর মমতা ফুটে উঠেছে।

ব্যথা আর আনন্দাশ্রু ছাড়িয়েও ক্ষীণ হাসল সায়রা। বিড়বিড় করে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ফাহিম, চুলে আলতো বিলি কাটছে। এবার যেন ঠিকমত ভাষা খুঁজে পেয়েছে সায়রা, নিচু স্বরে টানা বলে গেল জাবিরের উদ্দেশ্য আর কিভাবে ওদেরকে নিয়ে এসেছে এখানে। সায়মার "দুর্ঘটনা" সম্পর্কে কিছুই বলল না, এবং কখনও বলার ইচ্ছেও নেই ওর। অন্তর থেকে জানে, এ ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে না ফাহিম, শুনলে দারুণ কষ্ট পাবে। যেটুকু বলেছে, তাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে ফাহিমের দেহ, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে কিছুক্ষণের মধ্যে। মমতা ভরা হাতের অস্তিত্ব আবার অনুভব করল সায়রা।

আচমকা বাচ্চা মেয়ের মত ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ফাহিম। চমকে চোখ মেলে তাকাল সায়রা। দুর্বল বোধ করছে ও, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে; মানুষটার স্পর্শ নির্ভরতার, জানে ওকে আগলে রাখবে সে। কিন্তু আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে, যেহেতু একা হওয়ার সুযোগ হয়েছে ওদের। মাথা সরিয়ে সরাসরি ফাহিমের মুখের দিকে তাকাল সায়রা।

'ফাহিম···জাবির ভাই বলছিল প্রভা···প্রভা নাকি···' থেমে গেল ও, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল ফাহিমের দিকে, বেদনা আর দ্বিধা অনুভব করছে। 'দুঃখিত। কথাটা তোলা উচিত হয়নি···এখন আর কিছুই যায়-আসে না তাতে।'

'প্রভা সম্পর্কে তোমাকে কি বলেছে ও?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সে।

'বলেছে প্রভা নাকি আসলে ওর মেয়ে?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল ফাহিম, আশাহতের যন্ত্রণা ফুটে উঠল

চোখে। নিজের যন্ত্রণা আর বেদনা দূরে সরিয়ে দিল সায়রা, হাত বাড়িয়ে ফাহিমের গলা জড়িয়ে ধরল। 'সত্যি বলেছে সে, তাই না? সেজন্যেই আমি যখন বলেছিলাম প্রভা তোমার মত হয়েছে, শুনে বিস্মিত হয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' প্রায় ক্লান্ত স্বরে স্বীকার করল ফাহিম। 'এবং আহতও হয়েছিলাম। তিক্ত সত্যটা ভুলতে চেয়েছি আমি, কিন্তু চেহারার প্রসঙ্গ তুলে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে আসলে তো আমি ওর বাবা নই!' আচমকা যেন বয়স বেড়ে গেছে ওর, বত্রিশ বছরের যুবক নয় বরং চল্লিশ বছরের মাঝবয়সী মনে হচ্ছে এখন। 'প্রথম যখন জানতে পারি, ভেবেছি ডিভোর্স দেব সায়মাকে। আঘাতটা লেগেছিল আমার অহঙ্কারে, কারণ ততদিনে সায়মার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কেয়ার করতাম না। হয়তো স্রেফ করুণা হয়েছিল, সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলি। তারপর থেকে···স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে বাস করিনি আমরা এবং অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছেও ছিল না আমার।

'প্রভার জন্মের পর···পরিস্থিতিটা যেন আরও খারাপ হলো। পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেলাম আমরা। হাস্না খালাই প্রভার যত্ন নিতেন। আজব কোন কারণে সায়মাও প্রভার কাছে যেত না। আর আমি···সায়মা মারা যাওয়ার আগে কখনোই প্রভা বা ওর নার্সারির ধারে-কাছেও যাইনি। বাচ্চা মেয়েটিকে সবাই মিলে ঠকিয়েছি আমরা···পুরো দুটো বছর হাস্না খালা ছাড়া ওর ভুবনে ছিল না কেউ।' ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বেদনা আর কষ্টে টনটন করে উঠল সায়রার বুক।

'তারপর, একদিন তোমার মা-র একটা চিঠি এল। প্রভার ছবি চেয়েছিলেন তিনি। সেদিনই প্রথম প্রভাকে দেখতে গেলাম···ওকে দেখার পর উপলব্ধি করলাম কতটা অন্যায় করেছি–ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্পাপ বাচ্চাটিকে ঠকিয়ে এসেছি এতদিন! ও তো কোন দোষ করেনি! বরং ওর সঙ্গে প্রতারণাই করেছি, কারণ মেয়ে হিসেবে ওকে গ্রহণ করেছি অথচ মেয়ের মত আচরণ করিনি।

'সেদিন কিছুক্ষণের জন্যে ওর সঙ্গে ছিলাম আমি। তারপর থেকে অবস্থা পাল্টে গেল,' এবার ক্ষীণ হাসল ফাহিম। 'বলা যায় ও আমার মন জয় করে নিল···এখন, ওকে নিজের মেয়ে মনে করি আমি।'

'বিশ্বাস করি আমি, জানি!'

দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরল ফাহিম, চোখে চোখ রাখল। 'জানি না

প্রভার ব্যাপারে কি ভাবছ তুমি, কিংবা জন্মপরিচয় জানার পর ওর প্রতি তোমার অনুভূতি যাই থাকুক, কিন্তু আমার কথা বলতে পারি···ও আমার মেয়ে এবং এছাড়া অন্য কিছুই ভাবি না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি! প্রভাকেও ভালবাসি! তুমিই তো বলেছ, তোমার সবকিছুর অর্ধেক আমার! আমাদের মেয়ে হবে ও!'

খেপে গেলে ফাহিম ইমতিয়াজ চৌধুরী যে কতটা বেপরোয়া হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না শওকত হাসান। ধনী মানুষ মাত্রই আয়েশী হয়, কিন্তু কোটিপতির ক্ষেত্রে কথাটা কোন ভাবেই খাটে না।

সবে তখন গেটের সামনে গাড়ি থামিয়েছে ওরা। ছোট্ট গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা কাঠামো, দেখতে পেল ওরা, তারপর চিনতে পারল প্রভাকে। পেছনে পেছনে ছুটে বেরিয়ে এল জাবির মাহমুদ। স্পষ্ট খুনের নেশা তার চোখে।

কিন্তু সেই নেশা বিশ মিনিট পর আর থাকেনি। ঠিকমত স্টার্ট বন্ধ না করেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ফাহিম, ছুটে গিয়ে চড়াও হয়েছে ভাইয়ের ওপর। তুমুল হাতাহাতি শেষে জাবিরকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পেল শওকত হাসান। মারের চোটে ককাচ্ছে সে তখন। কিন্তু তারপরও ক্ষান্ত হয়নি ফাহিম ইমতিয়াজ। দড়ি দিয়ে বেঁধেছে ভাইকে, প্রায় মুমূর্ষু দেহটা টেনে গেটের ভেতরে ঢুকিয়েছে।

তারপর প্রভাকে কোলে তুলে নিয়েছে সে, আদর করেছে। বাচ্চা মেয়েটির সমস্ত ভয় আর আতঙ্ক দূর হওয়ার পর ভেতরে ঢুকেছে। প্রভার দায়িত্বে রেখে গেছে সাংবাদিককে।

সোফায় শুয়ে আছে সায়রা, চোখ বন্ধ। গায়ের ওপর একটা চাদর চাপানো। ওর ঠিক পাশেই বসে আছে প্রভা, পরম নির্ভরতায় দু'হাতে চেপে ধরেছে সায়রাকে।

'এখানে থাকবেন নাকি?' জানতে চাইল শওকত।

'নাহ্। শওকত, ড্রাইভিং জানেন?'

'জানি।'

'দয়া করে গাড়িটা ভেতরে ঢোকাবেন? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাব আমরা।'

পা বাড়াতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল সাংবাদিক। 'ওর কি হবে?' বাইরে পড়ে থাকা জাবিরের অচেতন দেহের দিকে ইঙ্গিত করল।

'ঝুটে করে নিয়ে যাব ওকে।'

'পুলিশে দেবেন?'

'উঁহুঁ, পুলিশ নয়, ওর দরকার অন্য কিছু।'

'আপনি নিশ্চই পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না?' অসন্তোষ প্রকাশ পেল সাংবাদিকের কণ্ঠে। 'ও আপনার ভাই বলেই কি...'

'ঠিক!' অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিল ফাহিম। 'ও আমার ভাই। দেখুন, শওকত, ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দিন। হয়তো সাংবাদিক বলেই মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু পুলিশ ওকে যে শাস্তি দেবে, তারচেয়ে বেশিই দিতে পারব আমি। তাছাড়া অপহরণের অভিযোগ এনে কি লাভ হবে? খুব বেশি হলে কিছু জরিমানা বা কয়েকদিনের জেল হবে। বাংলাদেশের আইন-আদালত সম্পর্কে ধারণা নেই আপনার, বিচার হতে হতে অনেক দিন লেগে যাবে। তাছাড়া এসব করতে গিয়ে আরও নোংরা হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তারচেয়ে...চট্টগ্রামে ওকে ফেরত পাঠাব আমি। বাবাই এর সুরাহা করবেন।'

শ্রাগ করল শওকত হাসান। 'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন!'

'আপনি বরং এখানে থাকুন, ওদিকে সবকিছু ঠিক করে আসছি আমি।'

'আব্বু, আমি আসি তোমার সঙ্গে?' আব্দার জুড়ল প্রভা। ছুটে এসে ফাহিমের কোলে চড়ে বসল, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছে। ভয় বা আতঙ্কের কারণ না থাকলেও মেয়েটির ভয় কাটেনি পুরোপুরি, স্পষ্ট টের পাচ্ছে ফাহিম। দৃঢ় হাতে চেপে ধরেছে ওকে, ছোট্ট উষ্ণ দেহটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। বাপের চোখের আড়ালে থাকতে চাইছে না।

ঝুঁকে প্রভাকে চুমো খেল ফাহিম। 'উঁহুঁ, আঙ্কেলের সঙ্গে থাকো। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব আমি।'

'না!' আতঙ্ক ফুটে উঠল প্রভার স্বরে, ছোট ছোট হাতে চেপে ধরল ফাহিমের গলা। 'আবারও চলে যাবে তুমি!'

'পাঁচ মিনিট লাগবে, সোনা।'

'উঁহুঁ, এখানে থাকো তুমি!' সত্যি সত্যিই সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে প্রভাকে।

'আমিই না হয় যাই?' ফাহিমের দিকে তাকাল সাংবাদিক। তারপর বেরিয়ে গেল সে।

সোফায় সায়রার কাছে এসে বসল ফাহিম। ওর সাড়া পেয়ে উঠে

বসল সায়রা। ক্লান্ত মুখে স্মিত হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে দিতে ওর কোলে গিয়ে উঠল প্রভা। হাসছে মেয়েটা। অনাবিল স্বর্গীয় হাসি।

*

দু'দিন পর। বিকেল।

নার্সারিতে প্রভার সঙ্গে আছে সায়রা। অদ্ভুত একটা খেলা শুরু করেছে মেয়েটা। আয়েশ করে বসেছে ওর কোলে, কড়া নির্দেশ: চোখ বন্ধ রাখতে হবে। নিজেও চোখ বুজে আছে প্রভা। দশটা আঙুল ব্যস্ত ওর, দারুণ ব্যস্ত—সায়রার সারা মুখে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোমল হাতে মুখের প্রতিটি রেখা বা ভাঁজ চিনে নিতে চাইছে।

মাঝে মধ্যেই শিউরে উঠছে সায়রা। কচি হাতের আদুরে স্পর্শ অনুভব করছে নাকে—ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে ওর নাকে হাত বুলাল, কি বুঝতে চাইছে কেবল মেয়েটাই জানে।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ও।

'নড়ো না!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল প্রভা।

এবার চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। হাত বুলাচ্ছে কোমল ত্বকের ওপর, প্রতিটি পাপড়ির আলাদা আলাদা অবস্থান জেনে নিতে চাইছে যেন···

ফাহিম বলেছে বিকেলের মধ্যে ফিরবে, তারপর ওদের নিয়ে বেরোবে। গতকাল প্রায় জোর করে ওকে নিয়ে এসেছে গেস্ট হাউজ থেকে। তারপর থেকে সমানে অধিকার ফলাচ্ছে বাপ-মেয়ে, চিন্তাটা মাথায় আসতে আনমনে হেসে উঠল সায়রা। কাল রাতে ওর সঙ্গেই শুয়েছে প্রভা, কিন্তু একবারের জন্যেও সিনডারেলার গল্প শুনতে চায়নি।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল প্রভা, সায়রার গলা আর মুখে এসে পড়ল ওর নিঃশ্বাসের বাতাস। হঠাৎ করেই সচেতন হলো এতক্ষণ বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল মেয়েটা, যেন ঘোরের মধ্যে আছে।

'তুমিই আমার মা!' আচমকা ওর বুকে মুখ গুঁজে দিল প্রভা, জড়িয়ে ধরল।

শিহরিত হলো সায়রার দেহ। চোখ মেলে তাকাতে দেখতে পেল নিঃশব্দে কাঁদছে প্রভা। বুকের ভেতরে কি জানি হলো ওর. দু'হাতে ছোট্ট মুখটা তুলে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল।

'ডাকব তোমাকে, মা ডাকব?' চোখ মেলে তাকাল প্রভা, চোখে নীরব মিনতি।

'আগে বলো এতক্ষণ কি করছিলে।'

'গতকাল স্বপ্নে দেখেছি নতুন একটা মা এসেছে আমার।'

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল ও। 'তো?'

'মা-কে দেখব, ঠিক তখনই স্বপ্নটা শেষ হয়ে গেল! কিন্তু গল্পের বা স্বপ্নের মা চাই না আমার, আসল মা চাই!'

'কোথায় পাবে আসল মা-কে?' কৌতুকে নেচে উঠল সায়রার চোখ, ঝুঁকে চুমো খেল মেয়েটিকে।

'তুমি!' কাঁপা হাতে ওর মুখে ছুঁলো প্রভা। 'ডাকব?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল সায়রা।

'মা!'

বুকের সঙ্গে মেয়েটিকে চেপে ধরল ও, নিজেও জানে না নিঃশব্দ কান্নার জল গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। আনন্দ আর প্রশান্তির জল।

'বলো, কখনও ছেড়ে যাবে না আমাকে?'

'যাব না!' রুদ্ধ স্বরে বলল সায়রা।

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ!'

বাইরে গাড়ির গর্জন শোনা যেতে লাফিয়ে ওর কোল ছেড়ে নেমে গেল প্রভা। 'বাবা এসেছে!' বলেই ছুটতে শুরু করল দরজার দিকে, কিন্তু আচমকা মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। তারপর গুটি গুটি পায়ে ফিরে এল, কাছে এসে সায়রার একটা হাত চেপে ধরল।

একসঙ্গে ড্রয়িংরুমে এল ওরা।

ভেতরে ঢুকেই দু'জনকে দেখতে পেল ফাহিম। বাপের উদ্দেশে ছুটে গেল প্রভা। হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসল ফাহিম, ছোট্ট শরীরটা বুকে টেনে নিল।

বাপকে চুমো খেল প্রভা, কানে কানে বলল কি যেন। চোখ তুলে দূরে দাঁড়ানো সায়রাকে দেখল ফাহিম, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা ভুরু নাচাল, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি।

'সোনামণি, এবার জলদি তৈরি হয়ে নাও,' মেয়েকে বলল সে। 'পাঁচ মিনিট। কোথায় যেন যাব আমরা?'

'ওয়ান্ডারল্যান্ডে।'

দোতলায় প্রভার কামরায় ঢুকল ওরা। 'এনেছ?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল প্রভা, ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমত কাপড় বের করছে।

'কি, সোনা?'

'গিফট?'

'যাহ্, ভুলে গেছি!'

মুখ ভার হয়ে গেল মেয়েটার, ঝট করে বাপের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিল। 'বাথরুমে যাব,' বলে অ্যাটাচ্ড্ বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

'কিসের গিফ্ট?' জানতে চাইল সায়রা।

এগিয়ে এল ফাহিম, তারপর বাধা দেওয়ার আগেই জড়িয়ে ধরল সায়রাকে। 'তোমাকে বরণ করে নেওয়ার গিফ্ট,' নিচু স্বরে বলল ও।

'বরণ?'

'হুঁ···মা হিসেবে!'

'কি অদ্ভুত কথা! মেয়ের মত তোমারও মাথা বিগড়ে গেছে?'

'মোটেই না! যদি গিয়েও থাকে, তাহলে তোমার জন্যে!' নিচু স্বরে বলল ফাহিম; সায়রার ক্ষীণ কোমর পেঁচিয়ে ধরে আকর্ষণ করল। 'সন্ধের পর বাবা ঢাকায় আসছেন। প্রভার তরুণী-মাকে আংটি পরিয়ে···'

দুম করে ফাহিমের বুকে কিল বসিয়ে দিল সায়রা, সরে গেল দূরে। 'তরুণী নই আমি!' চাপা অসন্তোষের সঙ্গে ঠোঁট বাঁকাল ও। 'সত্যি আসছেন? ওহ্, শুনেই তো বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে আমার!'

'আমার কাছে ওষুধ আছে!' রহস্যময় সুরে বলল ফাহিম। 'কাছে এসো, ঠিক করে দেব!'

'সত্যি আসবেন?' আরও দুই পা পিছিয়ে গেল সায়রা।

'হ্যাঁ।'

মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল দেখাল ওকে, ঠোঁট জোড়া চেপে বসল পরস্পরের ওপর। ফাহিমের চোখে চোখ পড়তে আরক্ত হয়ে উঠল গাল। 'যদি···'

'যদি?' মিটিমিটি হাসছে ফাহিম, তাকিয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

'নাহ্, কিছু না।'

শ্রাগ করল ফাহিম। 'একই পরীক্ষা আমিও দেব,' কৌতুকের স্বরে বলল ও। 'শুনে হয়তো খানিকটা ভরসা পাবে।'

'মানে?'

রহস্যময় হাসি দেখা গেল ফাহিমের ঠোঁটে। বিছানার ওপর রাখা ব্রিফকেস খুলে তিনটে টিকেট আর পাসপোর্ট বের করল।

'কিসের টিকেট?'

'দু'দিন পর কলকাতায় যাচ্ছি আমরা। ভুলটা এবার শুধরে নিতে চাই আমি, শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে আসব। প্রভাও যাচ্ছে আমাদের

সঙ্গে।'

নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটে উঠল সায়রার চোখে, পুলক অনুভব করছে। 'এত কিছু করেছ, অথচ আমি কিছুই জানি না!'

হাসছে ফাহিম। 'সারপ্রাইজ! সবাইকে সবকিছু জানতে দিতে নেই। মজা থাকে না তাহলে।'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল সায়রা। 'একটা ফোন করি, মা-কে জানাই খবরটা? এত খুশি হবেন উনি!' সায়রা নিজেও জানে না চোখ ভিজে উঠেছে ওর, কল্পনায় মা-র হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছে। কতদিন পর প্রাণ খুলে হাসবেন তিনি?

গম্ভীর দৃষ্টিতে ওকে দেখল ফাহিম, তারপর কাছে এসে জড়িয়ে ধরল। 'মা-কে এত ভালবাস তুমি! আমার তো ভয় হচ্ছে ওঁকে ছেড়ে থাকার ভয়ে শেষে আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলো কিনা!'

ফাহিমের বুকে মুখ গুঁজল সায়রা। 'সব ভালবাসা কি একরকম? নিশ্চই নয়! আমার পরিবারের সবাইকে ভালবাসি আমি। প্রভাকে ভালবাসি···তোমাকে ভালবাসি! সবগুলোই সম্পূরক, কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না।'

'আরিব্বাপ্‌স্, দারুণ দামী কথা বলেছ তো! দর্শনতত্ত্ব শিখলে কোত্থেকে?' প্রাণখোলা আন্তরিক হাসিতে উজ্জ্বল হলো ফাহিমের মুখ। 'কিন্তু এত যে সারপ্রাইজ দিলাম, আমার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'কিসের পাওনা?'

'এই যে বুক ধড়ফড় বন্ধ হয়ে গেল?'

সত্যিই তাই হয়েছে, অনুভব করছে সায়রা। ওর মুখ দেখে সত্যতা বুঝে নিল ফাহিম। 'কই, দাও!' তাগাদা দিল সে।

'কি দেব?'

একটা আঙুল সায়রার ঠোঁটে রাখল ফাহিম। মুখে কিছু বলল না। মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল সায়রার মুখ, দ্রুত সরে গেল ও।

'না! বয়েই গেছে আমার তোমাকে···' ফাহিমকে এগোতে দেখে ছুটল ও, ইচ্ছে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সময়মত ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল ফাহিম, দরজায় বাধা পেল সায়রা। ওকে বুকে টেনে নিল সে।

'দাও!'

'না, এখন নয়!'

'তাহলে তোমাকেও ছাড়ছি না!'

মুহূর্ত খানেক ভাবল সায়রা, মুখ নিচু হয়ে গেছে। এদিকে ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে ফাহিমের বাঁধন। 'ঠিক আছে, আগে তাহলে চোখ বন্ধ করো!'

'আমিও বন্ধ করব?' বাথরুমের কাছ থেকে জানতে চাইল প্রভা, কখন বেরিয়ে এসেছে টেরই পায়নি ওরা।

সরে যেতে চাইল সায়রা, কিন্তু ওকে ধরে রাখল ফাহিম। 'আমার পাওনা না পেলে কিন্তু কোথাও যাব না আমরা, তাই না, প্রভা? একটা মার্কা চাই-ই আমার–লিপস্টিকের মার্কা!' শেষ কথাটা সায়রার উদ্দেশে বলল, ফিসফিস করে।

কিছু না বুঝেই মাথা ঝাঁকাল প্রভা।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল সায়রা। ঘাড় ফিরিয়ে প্রভার দিকে তাকাল। 'পিচ্চি পুতুল, চোখ বন্ধ করো! এই ভদ্রলোক খুব পিছলা!' তারপর ফাহিমের দিকে ফিরল। 'লিপস্টিক কিন্তু নেই!' নিচু স্বরে বলল ও।

'না থাকলেই ভাল,' শয়তানি হাসিতে ভরে গেল ফাহিমের মুখ। 'একেবারে আসল জিনিসের স্বাদ পাব!'

A
***
Sohag Paul Suvo
Creation